বজ্রবিষাণ

জ্যোৎস্না গুহ

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন,
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

ছয় টাকা

উৎসর্গ

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

তাঁহাকে নমস্কার।

যে মহাশক্তির প্রেরণায়

এ কাজ সম্ভব হলো, সেই মাতৃচরণে

নিবেদন করলাম

—বজ্রবিষাণ।

জ্যোৎস্না

দু'একটি কথা বলা দরকার। বহু কাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময় শুনেছিলাম, সেগুলি গ্রন্থনা করতে গিয়ে এসে পড়েছে অনেক চরিত্র, যাঁরা আমার মনের গভীর স্তরে সুপ্ত ছিলেন। আমি তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই উপন্যাসের পটভূমি আমার অতীত স্মৃতির দু'একটি ঘটনার সমাবেশ মাত্র।

যাঁরা ছিন্নমূল হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, দৈন্য, ত্যাগ এবং তিতিক্ষা সর্বোপরি দেশপ্রেমের কথা গভীর সহানুভূতি এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করি। এরকম একটি পরিবারের ইতিহাস স্তরে স্তরে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। দুঃখ তাদের অপরিসীম, কিন্তু সে দুঃখকে মহান করেছে দেশপ্রেম।

একদিন ভারতমাতা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যে বজ্রবিষাণ বাজিয়ে আহ্বান করেছিলেন তাঁর সন্তানদের, সে পূজা এখনও অসমাপ্তপ্রায়।

৩৬এ, মতিলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা-২৯

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা কোর্টের উদীয়মান তরুণ উকীল প্রভাত মিত্র নদীর তীরে অপেক্ষা করছে বরিশাল এক্সপ্রেস ষ্টীমাবটির জন্য। বন্ধু সুব্রত সম্প্রতি ডাক্তারি পাশ করে কলকাতা থেকে আসছে ঐ জলযানে।

ববিশালের এই নদীটিব নাম কীর্তন খোলা। কীর্তন খোলা নদী স্বদেশী যুগের অগ্নিগর্ভ বরিশালেব অনেক কথা জানে। বঙ্গোপসাগবেব নিকটবর্তী এই দেশটিতে দেশাত্মপ্রেমেব ঢেউ আছড়ে পড়েছে অবিবাম। তাব তবঙ্গদোলা এসে মিশেছে এই নদীটির বুকে। আর মিশে আছে কত নীরব আত্মদান, কত শৌর্যবীর্যেব কাহিনী। আজ আর তাকে ভারতের ভৌগোলিক সীমানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নদী যা দেখেছে এবং জেনেছে তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে!

সে সময় কত তরুণ প্রাণে মহৎ কাজের উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে নদীব উদ্দাম গতিবেগ দেখে। আবার তাব তটপ্রান্তেব শ্যামলাঞ্চল বসন্তেব সুললিত স্পর্শে ভবে উঠেছে ফুলে ফলে, লতায় পাতায়। কত প্রেমিকযুগল তাব কূলে বসে শুনিয়েছে মধুব প্রেমের কলগুঞ্জন। নদী বসিকজনেব মত তা কান পেতে শুনেছে। আবার শোকসন্তপ্ত হৃদয় তারই শীতল জলে অবগাহন করে জ্বালা জুড়াতে চেয়েছে।

প্রভাতের কত নিঃশব্দ চিন্তার সাক্ষী ঐ নদী।

আজও জলের দিকে তাকিয়ে প্রভাত ভাবছে কত কথা।

স্বর্ণময় যুগের স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ওর চোখে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল ষ্টেশনের জনমণ্ডলী। অশান্ত গর্জনে পর্বত-প্রমাণ ঢেউগুলি আছড়ে পড়তে লাগল নদীর কূলে কূলে। যেন রস-তরঙ্গে হঠাৎ মেতে উঠেছে কাজলা নদী।

অপেক্ষমান লোকের আকুল প্রতীক্ষার মতই সে চঞ্চল। ভোঁ-ভোঁ স্বরে বাঁশী বেজে উঠল। ঐ আসছে, বরিশাল এক্সপ্রেস। রূপসী গরবিনীর মতই তার গতি। ঢেউয়ের উপর সূর্যকিরণ পড়ে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছে। তরঙ্গচূড়ায় যেন লক্ষ হীরা জ্বলছে।

রাজহংসের মত জল কেটে ষ্টীমারটি আসছে কূলের দিকে। ব্যস্ততা দেখা গেল ষ্টেশনেব কুলীদের মধ্যে। কেউবা পাগড়ী বাঁধছে, কেউবা ব্যাজ ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে। আশু কিছু রোজগাবের আশায় মনে খুশীব আমেজ।

ষ্টীমারের গতি মন্থর হতে হতে থেমে যায়। নোঙ্গর করা মাত্রই চওড়া দু'খানা তক্তার সিঁড়ি ফেলে পাড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হলো। পিল পিল করে পিঁপড়ের সারের মত লোকের ওঠা-নামা আরম্ভ হলো। প্রভাত ভীড় ঠেলে ষ্টীমাবের উপরে উঠতে উঠতে ভাবল, এত লোক রোজই আসে! প্রভাতের দৃষ্টি সুব্রতকে খুঁজতে লাগল। উপবে ওঠার সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল সুব্রতর সঙ্গে।

সুব্রতকে দেখেই প্রভাত খুশী গলায় বলল, কন্‌গ্রেচুলেশন, সুব্রত।

সুব্রত হাসতে হাসতে নেমে এসে প্রভাতকে বুকে জড়িয়ে ধরল। একটুক্ষণ নিঃশব্দতাব পরে প্রভাত বলল, বরিশালেই প্র্যাক্‌টিস করা ঠিক করলে?

হ্যাঁ ভাই। এতদিনেব চেষ্টায় যা শিখলাম তা নিজের জন্মভূমির সেবায়ই নিয়োজিত করবো।

সুব্রত অঙ্গুলিসংকেতে কুলীকে এগিয়ে যেতে বলে দুই বন্ধু গল্প করতে করতে চলল।

ষ্টেশন থেকে সুব্রতদের বাড়ী খুব বেশী দূর নয়। হেঁটেই যাওয়া চলে।

সুব্রতর সঙ্গে প্রভাতের প্রথম পরিচয় কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে।

সুব্রতর বাবা আবগারি বিভাগে কাজ করতেন। থাকতেন স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কলকাতায়। পেন্‌সন হওয়ার পরে নিজের দেশ

বরিশালে এসে ফকিরবাড়ী রোডে বাড়ী করলেন। প্রভাতদের বাড়ীও তার কাছেই। দুই পরিবারে সহজেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। প্রভাত এবং সুব্রতর মধ্যে অল্প দিনেই পরিচয়ের সীমানা অতিক্রম করে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন হলো। কিন্তু মতের মিল ওদের কোন দিনই হলো না। তাই বলে ভালবাসা কিছু কম ছিল না।

কথায় কথায় প্রভাত বলল, সুব্রত, তোমার রেজাল্ট দেখে বরিশালের সকলেই বেশ বিস্মিত। শহরে বেশ আলোড়ন তুলেছে।

তার মানে? বলে সুব্রত প্রভাতের মুখের পানে তাকায়।

মানে এতটা ভাল কেউ আশা করেনি। বলে প্রভাত হাসল।

তারপরে তোমার খবর কি, প্রভাত?

কি খবব জানতে চাও?

সব কিছু। প্র্যাক্‌টিস্ এবং বাজনীতি।

বেশ, তোমাব প্রথম প্রশ্ন, প্র্যাক্‌টিস্—ওবিষয় নিয়ে আমি তেমন কিছু ভাবি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাজনীতি—হ্যাঁ, দেশকে স্বাধীন করার চিন্তা আমাব নিদ্রা এবং জাগবণেব সঙ্গী। তবে কি জান, স্বাধীনতা-সংগ্রাম আবো প্রবল হওয়া দরকার। আবো অনেক বেশী সাড়া জাগাতে হবে দেশেব বুকে। সুপ্ত, জীবন্মৃত জাতিকে নির্দয় আঘাতে জাগাতে হবে—মানে যাকে বলে খুঁচিয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।

সুব্রত গলায় অনেকখানি বিস্ময় এবং কৌতুক মিশিয়ে বলল, বল কি! র'য়ে স্যয়ে বন্ধু। এত দিনের ঘুম আচমকা ভাঙ্গালে হার্টফেল করতে পারে।

প্রভাত কণ্ঠস্বরে প্রচুর জোর প্রকাশ করে বলল, অমনি করে বাঁচার চেয়ে মরা ঢের ভাল। আমি চাই বাঁচার মত বাঁচতে।

সুব্রতকে বাড়ী পৌছে দিয়ে প্রভাত প্রায় বেলা দশটায় ঘরে ফিরল। খেয়েই কোর্টে চলে গেল।

প্রভাতের বাগ্মিতা, আরগুমেণ্ট বরিশালের আইন আদালতকে বিস্মিত করেছে।

জজ এবং উকীলদের মহলে এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো, প্রভাত।

প্রধান উকীল চণ্ডী সেনের সঙ্গে বিচাবপতি শিবপ্রসাদ ব্যানার্জির আলোচনা চলছিল, ওকে নিয়েই। শিবপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, জিনিয়াস—প্রতিভা, তা ছাড়া মশাই এ সম্ভবই নয়।

চণ্ডী সেন তার কেশবিবল মাথাটি নেড়ে গাঢ় স্ববে বললেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন, স্যাব। তবে প্রভাতেব বাবা যোগেনের মধ্যেও আমরা প্রতিভাব পরিচয় পেয়েছিলাম। আয়ু পেলে না, মোটে আটত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ কলেবা হয়ে মারা গেল।

শিবপ্রসাদ দুঃখিত স্ববে বললেন, ভেবী স্যাড।

আদালতে প্রভাত মিত্র একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

প্রভাত যখন ফিবল কোর্ট থেকে, তখন সূর্য তাব সেদিনের কর্তব্য শেষ কবে অস্তাচলে ফিরে চলেছে। অস্তবাগেব রক্তিম আভায় পৃথিবীর সে এক অপূর্ব শোভা। মাধুর্যমণ্ডিত সে সন্ধিক্ষণটিতে মহামায়ার মনটা প্রত্যহই বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একমাত্র পুত্র তাঁর প্রভাত। তাকে ছোট নিয়েই তিনি বিধবা হয়েছেন। পিতৃসম শ্বশুর তাঁর উদাব বক্ষেব সবটুকু স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মাতা-পুত্রকে ঘিরে রেখেছেন। প্রভাতের মনে পিতাব জন্যে দুঃখ বা অভাব বোধ নেই। সে দাদুর কাছেই পিতা এবং দাদুব অপর্যাপ্ত স্নেহ পেয়েছে। পেয়েছেন মহামায়াও কন্যাব মত স্নেহ যত্ন শ্বশুর সত্যপ্রসন্নর নিকট। তবু কিন্তু সাথীহারা মন তাঁর নিঃসঙ্গতায় কেঁদে মবে। বিশেষ, দিন যখন রাত্রির কোলে আশ্রয় নেয়, তখন।

প্রভাত ঘরে ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে ডাকল, মা, মা-গো,···

মহামায়া যেন তাঁর হারান সুর ফিরে পান। বুকের মাঝে পুত্রের জন্য এতক্ষণের আকুল প্রতীক্ষা সার্থক হয়। দ্রুতগতি এগিয়ে

আসেন। প্রভাতের মুখ অত্যধিক উত্তেজনায় আরক্ত দেখায়।

প্রভাত কোর্টের পোষাক খুলতে খুলতে বলল, অন্যায়, ঘোর অন্যায়।

কিসের প্রভাত? মহামায়াকে বড় উদ্বিগ্ন দেখায়।

প্রভাত গায়ের কোট টেনে খুলে ফেলে বলল, দেশের, ধর্মের, সমাজের।

ছেলেব কথা শুনে হেসে বললেন, হ্যাঁবে প্রভাত, এসব ছাড়া তোব কি আর অন্য কথা নেই?

না। পবাধীন জাতিব এছাড়া অন্য চিন্তা থাকা উচিত নয়।

মহামায়াব হঠাৎ স্বামীব মুখ মনে পড়ল। সেখানেও দেখেছেন তিনি, দেশের জন্যে গভীব বেদনাব ছায়া। পুত্রের মুখেও সেই ছায়া তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। সস্নেহে প্রভাতের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, হাত মুখ ধুয়ে আয় বাবা। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

তখন পূর্ববঙ্গে আটা ময়দার প্রচলন ছিল না। চিঁড়ে মুড়িই সকাল বিকেলেব জলখাবাব ছিল, সকলের।

মহামায়া ঘন দুধ, মর্তমান কলা, চিড়ে ও বাতাসা একটা কাঁসার বাটিতে এনে ছেলের সামনে ধরেন। প্রভাতকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে মহামায়া প্রশ্ন করলেন, কি দেখে তোর এত মন খারাপ হলো বাবা?

প্রভাত খাবাব খাওয়া সমাপ্ত করে বলল, কমললতার কেস্‌টার আজ রায় বের হলো।

এ কেস্‌টা নিয়ে শহবে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি এইরূপ—সম্বলপুর গ্রামের মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পনেরো বছরের বিধবা বোনকে গ্রামের দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছিল। মেয়েটি ছিল অসামান্য রূপবতী। চারদিন দুর্বৃত্তদের নিকট থাকার 'পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

এরূপ ঘটনা কিছু নতুন নয়। কিন্তু এ ঘটনার সাথে গ্রামের

জমিদার লিপ্ত থাকায়, গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে অনেক বেশী। গ্রামে প্রায়ই জোয়ান পুরুষ থাকে না, সেই সুযোগ যদি জমিদার গ্রহণ করে তবে নিরীহ প্রজা যাবে কোথায়।

রায় বের হওয়ার পরে, কমললতা তার দাদা মণীন্দ্রের সাথে কোর্ট থেকে বের হয়ে এল। এসে তারা কোর্টের সংলগ্ন প্রাচীন একটি বট গাছের নীচে দাঁড়াল। কমললতার মুখ আশায় উজ্জ্বল। মণীন্দ্র বোনকে বলল, এবারে কোথায় যাবি?

কেন, দেশে।

মণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে, খাটো গলায় বলল, দেশে যাওয়া তোর চলবে না।

কমললতা বিস্মিতস্বরে বলল, কি বলছ তুমি দাদা? দেশে, মার কাছে যাব না?

মণীন্দ্র ধরা গলায় বলল, যে মেয়ে চার দিন চার রাত দুর্বৃত্তদের কবলে ছিল, তাকে ঘরে নিলে কি আর আমার রক্ষে আছে! সমাজ গলাটিপে আমাকে মেরে ফেলবে। একঘরে, অপাঙক্তেয় করে রাখবে। কথাগুলি স্বগতোক্তির মত শোনাল। তারপরে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তোকে বাড়ী নিয়ে যেতে কি আমার অসাধ, বোন। কিন্তু তা হলে আমি সমাজচ্যুত হবো, আমার বুড়ি মা মরলে কেউ কাঁধ দেবে না, ছেলে মেয়ের বিয়ে, ক্রিয়াকর্মে কেউ আমার ঘরে খাবে না, এমন কি রোগে ডাক্তার পর্যন্ত আসবে না।

কমলের আতঙ্কিত দু-চোখ জলে ভরে ওঠে।

তা হলে আমার কি হবে দাদা? বলে, মণীন্দ্রের পায়ের উপর ভেঙ্গে পড়ে।

মণীন্দ্র চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দু-পা সরে দাঁড়াল। বিরক্তপূর্ণ স্বরে বলল, আঃ, ছুঁয়ে দিসনে যেন।

এ কথায় আহত ফণিনীর মত উঠে দাঁড়াল কমল। চোখে যেন

মেঘের কোলে বিত্যুৎ ঝলসে ওঠে। সমস্ত অঙ্গে কাঠিন্য লক্ষিত হয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, কেন দাদা, আমি ছুঁলে তোমার জাত যাবে?

মণীন্দ্র ভ্রূ কুঁচকে বলল, কি বাজে বকছিস, এখন কোথায় যাবি তাই বল।

তুমি কোথায় যেতে বল?

মণীন্দ্র বোনের একটু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে কোমল স্বরে বলল, গোলাপী কসবীর লোক ভাল বলে নাম আছে,—চল তার হাতে তোকে দিয়ে আসি। তোর সব ব্যবস্থা সেই করে দেবে। কোন কষ্ট হবে না। পায়েব উপর পা রেখে রাজবাণীর মত থাকবি।

কমললতা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটখানা চেপে সব শুনল। তাবপর সতেজ গলায় বলল, তাই চল। কিন্তু দাদা, যাওয়ার আগে আমি তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই, উত্তর দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা।

মণীন্দ্রকে একটু বিব্রত দেখাল। যেন জোর করে বলল, কি বলতে চাস বল।

কমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাদাব দিকে তাকিয়ে বলল, আজ যে নবকের মধ্যে তুমি আমাকে পৌছে দিতে যাচ্ছ, তা কোন নীতি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে? আব আমি সেখানে যাবই বা কেন? আমার উপব যে অত্যাচার হয়েছে তাকে যদি তুমি পাপ বল, তবে তা কার দোষে সম্ভব হয়েছে? স্বেচ্ছায় আমি এ পাপ করিনি—তা তোমরা সকলেই জান। তবে তার ফলভোগ আমি করবো কেন?

মণীন্দ্র নিদারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করে ওঠে। আকুল কণ্ঠে বলল, জানি না, জানি না, বোন। আমাকে তুই ক্ষমা কর। আমি বড় তুর্বল, বড় অসহায়।

চলে গেল ভাই বোন, বোধ হয় গোলাপী কসবীর বাড়ীর উদ্দেশে।

এ ঘটনা প্রভাত আড়াল থেকেই সব দেখেছে এবং শুনেছে। কোর্ট শেষ হতে সেও বাড়ী আসছিল ঐ পথে। প্রভাত বলল, মা, আজ ঐ মেয়েটির চোখের জল আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। এই আমার হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ! এত অনুদার! একটি নির্যাতিতা বালিকাকে সে আশ্রয় দিতে পাবে না। বল, বল মা, তবে আমরা দাঁডাব কিসের জোবে। আর বল, কে এব জন্যে দায়ী।

মহামায়া প্রশান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, সে অনেক কথা বাবা। আর তা কি তুই-ই জানিস না?

না, তবু তোমাব মুখ থেকে শুনতে চাই, মা। তোমার মুখ থেকে যা শুনবো, তা আমাব অন্তর স্পর্শ করবে, শুকনো বইয়ের পাতায় কি লেখা আছে, তা আমি জানতে চাই না।

মহামায়া বললেন, বাবা, আমি আর কতটুকু জানি, তবে এতটা বয়সের অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি তা এই—নানা বকম প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতকে এগিয়ে চলতে হয়েছে। এই প্রতিকূল অবস্থাব চাপে আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা বিকৃতি দেখা দিয়েছে। বারংবাব বিদেশী রাজাব শাসনের ফলে, ভাবতে সনাতন হিন্দু ধর্মে এল আবিলতা, সমাজদেহ হলো দুর্বল। দুর্বলতার কাজই হলো ব্যাধিব নিকট আত্মদান করা। ভীরুতা নামক ব্যাধি তাকে সব রকম দুষ্কার্যে সহায়তা কবতে লাগল। অন্যকে অপমান কবে সে নিজেকেই অপমান করছে—কিন্তু সেটুকু বোঝার তার শিক্ষা নেই।

এক কথায় বলতে গেলে পবাধীনতাই তার মূল বা একমাত্র কাবণ।

প্রভাত যেন নতুন আলোর নতুন করে সন্ধান পায়। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, ঠিক বলেছ, মা। যেমন করেই হোক পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে।

প্রভাত রুদ্ধ আবেগের বাষ্পচাপে অস্থির অশান্ত পায়ে পদচারণা

করতে লাগল। আপন মনেই বলে, "বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর"।

এমন সময় গৃহভৃত্য উমাচরণ এসে বলল, দাদাবাবু, তোমাকে কর্তা ডাকছেন।

প্রভাত বলল, এখুনি যাচ্ছি।

ভাবল, অনেকক্ষণ এসেছি, দাদুর কাছে আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এই ক'ঘণ্টার অদর্শনে দাদু হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রভাতের মুখে মৃদু একটু হাসি। না, দাদুকে নিয়ে আর পারা গেল না। এখনও যেন আমি সেই বালক আছি, একটু দেবী হলেই ভাবনা।

দাদুকে পাওয়া গেল গৃহসংলগ্ন বাগানে। বৃদ্ধের বাগানের ভাবী সখ। এক একটি গাছেব মধ্যে তিনি মানুষের মত কত ভবিষ্যৎ দেখতে পান। ফুলে ফলে, লতায় পাতায় বাগানটি ঝলমল করছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, তবু বৃদ্ধেব বাগানের পরিচর্যা শেষ হয় না। উমাকে সঙ্গে নিয়ে তদাবকী কবছেন।

প্রভাত আসতেই হেসে বললেন, কি ভাই, এতক্ষণে দাদুকে মনে পড়ল।

দাদুর কণ্ঠে অভিমানের আমেজ। প্রভাত জানে, এরপবে কি বললে দাদুব অভিমান কর্পূবের মত উবে যাবে। বেশ বড় প্রস্ফুটিত একটি রক্ত গোলাপ দেখিয়ে প্রভাত বলল, বাঃ ভারী চমৎকার তো! দাদু, তোমার ফুল আমি ফ্লাওয়ার শো-তে পাঠাব। নিশ্চয় তুমি ফার্ষ্ট হবে।

দাদুর অভিমানের গায়ে প্রশংসার তাপ লেগে সহজেই গলে গেল। মাথাটি নেড়ে দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, সুব্রতব বাগানের ফুলের সঙ্গে কমপিটিশানে পেরে উঠব না, ভাই।

প্রভাত বলল, এই যাঃ, বলতে ভুলে গেছি দাদু, আজ সুব্রত কলকাতা থেকে এসেছে।

বৃদ্ধ সত্যপ্রসন্ন অধীর আনন্দে হাসতে লাগলেন। বললেন, এখানেই তো প্র্যাকটিস করবে?

হ্যাঁ দাদু।

ভালই হলো। তুমি আর সুব্রত তো আলাদা নও। বৃদ্ধ বয়সে একটি ডাক্তার নাতি পাওয়া বিশেষ ভাগ্য বলে মনে করি।

মাধবীলতাকুঞ্জের তলায় একখানা বেঞ্চ পাতা, বৃদ্ধ নাতিকে নিয়ে সেখানেই বসলেন। নাতিব প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসন্ন বললেন, ভাই একটা কথা বোজই ভাবি বলবো, কিন্তু বলা আর হয়ে ওঠে না।

কাল উমেশবাবু এসেছিলেন, বললেন, মিত্তির মশাই, একটি ভাল পাত্রী খোঁজে আছে, যদি আপনাব মত থাকে তবে কথাটা উত্থাপন করতে পারি।

প্রভাত অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, তা আমরা কি করবো।

সত্যপ্রসন্ন হেসে বললেন, আমরা নয় ভাই—তুমি যদি রাজী থাক তবে ঐ সম্বন্ধের আলোচনা চলতে পারে। ঠকবে না দাদা, মেয়েটি নাকি পরমা সুন্দরী। বলে, প্রত্যাশায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে থাকেন।

প্রভাত তড়িতাহত আর্তস্বরে বলল, অসম্ভব, অসম্ভব, দাদু—আর তুমি যে আদেশ কব, আমি মাথা পেতে নেব—কিন্তু বিয়ে আমি করতে পারবো না।

প্রভাতের বালক বয়সেই যে মর্মন্তুদ ঘটনাব আকস্মিকতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ মনে রোপিত হয়েছিল, আজ তা বহু শাখা প্রশাখায় পত্রে বল্লবীতে বৃক্ষে পবিণত হয়েছে। ভাবতের স্বাধীনতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—আর সবই গৌণ। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত প্রভাত মাথা নেড়ে বলল, দাদু, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বরিশাল তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মতই সে অগ্নিগর্ভ। সে কী ভয়ঙ্কর রূপ তার। ঐ ভয়ঙ্কর রূপেই সে গর্জে উঠল, “স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—”

স্বাধীনতা কিংবা মৃত্যু, এই পণ নিয়েই সেদিন পুণ্যাত্মা অশ্বিনী কুমাব দত্তের নেতৃত্বে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল পূর্ববাংলাব ববিশাল। আজ ভারতের ভূগোল যদি তাকে স্বীকার না করে, তবে তার মহত্ত্ব কিছু কমে যাবে না।

সত্যপ্রসন্ন রুষ্টস্বরে বললেন, দেশের উপব তোমাব একটা নৈতিক দাযিত্ব আছে বুঝলাম, কিন্তু আমি কি দেশেরই একজন নয়? আমার উপব কি তোমার কোন দায়িত্বই নেই? তোমার অবর্তমানে আমাব বংশ লোপ পেয়ে যাবে, এটাই কি তুমি চাও? উত্তেজনায় বৃদ্ধ কাঁপতে থাকেন।

প্রভাত দাতুকে এত বিচলিত হতে কখনও দেখেনি। একটু অপ্রতিভ হলো; কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে। স্বগতোক্তির মতো বলল, ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি বড়, গৃহেব চেয়ে দেশ বড়—তারপরে দাতুব মুখের দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্থির কণ্ঠে বলল, না না দাছ, কিছুতেই তোমার ঐ অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো না আমি।

সত্যপ্রসন্ন সমূহ বিপদ দেখে একটু ছলনার আশ্রয় নিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়লেন বেঞ্চে। প্রভাত তড়িৎগতিতে এগিয়ে এসে দাতুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, দাতু, দাতু—

সত্যপ্রসন্ন তাঁর কোটরগত নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে অতি ধীরস্ববে বললেন, দাতু ভাই, আমাকে কথা দে।

প্রভাত দাতুর এই অন্তিমেব প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে পাবল না। নীরবে সম্মতি প্রকাশ করল।

পরদিন সত্যপ্রসন্নকে দেখার জন্য প্রভাত সুব্রতকে ডেকে আনে। প্রিয়দর্শন সুব্রতকে দেখে সত্যপ্রসন্ন খুশী হন। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, ভালই তো আছেন, দাতু। তবে বয়স হয়েছে, সুস্থ থাকার পক্ষে সেটাই তো অন্তরায়। বিকেলের দিকে একটু জ্বরভাব হয়? সেটা হজমের গোলমাল। ভাল হজম হয় না নিশ্চয়?

সত্যপ্রসন্ন নিস্প্রাণ গলায় বললেন, কোনটাই আর ভাল হয়, দাদা।

আচ্ছা, একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, দিনে দুবার। খাওয়াব ঠিক আগে। এতেই মনে হয় সেরে যাবে। তা-ছাড়া আমি তো আছিই হাতের কাছে। যখন দবকাব মনে করেন ডাকবেন।

তৈলহীন প্রদীপের মতই সত্যপ্রসন্ন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। আবেগে গলা থর থর করে কাঁপে। কম্পিত স্ববে বললেন, হ্যাঁ ভাই, এই কথাটি যেন ভুলে যেও না। দেশের হাওয়া কোন দিকে বইছে, তা তোমাদেব অজানা নয়। স্বাধীনতার হুজুকে মেতে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে অন্ধকার কবে দিও না।

দাদুব কথাগুলি বড় এলোমেলো মনে হলো প্রভাতের—এমন কি সুব্রতেরও। শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে দেশের কি সম্পর্ক।

সত্যপ্রসন্নব মন কিছুদিন থেকেই অশান্ত। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছেন নাতি তার সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়েছে। এর অব্যর্থ ওষুধ বিয়ে। সুন্দরী বউ-এব আঁচলের তলায় সব মতবাদ চাপা পড়বে।

মহামায়া এসব কিছুই জানেন না। তিনি জানেন, ছেলে তাঁর দেশকে প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসে। দেশের স্বাধীনতাই তার একমাত্র কাম্য বস্তু।

মহামায়া শ্বশুবের জন্যে একবাটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকেই সুব্রতকে দেখে সহাস্যে বললেন, কখন এলে, বাবা ?

সুব্রত মহামায়াকে প্রণাম কবে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, একটু আগে।

প্রভাত বুঝি ডেকে নিয়ে এল ?

হ্যাঁ, মাসীমা।

বাবাকে দেখেছ নিশ্চয়, কেমন দেখলে ? শরীরটা ওঁর কিছুদিন থেকে মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

সত্যপ্রসন্ন তাঁর ফোগলা মুখে হাসির লহর তুলে বললেন, এবারে ভাল হয়ে যাব বৌমা। সুব্রত আমার কত বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে।

সুব্রতর মুখে একটু লাজুক হাসি, বলল, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না, দাছু।

মহামায়া এগিয়ে এসে শ্বশুবেব মুখেব কাছে ছুধেব বাটি তুলে ধবে বললেন, বাবা, ছুধটুকু খেয়ে ফেলুন।

সত্যপ্রসন্ন কচি ছেলেব মত মুখ ফিবিয়ে বললেন, না, আমি ছুধ খাব না। আচ্ছা, আমি কি কচি ছেলে যে কেবলই ছুধ গেলাবে। না, এ তোমাব ভারী অন্যায়, বৌমা।

মহামায়া হাসতে হাসতে বললেন, বেশ তো আমার ঘাট হয়েছে, এবাব যখন এনে ফেলেছি খেয়ে ফেলুন। আর আনব না।

সত্যপ্রসন্ন অপ্রসন্ন মুখে ছুধটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, একথা তুমি বোজই বল। না, তোমাব দেখছি কথাব মোটেই ঠিক নেই।

মহামায়া এ অভিযোগ শুনছেন বলেও মনে হলো না। শ্বশুরের ঠোঁটের ছুধটুকু তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে, পায়েব কাছেব সুজনীখানা খুলে সযত্নে গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

পরেব দিন ছুপুবে সত্যপ্রসন্ন খেতে বসেছেন। পরিবেশন করছেন মহামায়া। কোন ভূমিকা না করেই সত্যপ্রসন্ন বললেন, বৌমা, প্রভাতের আমি বিয়ে দেব।

মহামায়াব হাত কেঁপে খানিকটা সুক্তোর ঝোল ছলকে সত্যপ্রসন্নর পাতে পড়ে গেল। এ কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে কেউ যদি বলতো, আজ সূর্য পশ্চিমে উঠেছে তাও বুঝি এর চেয়ে বিশ্বাস করা যেত। মহামায়া অবুঝ চোখে শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সত্যপ্রসন্ন একটু রুষ্টস্বরে বললেন, কথাটা কি এমনই দুর্বোধ্য যে তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ!

মহামায়া নিজের মনে দু-তিন বার কথাটা উচ্চারণ করলেন, প্রভাতের বিয়ে—তারপরে বললেন, কিন্তু বাবা, সে রাজী হবে কি? অবশ্য তাকে আপনাব চেয়ে কে আর বেশী জানে।

সেই অধিকারেই বলছি, বৌমা—তার আমি বিয়ে দেব। সে আমাকে কথা দিয়েছে,—হ্যাঁ, তা এক রকম কথাই দিয়েছে।

কথা দিয়েছে! মহামায়া নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। ফিস ফিস করে বলেন, কথা দিয়েছে প্রভাত?

মহামায়ার ঐ অবস্থা দেখে সত্যপ্রসন্ন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, হ্যাঁ, বৌমা, কথা দিয়েছে সে। তবে সহজে ও কাজটি হয়নি। একটু ছল চাতুরী দরকার হয়েছে। অসুস্থতার আশ্রয় নিলাম, নাতি আমার ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল, আমি সে সুযোগ ছাড়লাম না। তখন আমাব কাতর অনুবোধে নীরব হয়ে বইল—মৌনই সম্মতির লক্ষণ সেকথা কি তুমি অস্বীকার করবে?

এ প্রশ্নের জবাব মহামায়াব কাছে সহজ নয়। তিনিও মৌন হয়ে রইলেন। তখন সত্যপ্রসন্ন ভাবলেন, আর গোপন করা ঠিক নয়। কেন যে তিনি নাতির বিয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা জানানো দরকার।

গম্ভীর স্বরে বললেন, বৌমা—

মহামায়া চমকে তাকালেন।

সোজাসুজি সত্যপ্রসন্ন প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সব জান?

বিস্মিত মহামায়া বললেন, কি?

প্রভাত যে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছে?

বজ্রাহত মহামায়া বললেন, এঁ্যা, আপনি এ বলছেন কি, বাবা!

ঠিকই বলছি। আমি যার কাছ থেকে শুনেছি, সে ঠিক খবরই দিয়েছে। শহরের এক প্রান্তে এক মুক্তানন্দ বাবা আশ্রম

খুলেছেন, সেটা আশ্রম নয়—সেটা সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা।

একথা বলে যখন সত্যপ্রসন্ন একটু চুপ করেছেন, তখন মহামায়া ভারী গলায় বললেন, কাল কি প্রভাত আপনার কাছে ঐ কথা স্বীকার পেয়েছে?

প্রভাত বলল, সেটা নাকি একটা আশ্রম, বললেন সত্যপ্রসন্ন।

তবে আর ভয় কি, বাবা। প্রভাত আমার মিথ্যা কথা বলার ছেলে নয়।

তুমি বঙ্কিমচন্দ্রেব 'আনন্দ মঠ' পড়েছ নিশ্চয়।

মহামায়া 'আনন্দ মঠ' পড়েছে বৈকি; ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি তার চোখে।

ভয় পেলে তো বৌমা? তাই মনে কবেছি, গোড়াতেই জড় নষ্ট করে দেওয়া ভাল। পরশু বাত্রে উমেশ এসেছিল, প্রভাতের একটা সম্বন্ধেব প্রস্তাব নিয়ে। আমি ভাবছি, কোষ্ঠী ঠিকুজিতে যদি মিল হয় তবে সেখানেই ঠিক করে ফেলব। শুনেছি মেয়েটি সুন্দরী এবং মোটামুটি শিক্ষিতা। তোমার ছেলের তো আবার লেখা পড়া না জানা হলে পছন্দ হবে না। তাছাড়া মেয়ের বাপ বাংলার বাইরে থাকেন। বাংলার বাইরে থাকা বাঙ্গালী মেয়েরা শুনেছি একটু প্রগতিশীলা হন। তাই তিনি ঠিক আমার চিরচঞ্চল নাতিটিকে সামলাতে পারবেন। বৌমা, তোমার মত আছে তো?

আপনার মতই আমার মত, বাবা। আপনি প্রভাতের কিসে মঙ্গল হয় যতটা বুঝবেন, স্বয়ং ভগবানও নিশ্চয় তার চেয়ে বেশী বুঝবেন না। এ আমার গভীর বিশ্বাস। কিন্তু প্রভাত যা খেয়ালী ছেলে, ভয় হচ্ছে।

সত্যপ্রসন্ন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, সেদিনের অভিনয় নেহাৎ মন্দ করেছি বলে তো মনে হয় না। শিশুর সারল্যে বৃদ্ধ হাসতে থাকেন।

হাসিটুকু মুখে রেখেই বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ভেব না।

প্রভাতের সম্বন্ধ সেখানেই ঠিক হয়েছে। প্রবীণ উকীল বিপিন ঘোষের ভাগ্নির সঙ্গে। কন্যার পিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোস, পাটনায় ডাক্তারি করেন।

এখন মাঘেব শেষ, ফাল্গুন মাসের দশ তারিখে বিয়ে। সত্যপ্রসন্ন তাই ভারী ব্যস্ত। তাব ছোট একতলা বাড়ীটির ভাঙ্গাচোরা মেবামত কবে, চূন ফিরিয়ে একেবাবে নতুন কবে ফেলেছেন। হঠাৎ মনে হলো সত্যপ্রসন্নেব, বাড়ীটা বড় বেশী ছোট। মোটে তিনটি মাত্র ঘর, কুলোবে কি কবে? একখানাই যা বড়, আর দু-খানা বেশ ছোট। আর সেই বড় ঘবখানাই দখল কবে আছেন সত্যপ্রসন্ন।

তিনি ভাবলেন, না, নাতবৌকেই বড় ঘরখানা ছেড়ে দেবেন। তাদেরই এখন সাধ আহ্লাদের বয়স। আমাব তো বাতে ঘুমই হয় না—বড় ছোট যা হোক একখানা ঘর হলেই চলে যাবে।

বাগানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সত্যপ্রসন্ন উমাচরণকে ডাকলেন—ভোব হলো নবাবের··· !

উমাচরণ এ ডাকটির জন্য প্রস্তুতই ছিল। কাবণ, রোজই কর্তা সকাল বেলায় তাকে নিয়ে বাগানের কাজ কবেন।

এগিয়ে এসে সহাস্যে বলল, এই যে কর্তা।

উঠেছিস তা হলে, দিন হয়েছে কি এখন, সেই থেকে ডাকছি, উমা—উমা—উমা, তা তুই ব্যাটা এতক্ষণে শুনতে পেলি!

আজ্ঞে, একবাব ডাকতেই তো সাড়া দিলুম।

ডেকেছি না হয় একবাব, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে মনে মনে তোর নাম কত বার করেছি বল তো?

আজ্ঞে, তা কি করে জানব।

তা জানবে কেন—কেবল চোপরা করতে জান।

প্রভু-ভৃত্যের এ ধরনেব আলাপ নতুন কিছু নয়। উমা অসন্তোষে মুখ কালি করে কর্তার পিছনে পিছনে বাগানে চলে গেল।

একটু পরেই দেখা গেল, কর্তা উমার সঙ্গে হেসে গল্প করছেন, জানিস উমা, নাতবৌটি আমাদের যেমন তেমন লোকের মেয়ে নয়। বাপ পাটনায় মস্ত বড় ডাক্তার। বিদেশের হালচালই আলাদা। তাইতো তোকে পঁই-পঁই করে বলছি, এমন করে বাগানটি সাজাবি, দেখে যেন খুশী হয় নাতবৌ। বাগান দেখে যেন আমার রুচির পরিচয় পায়। ভেবেছি বাগান সম্বন্ধে একটা বই লিখব। সে বইতে তোর নামও থাকবে।

উমা ভবিষ্যতের এমন উজ্জ্বল ইঙ্গিত পেয়েও, বিরসমুখে অনিচ্ছা সত্ত্বে খুঁড়পি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে থাকল।

কর্তা জানেন, আলস্যপরায়ণ উমা, কাজের চেয়ে গল্প অনেক বেশী পছন্দ করে, তাই তাকে ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নিতে হয়। তাই সামনে একখানা টুল পেতে বসে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তাঁকে এখন দেখলে মনে হয় না আটাত্তর বছরেব বৃদ্ধ। মনের আনন্দের দীপ্তি তাঁর সর্বাঙ্গে। দেশী ফুলের গাছেই বাগানখানা সাজান। জবা, বেল, টগর, ভুঁইচাপা, গোলাপ, চামেলী আরো কত কি। লাল গোলাপ প্রভাতের ভারী প্রিয়। সুব্রতদের বাগান থেকে চারা এনে নিজের হাতে লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ বসে আছেন সত্যপ্রসন্ন, উঠে দাঁড়িয়ে উমাকে ঝাজিয়ে বললেন, অমন বেগারঠেলা কাজ করতে তোকে কত দিন বারণ করেছি, কাজ হবে প্রাণের তুল্য প্রিয়—তবেই না সে কাজ সুষ্ঠুভাবে হবে। উমাচরণ কাজের সঙ্গে মুখ চালাতে থাকে, আসবে তো একটি ছোট্ট বৌ—তারি জন্যে এত! সবই যেন কর্তার বাড়াবাড়ি, নাতির যেন কেউ আর বিয়ে দেয় না।

সত্যপ্রসন্ন ধমকে ওঠেন, বেলফুলের ডালখানা ভেঙ্গে ফেললি তো। কাজ করতে বললেই হতভাগার রাগ।

উমা গজগজানির স্পিড্ বাড়িয়ে দেয়, কাজ করতে গেলে ভুল-চুক হয়েই থাকে—দেবতা নয় তো, মানুষ।

ধমক খেয়ে উমা সাবধান হাতে কাজ করে।

সত্যপ্রসন্ন মাধবীলতা গাছটির কাছে এসে দাঁড়ান। রোদে ঝলমল করছে চারদিক; তবু হঠাৎ তাঁর মনটা উদাস হয়ে যায়। ভাবেন, এ সব কি এখন আমার দেখার কথা? যার কাজ সে চলে গেল আটত্রিশ বছর বয়সে ফাঁকি দিয়ে। যোগেনের অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ল আমার কাঁধে। আর কত দিন এ ভার বহন করাবে আমাকে দিয়ে ভগবান!

গালের উপর বৃদ্ধের জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। এখন এখানে তো পরমুহূর্তে অন্যত্র। সত্যপ্রসন্নর মন অনেকগুলি বছরের উপর দিয়ে ছুটে, একেবারে যোগেনের বিয়ের দিনটিতে গিয়ে হাজির হলো।

বরবেশে যোগেন।

গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন, মাথায় টোপর, তনুদেহে গরদের জোড়—কী অপূর্ব দেখাচ্ছে!

বৃদ্ধ তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে চান। কপালের রেখা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় আরো গভীর হয়।

তার পরের দৃশ্য—যোগেন মহামায়াকে নিয়ে যেদিন প্রথম বাড়ী এল।

নববধূ মহামায়ার সে কী ঢলঢলে লাবণ্য! শ্যামলা রং টানাটানা চোখে শান্ত দৃষ্টি—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

সাচ্চা জরির কাজ করা সেকেলে ভারী বেনারসী পরে যোগেনের মা বধূ বরণ করছেন।

প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। যোগেনের মায়ের মুখে অননুভূত আনন্দের জ্যোতি।

বৃদ্ধ সত্যপ্রসন্নর বুক ভেঙ্গে গভীর একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

কোথায় গেল সেসব দিনগুলি!

আর একটি দিনের কথা স্মরণ হতে বৃদ্ধ বেদনায় আর্তনাদ করেন।

ও-দিনটিকে মনের নিভৃতে গোপন করে রাখতে চান।

এত বড় জোয়ান ছেলে, একটি দিনের কলেরায় মরে গেল। যখন রাত্রে শুতে গেল তখনও যোগেন আমার সঙ্গে কথা বলে গেল। তারপরের দিন আটটায় সব শেষ! প্রভাত ঠিক যোগেনের মতই দেখতে হয়েছে। সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, শ্যামল রং, মুখের গড়ন একটু লম্বা, প্রতিভাদীপ্ত সমুন্নত ললাট, তীক্ষ্ণ নাকের পাশে গভীর দৃষ্টি-সম্পন্ন দুটি চোখ, চিবুক একটু চাপা, সমস্ত মুখে বুদ্ধির অপূর্ব ব্যঞ্জনা। এ মুখ দেখলে সহজে কেউ ভুলতে পারবে না।

হরিপদ চাটুজ্জের ডাকে সত্যপ্রসন্ন আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসেন।

কে—

আজ্ঞে, উমার মুখে শুনলাম, আমাদের খোকাবাবুর নাকি বিয়ে?

হ্যাঁ চাটুজ্জে, ফাল্গুনের দশ তারিখে দিন ঠিক হয়েছে। তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

আজ্ঞে, দেশে ছিলুম।

এই হরিপদ চাটুজ্জে, যোগেনের মুহুরীর ভাই। এ রকম বোকা লোক সে আমলে বোধ হয় বেশী ছিল না—কিম্বা ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চেহারা ছিল কদাকার। কালো বেঁটে মোটা, থালার মত গোল মুখ, গরুর মত বড় চোখে নির্বোধ দৃষ্টি, নাক কোলা ব্যাংএর আকৃতি, যেমন চ্যাপটা তেমন মোটা, কান দুখানা কুলোকেও লজ্জা দেয়—এ হেন সুপুরুষের হাত-পা দেহের তুলনায় যথেষ্ট সরু।

কিন্তু লোকটি বড় সরল এবং ভাল মানুষ। এ গুণেই এ বাড়ীর সকলে ওকে ভালবাসে। যিনি যোগেনের মুহুরী ছিলেন, তিনি অনেক দিন আগে গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ছোট ভাইটি সরল স্বভাবের গুণে কখন যে সকলের মনে একটু স্থান করে নিয়েছে, তা

কেউ জানতেও পারেনি। এ পরিবারের সুখে দুঃখে সব সময়ই পাশে এসে দাঁড়ায়। তাই প্রভাতের বিয়ে শুনে সে তো ছুটে আসবেই।

বাগানেব কোথায় কোন গাছের চারা বসান হবে, সে বিষয়ে উমাকে নির্দেশ দিয়ে, সত্যপ্রসন্ন চাটুজ্জেকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে যান।

বসো চাটুজ্জে। তারপরে কেমন আছ?

চাটুজ্জের মুখে বোকা হাসি।

কোথায় আর ভাল আছি কর্তা। ছেলেটার জন্যে ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। কখন ক্যাঁক করে জেলে নিয়ে পুরবে সরকার—সে ভয়ে। শুনতে পাচ্ছেন না, রাস্তায়, ঘাটে মাঠে বন্দেমাতরম্ আর আল্লা-হো আকবর।

তোমার মত লোককেও ঐ ধ্বনি উতলা কবে তুলেছে, চাটুজ্জে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সোমত্ত ছেলে রয়েছে যখন। আর ভয়ের কথা যদি বলেন কর্তা, আমি তো মনিষ্যি, বনেব শেয়ালগুলো পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে যখন তখন ডাক বন্ধ কবেছে।

কর্তা প্রাণখোলা হো-হো হাসিতে ঘব ভরিয়ে ফেলেন।

তাই তো বলি, চাটুজ্জে না এলে কখনও জমে।

যাক এসব কথা। আমি এসেছি যে জন্যে তাই আগে আপনাকে নিবেদন করি। খোকাবাবুর বিয়ে নাকি কোলকাতায় হবে?

হ্যাঁ, কলকাতায় এসে মেয়েব বাবা বিয়ে দিয়ে যাবেন।

একগাল হেসে চাটুজ্জে বললে, সে খুব ভাল কথা। এ কথা শুনে থেকে ভাবছি, এ সুযোগ আর ছাড়ছিনে। আমার মনের একটা ইচ্ছে আপনার পূর্ণ কবে দিতে হবে কর্তা।

আরে বলই না কি ইচ্ছে, তারপরে ভেবে দেখব।

আজ্ঞে ভাবাভাবি নয়, কলকাতা শহরটি আমাকে দেখাতেই হবে। এ জীবনে না দেখলাম কলকাতা না চড়লাম রেলগাড়ী। এবারে আমার দুটো সাধই পূর্ণ করে দেন কর্তা।

সত্যপ্রসন্ন স্মিতহাস্যে বললেন, তা যাবেই তো। সকলে গেলে কি তুমি আর বাদ যাবে।

সে জোরটুকু মনে আছে বলেই তো ধেয়ে এলাম। এবার উঠি কর্তা, বিয়ের তো আর বেশী দেরী নেই। কাপড় জামা কিনতে হবে। কলকাতা যাওয়া কি চাবটি খানি কথা হলো। পেরায় বিলেতের কাছাকাছি, কি বলেন কর্তা?

সত্যপ্রসন্ন আর একবার ছাদ ফাটিয়ে হাসলেন।

চাটুজ্জে চলে যেতে কর্তা ভাবেন, বেশ আছে চাটুজ্জে। যত্র-তত্র গমন আর যেখানে সেখানে ভোজন—বেড়ে আনন্দে আছে। আর আমরা, যাবা বুদ্ধিব অহঙ্কার করি তাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলেই জীবন শেষ হয়ে গেল। আনন্দ করার কথা ভুলেই গেলাম।

মহামায়াব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চাটুজ্জে কর্তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আজ্ঞে, তা হলে কবে কলকাতায় রওনা হবো আমরা?

ন' তারিখ বিকেলে।

বেশ, আমি তাহলে আট তারিখ সকালেই আসব।

তাই এসো। বেশী দেরী করো না যেন। নিজের বাড়ির কাজ মনে করে সব করবে।

সে তো করবোই। এ তো আমার নিজের বাড়ীই বলতে গেলে। যত কাজ করব তত পেট ভরে খাব। কি যে আনন্দ হচ্ছে কর্তা, বুকখানা খুলে দেখাতে পারলে দেখাতাম।

সরস কণ্ঠে কর্তা বললেন, জানি চাটুজ্জে, তোমার ঐ বুকের আনন্দের স্পর্শ যে আমাব বুকেও লেগেছে।

রাত্রে মশারি গুঁজে দিতে দিতে মহামায়া প্রভাতকে বললেন, হ্যাঁরে, সেদিন থেকে তুই অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? বিয়ে কি একটা ভয়ের ব্যাপার!

সকলের পক্ষে সমান নয়, মা।

কেন, তোর পক্ষেই বা ভয়ের কি?

সে কি তুমি জান না ? মা, আমার প্রাণ দেশের জন্য—দেশের কাজে যে কোন মুহূর্তে এ-প্রাণ প্রয়োজন হতে পারে। আমার কি উচিত একটি মেয়ের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলা ?

মশারিসমেত হাতখানা মহামায়ার সেখানেই নিশ্চল হয়ে থাকে। চোখে ভয়ের ছায়া পড়ে। মাকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে, প্রভাত একটু হেসে বলে, ভয় পেলে মা ?

ছেলেব কথা শুনে, শঙ্কিত দৃষ্টি প্রভাতের মুখের উপর ফেলে বললেন, এ সব কী কথা! তুই যে আমার একমাত্র সন্তান। কান্নায় স্বর রুদ্ধ হয়ে যায় মহামায়ার। চোখের জল আঁচলে মুছে বললেন, ভারতমাতার আরো অনেক সন্তান আছে, কিন্তু আমার মাত্র একটি। অসহায় বিধবার আশা-ভরসা, নয়নের আলো। যাদের অনেক আছে তারা একটিকে ছাড়তে পারে—আমি ছাড়ি কি করে। না না না, সে আমি কিছুতেই পারব না।

প্রভাত নির্বাক্। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে সাহসে কুলায় না।

তুই ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, প্রভাত। আমি কিছুতেই ঐ বিপদের মুখে তোকে যেতে দেব না।

এবারেও প্রভাতের মৌনতা, মহামায়া সম্মতির লক্ষণ ভাবলেন। আর একথাও ভাবলেন, বিয়ের পর আর পাঁচটা ছেলের মত প্রভাতের মন ঘরমুখো হবে। যাওয়ার সময় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এবার ঘুমিয়ে পড়, বাবা। বড় বেশী ভাবিস তুই।

কিন্তু প্রভাতের চোখে ঘুম আসে না। স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বই পড়তে থাকে।

একটা জায়গায় চোখ আটকে যায়—"ভারত আজ যে ইউরোপীয়গণের পদানত, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে, ভারত সেই ইউরোপ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।" পড়তে পড়তে ভাবে, স্বামীজী বুঝেছিলেন, জাতীয়তাবাধের বিকাশের জন্য চাই আপন জাতির

সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ববোধ। তিনিই বলেছিলেন, "হে ভারত! ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" তিনি আরো বলেছিলেন, "মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

আবার নিজের চিন্তায় প্রভাতের মন ডুবে যায়।—তাই আমার ইচ্ছে ছিল আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলা। কিন্তু দাদুর চোখের জল আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করল। আমি এখনও অনেক দুর্বল, স্নেহ-ভালবাসা আমাকে বিচলিত করে। ইস্পাতের মত কঠিন হতে হবে। স্বামী মুক্তানন্দ বলেন, বিপ্লবোদ্দেশ্যে কোন কর্মই অন্যায় নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও দুর্বার হয়ে উঠেছিল বিপ্লব; অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমার দুর্ভাগ্য তখন আমি শিশু ছিলাম।

আমার দৃঢ় ধারণা সন্ত্রাসবাদের সহায়তায়ই বৃটিশ শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করা যাবে। বিনা রক্তপাতে কোন দেশ স্বাধীন হয়েছে কি? বেদনার সমুদ্র সাঁতরে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলোতে আসে। সকল মহৎকর্মের পূর্বেই আছে বেদনা—আছে দুঃখ।

ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হলেও চাই মূল্য—আর দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কি কোন মূল্যই দেব না? কিছু জীবন-দান কি খুব বেশী মূল্য হলো?

চঞ্চল রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় তরুণ দেহটির শিরা-উপশিরায়। কোন এক সময় নিদ্রাদেবীর কোমল করস্পর্শে প্রভাত ঘুমিয়ে পড়ে। মহামায়া রোজই শোবার আগে ছেলের ঘরে ঢুকে দেখে যান, সব ঠিক আছে কিনা। আজও এসে দেখেন টেবিলের উপর আলো জ্বলছে, প্রভাত চেয়ারে বসে, খোলা বইয়ের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। হ্যারিকেন তুলে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকেন। মহামায়ার মনে হয় এ যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। প্রভাতের অবিন্যস্ত চুলগুলি সস্নেহে ঠিক করে দেন। তারপরে আস্তে কপালে হাত দিয়ে ডাকেন, প্রভাত—

প্রভাত ঘুম ভেঙ্গে চমকে তাকায়। মহামায়া বলেন, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হলো।

পরের দিন সকালে সত্যপ্রসন্ন ঘুম থেকে উঠেই বললেন, বৌমা, আর একটু বেলা হলে উমাকে পাঠিয়ে সুব্রতকে ডেকে এনো।

কেন বাবা, শরীরটা ভাল নেই ?

না, শরীর ভালই আছে। প্রভাত কোথায়, ঘুমোচ্ছে নাকি ?

না বাবা, সে অনেক আগেই উঠেছে।

এই সব ছোটখাট কথা শেষ করে সত্যপ্রসন্ন বাগানে গেলেন। নবোদিত সূর্যালোকে বৃদ্ধকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। গেট খুলে সুব্রত ভিতরে ঢুকে বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছেন, দাদু। সকাল বেলাই আমার তলব পড়েছে শুনে, বেশ একটু ভয় পেয়েছিলাম।

না দাদা, ভয়ের কিছু নেই। চল ভেতরে। তোমার সঙ্গে জরুরী গোটা কতক কথা আছে। আচ্ছা সুব্রত, প্রভাতের বিয়ের দিন তো নিকটে এসে গেল, কিন্তু নাতির আমার সংশয় এখনও আছে বলেই মনে হচ্ছে। তুমি ওর বন্ধু, তোমার কাছে কিছু বলেছে কি ? আমার কিন্তু ভারী ভয় হচ্ছে। শেষটায় না বেঁকে বসে।

সুব্রত একটু হেসে বলল, ভয়ের কিছু নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাঁচালে দাদা। বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে ছোঁড়া। আর শোন—তোমার কিন্তু বরযাত্রী যেতে হবে। তুমি যাবে বলেই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে দূরের রাস্তায় যেতে সাহস পাচ্ছি।

সেকথা প্রভাত আমাকে বলেছে, দাদু। দেশের যত ভাবনাই ভাবুক, আপনার ভাবনা ওর সকলের উপর।

এ-কথায় বৃদ্ধের মুখ করুণ এক তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল দেখায়। ধীরে বলেন, নাতি আমার গভীর জলাশয়। তলদেশের স্পন্দন উপরে সাড়া জাগায় না।

সুব্রত বুঝতে পারল, তাকে দিয়ে দাদুর এখন আর কিছু প্রয়োজন নেই। বলল, দাদু আমাব রুগীর দল বসে আছে, চলি তা হলে।

হ্যাঁ দাদা, তুমি কাজের মানুষ, তোমাকে আর ধরে রাখব না।

যাওয়ার সময় সুব্রতর সঙ্গে প্রভাতেব দেখা হয় বৈঠকখানায়। মক্কেল পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে প্রভাত। কুশলপ্রশ্ন ছাড়া আর কিছু কথা হয় না।

এই ক'টা দিন দেখতে দেখতে চলে গেল। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভবে গেছে। শিশুব কান্না, যুবতীব হাসি, বৃদ্ধেব কাশি, সব মিলিয়ে এক সুরতরঙ্গ বয়ে চলেছে। সত্যপ্রসন্নব জীবনের এই শেষ কাজ আব মহামায়ার জীবনের প্রথম, কোথায়ও যেন আনন্দের ত্রুটি না হয়।

উমাচবণ কাজের চেয়ে গল্প করছে অনেক বেশী। তাই কর্তার কাছে ধমকও খাচ্ছে।

প্রভাতেব বিশেষ একটা দরকারী কথা মনে পড়ায় সুব্রতর বাড়ী গেল।

এই যে প্রভাত—

প্রভাত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আমি যে, না দেখেই বুঝলে কি কবে?

সুব্রত মুচকি হেসে বলল, এটা এমন শক্ত প্রশ্ন কি—এমন পদধ্বনি আর কারো আছে বলে তো আমাব জানা নেই। মাটির যদি প্রাণ থাকত তবে তোমার পদাঘাতের আশঙ্কায় ভয় পেত।

বন্ধুর পিঠে থাপ্পড় দিয়ে প্রভাত বলল, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। যাক—আজকের খবর পড়েছ নিশ্চয়।.

'মণ্ট-ফোর্ড' শাসন-সংস্কারের কথা বলছ তো? কিন্তু আমাব কি মনে হয় জান, এটা চতুর ইংরাজের ভারতবাসীকে একটু শান্ত করে রাখার চেষ্টামাত্র। তবে এত অল্পেতে শান্ত হওয়া আমাদের উচিত হবে না। তাছাড়া ভেবে দেখ, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হওয়ায় বিভেদ সৃষ্টি হবেই। বিভেদ সৃষ্টি হবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও। এ থেকেই ভারতে জাতীয় ঐক্যের মুখে প্রথম কুঠারাঘাত শুরু হবে। দেখবে, এর ফলে আমবা নিজেরাই নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতার অন্তরায় হবো।

তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, সুব্রত। কিন্তু আমি এখন সেদিক থেকে ভেবে দেখছি না। আমার লক্ষ্য ভারতকে স্বাধীন করা। তা যে প্রকাবেই হোক। হিন্দুর চেষ্টায় অথবা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চেষ্টায়, সেটা বড় কথা নয়। মোটের উপর আমি স্বাধীন ভারতে বাঁচতে চাই—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—ভরাট গলার কণ্ঠস্বর ঘরখানায় কাঁপতে থাকে। মুষ্টি আস্ফালন করে প্রভাত বলল, সুব্রত, প্রতিটি পল-অনুপল আমার কাছে প্রত্যাশায় ভরা।

এমন সময় উমা এসে জানায়, প্রভাতকে কর্তা ডাকছেন। প্রভাত দু-এক পা এগিয়েই পিছন ফিবে বলল, এই যা—যা বলতে এসেছিলাম তাই তো বলা হলো না।

সুব্রত হেসে বলল, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা নিশ্চয়?

হ্যাঁ, তা-তো যাবেই। কিন্তু আমার কথা হলো আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ দাদু যাচ্ছেন, ধর পথে যদি কোন অসুখই হয়ে পড়ে, তবে চিকিৎসার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়। মানে সব কিছুর জন্যে তুমি প্রস্তুত থেকো।

কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে সুব্রত বলল, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, ডাক্তারকে তার ডিউটি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছ।

প্রভাত দরাজ গলায় হেসে বলল, আচ্ছা ডাক্তার, চলি।

বাড়ীর গেটের সামনেই চাটুজ্জের সঙ্গে প্রভাতের দেখা। আশা করি, আপনারা হরিপদ চাটুজ্জেকে এরই মধ্যে ভোলেননি। প্রভাত চাটুজ্জের অভিনব পোষাকের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, এই যে চাটুজ্জে কাকা, আপনার কথাই দাত্ব বলছিলেন।

হে-হে করে পাক্কা পাঁচ মিনিট হেসে চাটুজ্জে বলল, তা-তো বলবেনই, তা-তো বলবেনই। আরো আগেই আসতুম খোকাবাবু, এই জামাটার জন্যেই দেরী হলো। দরজী ব্যাটা কি কম ভোগালে। আমার গায়ের নাকি কোট বানান যায় না। ব্যাটা বলে কি জান? ঢের ঢের লোক দেখেছি, এমন কোলা ব্যাংএর মত বেঢপ দেহ আর দেখিনি। বুকের ছাতি ঠিক হলো তো, ভুঁড়িতে আটকে পড়ল—চওড়ায় ঠিক হলো তো ঝুলে হাঁটু পর্যন্ত।

প্রভাত একটু শব্দ করেই হেসে বলল, ব্যাটার সব মিথ্যে কথা, আপনি দাত্বর কাছে যান।

চাটুজ্জে ঘরে ঢুকতেই সত্যপ্রসন্ন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

তারপরেই বললেন, আরে চাটুজ্জে যে, ভারী সাজ-গোজ করে এসেছ! বৃদ্ধের বালরেখাঙ্কিত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। অপাঙ্গে চাটুজ্জে নিজের পোষাকের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, অনেক হাঁটা-হাঁটি করে চাটুজ্জেকে এই নতুন ডিজাইনের কোটের কাপড়টি হস্তগত করতে হয়েছে। ধূসর রঙের জমির উপর নানা রঙের ডোরাকাটা, এমন বাহারে কাপড় কি সহজে মেলে! গলাবন্ধ কোটটির একটা বড় জোর ছুটো বোতাম লাগান চলে, তারপরেই ভুঁড়িতে আটকে যায়। তাই ভুঁড়িটি নির্লজ্জর মত মুখ বাড়িয়ে হাসছে।

ভুঁড়ি না ঢাকার লজ্জা কোটটি ঝুলে পুষিয়ে দিয়েছে—হাঁটু থেকে মাত্র ছু-আঙ্গুল উঁচুতে আছে। পায়ে অবশ্য নতুন খয়েরী রঙের কেড্‌স্। ধুতির উপর চাটুজ্জের বোধহয় তেমন নজর নেই। সেই মামুলী মোটা খাটো খদ্দরের ধুতি। চাটুজ্জের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি।

উমা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, আরে এ করেছেন কি চাটুজ্জে দাদা! ছেলেরা দেখলে ভয় পাবে যে।

নির্বোধ চাটুজ্জে একে প্রশংসারই নামান্তর মনে করে।

বিরাট মুখে হাসিব ঝলক তুলে বলল, খোকাবাবুব বিয়ে, আবাব যাচ্ছি কোথায় না কলকাতায়, এটুকু সাজ কি বেশী হলো! জামা-জুতো সামলে চাটুজ্জে ভিতব বাড়ীতে মহামায়ার সঙ্গে দেখা কবতে গেল। বারান্দায় বসে প্রভাতের এক পিসী বিয়ের কি সব যোগাড় করছিলেন, চাটুজ্জে বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হেসে বলল—

পিসীমা এসে গেছেন দেখছি।

বিয়ের আর বাকী কি বল, আজও আসব না। তা তোমার এত দেরী কেন?

আর বলবেন না, পিসীমা—এই জামাটা আমাকে বড্ড ভুগিয়েছে; তাই দেরী হলো।

মানদাসুন্দবী (পিসীমা) গালে হাত দিয়ে বললেন, করেছ কি চাটুজ্জে, একী সাজের ছিরি। কলকাতার লোকেবা তোমায় ছাড়লে হয়।

পিসীমাব ছেলে ঘরে ঢুকে বলল, আবে বাব্বাঃ! এ-যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

চাটুজ্জে এমন একটা গালভরা মন্তব্য শুনে বিস্ময়ে চোখ বড় করে বললে, সেটা আবাব কি?

এমন সময় মহামায়া এসে পড়েছেন, বললেন—ছিঃ পটলা, কেন ওর পিছনে লেগেছিস। আসুন চাটুজ্জে মশাই—

পাশের ঘরে চাটুজ্জেকে ডেকে নিয়ে মহামায়া পরিতোষ করে জলখাবার খাইয়ে হেসে বললেন, এবারে পোষাকী জামাজুতো খুলে কাজে হাত লাগাতে হবে ভাই। কাল যে বাড়ীতে ছোটখাটো একটা যজ্ঞি, তা জানো তো।

কাল প্রভাত যাত্রা করে বিয়ে করতে রওনা হবে কলকাতায়, এই

উপলক্ষে জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেরই এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকবে। এ প্রথা পূর্ববঙ্গে চালু ছিল।

সে আবাব জানি না বউঠান। বলে চাটুজ্জে আকর্ণ বিস্তৃত করে তাব পেটেন্ট হাসি মিনিটখানিক হেসে বলল, খোকাবাবুর বিয়েতে দবকার হলে এঁটো পাতা পর্যন্ত ফেলব।

চাটুজ্জের কথা শুনে মহামায়ার বুকের মধ্যে ছলছলিয়ে ওঠে। চোখে জল এসে যায়।

ন'তারিখ খুব সকাল থেকেই ব্যস্তবাগীশ সত্যপ্রসন্ন সকলকে তাড়া দিতে লাগলেন, তোরা ষ্টীমার ফেল না করিয়ে ছাড়বি না দেখছি। এখনও কোন কাজ হয়নি। ফাল্গুনের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

উমা মাজা বাসনগুলি নিয়ে রান্না ঘরে যেতে যেতে বলল, এইমাত্র কালেক্টবীর ঘড়িতে সাতটা বাজল কর্তা, ষ্টীমার ছাড়বে সেই বিকেলে।

তুই চুপ কর তো উমা—দেখছি, তুই-ই ষ্টীমার ফেল করাবি।

বাসনগুলি রেখে, নিজের নাককান মলে উমা উষ্ণ গলায় বলল, আব যদি আপনাব কোন কথায় আমি থাকি, কর্তা। আপনি এখনই গিযে ষ্টেশনে বসে থাকুন, আমার কি।

সকাল থেকেই প্রভু-ভৃত্যেব এই মধুব আলাপে সকলেই হাসে।

অস্থির পদক্ষেপে মহামায়ার কাছে গিয়ে সত্যপ্রসন্ন বললেন, যাত্রার সব আয়োজন ঠিক আছে তো বৌমা? আর সময় কিন্তু বেশী নেই।

মহামায়া স্নিগ্ধ একটু হাসি মুখে রেখে বললেন, সব ঠিক আছে, বাবা।

তথাপি সত্যপ্রসন্ন স্থির হতে পারছেন কই?—আরে চাটুজ্জে কোথায় গেল। সেজেগুজে বসে আছে নিশ্চয় কোথায়ও। নাঃ, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়াই হবে না দেখছি।

উঠোনের পুবদিক থেকে চাটুজ্জেব গলার স্বর ভেসে আসে, আজ্ঞে কর্তা, জেলেবা মাছ এনেছে, দেখে নিচ্ছি।

বেশ, বেশ, সব দেখে শুনে করো বাবা।

বোন মানদা এসে বললেন, তুমি একটু স্থির হয়ে বসো দাদা। আমবা তা হলে আছি কেন।

হবো, হবো বোন—একদিনই স্থিব হবো, তার আগে আর নয়। বলে, গভীর একটি নিঃশ্বাস ফেললেন সত্যপ্রসন্ন। তাঁর ধারণা, তিনি ব্যস্ত না হলে কোন কাজই হবার নয়। চকিতদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁবে মানু, খুব আমাকে তো বসতে বললি, গয়লা দৈ নিয়ে এসেছে?

না দাদা, এখনও আসেনি।

তবেই ছ্যাখ, চুপ করে থাকি কি করে? উমা—উমা, কোথায়ও নির্ঘাত ডুব মেরেছে।

বেজাব মুখে এসে উমা বলল, আবার আমাকে কেন?

তোমার ঐ শ্রীমুখখানা দর্শন কবতে। হতভাগা, এখনও পর্যন্ত যে দৈ এসে পৌঁছল না, সে খেয়াল আছে তোর?

এখন তো ন'টাও বাজেনি, যাবেন তো সব মধ্যাহ্নে।

ব্যাটা আবার সাধু ভাষায় কথা কয়! বলি মধ্যাহ্ন হতে আর দেরী কত? একটা কেলেঙ্কারী না করে তুই ছাড়বি না দেখছি। এমন সময় ঘোষকে দৈ নিয়ে আসতে দেখে কর্তা লজ্জিত হয়ে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ান।

উমা বিরস মুখে বলল, সেই আসা এলে ঘোষ, মাঝখান থেকে আমাকে গাল-মন্দ শুনতে হলো।

যাত্রার সময় যত নিকট হতে লাগল, তাড়াহুড়ো ব্যস্ততা সবই যেন সত্যপ্রসন্নর গভীর একটা অবসাদে ডুবে যেতে লাগল। বর্তমান উৎসবের কিছুই যেন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। অবসন্ন

দেহমন অতীতের কোলে আশ্রয় নিল। যোগেন আর তার মার কি এ উৎসবে কোনই অংশ নেই। সব আমার উপর ফেলে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আর আমার কি আর সে বয়স আছে, না সামর্থ্যই আছে, এটুকু তারা বুঝল না।

অভিমানে বৃদ্ধের রক্তহীন ঠোঁট দুখানা কাঁপতে থাকে। ঘোলাটে স্বল্পদৃষ্টি চোখকে প্রখর করে অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী-পুত্রকে খোঁজেন।

তুমি এখানে বসে আছ, দাদা—আর আমি কিনা ছিষ্টি খুঁজে মরছি।

মানদাসুন্দরী দস্তুরমত হাঁপাচ্ছেন। বাগানের নিরালা একটি কোণে চুপ করে বসে আছেন সত্যপ্রসন্ন। মানদা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, প্রভাতকে যাত্রা করতে পিঁড়িতে বসিয়েছি, তুমি এসে আশীর্বাদ কর।

মন্থর গতিতে সত্যপ্রসন্ন গিয়ে সেখানে দাঁড়ান। প্রভাতের কাছেই যোগেনের ফটোখানা একখানা জল-চৌকির উপর রাখা হয়েছে। প্রভাত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

মহামায়া বার বারই আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটোকে মুছে ফেলছেন। স্বামীর কথা কেবলই মনে পড়ছে। কত দিনের কথা, তবু আজও কেমন পরিষ্কার মনে আছে। বলেছিলেন, মায়া, প্রভাতের আমি সুন্দর বউ আনব, দেখে বরিশালের লোকের তাক লেগে যাবে। সেদিন অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলাম, আমি কালো বলে তোমার মনে দুঃখ আছে। শুনে খুব হাসলেন, বললেন, তুমি কালো কি ফর্সা; কই, তা কোন দিন তো ভেবে দেখিনি। তুমি মহামায়া এইটুকুই শুধু জেনেছি। ছেলের মতই মানুষটা আপনভোলা ছিল।

মহামায়ার অতীত জীবনের কত মধুর স্মৃতি ফুলঝুরির মত আলো ছড়িয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

পাত্রীপক্ষের লোক বিপিনবাবু তাড়া দিলেন, সময় কিন্তু বেশী নেই। মঙ্গলাচরণ শেষ হয়ে গেলে, প্রভাত আগে দাদুকে প্রণাম করে। পরে অনেক দিন আগেব স্মৃতির আবরণ সরিয়ে, আবছা অস্পষ্ট পিতার মুখ স্মবণ কবে প্রভাত যোগেনের ফটোতে নত হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করল। তাবপর প্রণাম করল মাকে। মহামায়া চমকে উঠলেন, পায়ে তপ্ত চোখের জল পড়তে, গভীর আবেগে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে কপালে চুম্বন করে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ কবলেন। আনন্দ-বেদনায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে তাঁব মন।

অন্যান্য গুরুজনদেব প্রণাম কবল প্রভাত। পিসীমার চোখে জল ভরে এসেছে, তার সঙ্গে হাসি ঝিকমিক কবছে, প্রভাতকে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করাব সময় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ওর মাথায়। প্রভাত চকিত দৃষ্টিতে পিসীর মুখের দিকে তাকাল।

মহামায়ার সব কিছুর আগে শ্বশুবের চিন্তা। সুব্রতকে বার বাব মনে করিয়ে দেন বৃদ্ধ শ্বশুরেব কথা। শ্বশুরকে সাবধান করেন শিশুর মতন। উমাকে ডেকে বললেন, উমাচবণ, বাবার নাওয়া খাওয়ার সময়ের যেন নড়-চড় না হয়।

ত্রিশজন বরযাত্রী নিয়ে সত্যপ্রসন্ন বিপিনবাবুর তদারকে রওনা হন কলকাতায়। ববযাত্রীদেব নানা রকম আবদার মেটাতে বিপিন-বাবু হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মেয়েপক্ষ যখন—মুখটি বুজে সইতে হবে।

চাটুজ্জের ভারি আনন্দ। ষ্টীমাবে উঠেই ছেলে-ছোকরার দলে ভিড়ে পড়েছে। ষ্টীমারযাত্রা চাটুজ্জের জীবনে এই প্রথম। নৌকো, আর গরু ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহনে চড়েনি। একবার বুঝি শিশু বয়সে পালকি চড়েছিল। ছেলেরাও তাকে নিয়ে খুব স্ফুর্তি করছে।

অগাধ জলরাশির দিকে তাকিয়ে চাটুজ্জের গা-টা শিউরে উঠল—

ডুবেও তো যেতে পারে ষ্টীমার, তা হ'লে। ভয়ে কণ্ঠ তালু শুকিয়ে যায় তার। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল কানাই, তাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, ষ্টীমার ডুবতেও তো পারে?

হ্যাঁ, তা পারে বৈকি। তেমন তেমন বুঝলে লাইফ বোটে করে পৌঁছে দেবে।

চাটুজ্জে বড় বড় চোখ করে ইংরেজি শব্দটির মানে বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু উঁহু, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

কানাইর মুখের উপব ভীত-চকিত দৃষ্টি ফেলে চাটুজ্জে বলল, সকলকে নেবে, যাবা ধর ইংবেজি জানে না তাদেরও?

কানাইর পক্ষে চাটুজ্জেকে নাস্তানাবুদ না করে ছাড়া অসম্ভব।

গম্ভীর মুখে বলল, কি যে বলেন, সাহেব কোম্পানী ইংরেজি না-জানা লোকদের কোন কেয়ারই নেবে না।

বলিস কি! যারা ইংবেজি জানে না তারা ডুবে মরবে! চাটুজ্জে ক্রোধে লাফিয়ে উঠল। আরক্ত মুখে বলল, একথা তোরা আগে বলিসনি কেন? সাধে কি আর দেশের লোকেরা শা—। কানাই চাটুজ্জের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, আ-হা-হা, করেন কি চাটুজ্জে মশাই, কোম্পানীর লোকেরা শুনতে পেলে আপনার আর বরযাত্রী যেতে হবে না, একেবারে শ্রীঘরে চালান করে দেবে।

জেলের ভয়ে চাটুজ্জের এত বড় দেহটা কুঁচকে যেতে লাগল। তা দেখে ছেলের দল হাসিতে ফেটে পড়ল।

ষ্টীমারযাত্রা শেষে যখন ট্রেনে উঠল সকলে, তখনও চাটুজ্জে বুঝতে পারল না, এই তার অতি ঈপ্সিত রেলগাড়ী। সকলেই যখন বলছে ট্রেন, তাহলে রেলগাড়ী এ নয়। ট্রেনে উঠে পটলাকে বলল, হ্যাঁরে, রেলগাডীতে উঠব কখন?

ছেলের দল হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। তা দেখে, বিষম রেগে গেল চাটুজ্জে। ক্রুদ্ধস্বরে বলল, হাসছিস কেন? হাসির

কথা হলো এটা ! জানিস না তাই বললেই হয়। আমি বরং কর্তা মশাইব কাছে জেনে আসি।

কর্তা চাটুজ্জেকে দেখে বললেন, কি, কিছু বলবে নাকি ?

আজ্ঞে, আমরা বেলগাড়ীতে কখন উঠব ?

কামরাটা বুঝি হাসিব তোড়ে ভেঙ্গে যাবে। হাঃ-হাঃ হো-হো হি-হি শব্দে গমগম কবতে লাগল।

কর্তা হাসিব ধাক্কা সামলে বললেন, তবে বসে আছ কোন গাড়ীতে ?

আজ্ঞে, এতো ট্রেন গাড়ী।

বুঝলে চাটুজ্জে, যাব নাম ট্রেন, তার নামই রেল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেয়ের বিয়েতে ঘটা করলেন বেশ। দেওয়া-থোওয়া দেখে সকলেই প্রশংসা করেছিলেন।

বিয়ের ঠিক পরে স্ত্রী-আচারেব সময় প্রভাতকে অনেক নাকাল হতে হয়েছে মেয়েদের হাতে। কিন্তু নাকাল হওয়ার মধ্যেও যে আনন্দ আছে, প্রভাতকে তা মানতেই হলো। এত দিন যা ভাবতেও পাবেনি তাই হতে চলেছে। কেমন এক ধরনেব নেশাব মত। মনটা যেন মাতাল হয়েছে। একটু চপল হাসি, তুচ্ছ কথার মধুর ঝঙ্কার বেশ লাগছে। যেন নতুনতর এক রসের তুফানে তলিয়ে যাচ্ছে।

এব মধ্যে বঞ্জনা বলে মেয়েটি বেশ চতুব—খুব জমিয়েছিল। সে-ই বলল, প্রভাতবাবু, চললুম আমরা। প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে বুদ্ধিতে সান দিন কাল যাতে না হেরে যান। খিলখিল করে হাসির লহর তুলে সকলে চলে গেল।

প্রভাত উঠে দরজা বন্ধ করল।

সেদিনটি ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। চাঁদের হাসির সত্যি বাঁধ ভেঙ্গেছে। জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলছে ঘরে।

প্রভাত ইলেকট্রিক লাইটটা নিবিয়ে দিল। তেলেব প্রদীপটি জ্বলছে বরন-ডালার ওপর।

বাসরসজ্জায় বসে নববধূ। যেন স্বপ্ন দেখছে প্রভাত। কিন্তু এ স্বপ্নের জন্যে সে কোন দিনই প্রস্তুত ছিল না। নববধূব মুখোমুখি বসে প্রভাত ভেবে পায় না কি বলা উচিত। এসব নিয়ে ভেবেছে কবে সে? কিন্তু চুপ করে থাকাটা যে নেহাৎ-ই বোকামী হচ্ছে, সেটা তো বুঝতে পারছে। কিছু না ভেবে-চিন্তেই বলল, তোমাব নাম কি?

লজ্জা-মাখানো অথচ সপ্রতিভ চোখে প্রভাতেব দিকে তাকিয়ে দীপ্তি বলল, আপনাব তো খুব স্মরণশক্তি! বিয়ের সময় কত বারই তো শুনলেন—এব মধ্যে ভুলে গেলেন?

বেশ জোবে হেসে প্রভাত ওর দুটি গাল একটু টিপে বলল, গেছেন নয় গেছ।

প্রথম পুরুষস্পর্শে দীপ্তির গাল বক্তগোলাপের মত বাঙ্গা হয়ে ওঠে। আবেশে চোখ বুজে আসে। তরুণ প্রভাত মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দীপ্তির আবেশ-বিহ্বল দুখানি কোমল হাত নিজের প্রশস্ত হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তোমাব নাম কে বেখেছিলেন?

আমাব মা।

নামের সঙ্গে রূপের এমন সার্থক সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। রূপ অনেকেরই থাকে, কিন্তু এমন দীপ্তি বড় একটা চোখে পড়ে না।

প্রভাত বেশী কিছু বলতে পারে না। নীবব দৃষ্টি দিয়ে সব কথা বোঝাতে চায়। দীপ্তিব দেহে যেন জাদু আছে—চোখ ফেরাতে পাবে না প্রভাত। দাদুকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায়—না, বিয়ে করতে হলে দীপ্তির মত মেয়েকেই করতে হয়। কোন আড়ষ্টতা নেই এব স্বভাবে। বেশ সহজ সপ্রতিভ।

শুয়ে পড়ে দুজনে। নিবিড় ঘনিষ্ঠ হয় দুটি হৃদয়। কুহেলিকা রাত্রির মায়ার ছলনায় ভুলে যায় সব কিছু। শুধু দুটি প্রাণ অসহ্য

আনন্দের আবেগে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ওরা।

পূর্ণিমার চাঁদ ছড়িয়ে দেয় হাসি ওদের মধুযামিনীর ফুলবাসরে। উতলা দক্ষিণ হাওয়া চুম্বন কবে ওদের নিদ্রিত কপোল। দীপ্তির সুন্দব সুগোল একখানা হাত ফুলের মালাব মত পড়ে থাকে প্রভাতেব পৌরুষদীপ্ত বক্ষের ওপর।

ছায়াপথেব মাঝখানে ডুবে যায় অজস্র তারকা, শুকতারা দপদপ কবে জ্বলতে থাকে আকাশের এক কোণে।

পাপিয়ার আকুল গানে বিশ্বভুবন একাকার হয়ে গেছে, অদূবে কোন বিরহী বঁধুব হৃদয়ের গহনে জেগে উঠেছে একটি করুণ গানেব রেশ—ভোরেব বাতাস, ধীরে কোথা যাস, যাস বঁধুয়ার দেশে···

সকাল হতে প্রভাত দরজা খুলে দিতে, বানের জলের মত মেয়েব দঙ্গল ঘরে ঢুকে পড়ল।

মলিনা হেসে বলল, সুপ্রভাত, প্রভাতবাবু।

প্রভাতের চাপা ঠোঁটে মৃদু একটু হাসি, আমিও জানাচ্ছি, সুপ্রভাত আপনাদের সকলকে, বলল প্রভাত।

রঞ্জনা বলল, কেবল হেসেই ছাড়া পাচ্ছেন না, টাকা বের করুন।

কিসেব? বলল প্রভাত।

আপনি বেশ লোক মশাই, আপনাদের বিয়েতে আমরা যে এত খাটলুম, তা আমাদেব সন্দেশ খেতে টাকা দেবেন না?

প্রভাত মুখ টিপে হেসে বলল, সন্দেশ তো আমাকেই আপনাদেব খাওয়ান উচিত। আপনাদেব আমি অতিথি, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েদের সরিয়ে এবার যুদ্ধক্ষেত্রে ঠাকুমা অবতীর্ণ হলেন। বললেন, ভাই সন্দেশের চেয়ে অনেক মিঠে, মধুর মত মিষ্টি নাতনী দিলুম—তবু সন্দেশ আমাদেরই খাওয়াতে হবে? তুমি তো দাদা কম চশমখোর নও।

হিয়ার-হিয়ার বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল এ ওর গায়ে।

প্রভাত নাটকীয় ঢং-এ মুখ কাঁচুমাচু করে বিনীত স্বরে বলল, আমার হার হয়েছে, ঠাকুমা। তারপরে হেসে পাশে দণ্ডায়মান উমাচরণের দিকে তাকাল।

এ দিকে কর্তা ভোর হতেই উমাকে সময় উপযোগী তালিম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রভাতের কাছে।

উমা মুরুব্বী চালে প্রভাতের হাতে টাকার ব্যাগটি দিয়ে, গর্বিত ভাবে সকলের দিকে তাকাল।

প্রভাত ব্যাগ খুলে পঞ্চাশটা টাকা রঞ্জনার হাতে দিয়ে সেদিনের মত নারীব্যূহ ভেদ করে চলে গেল।

প্রভাত চলে যেতে রঞ্জনা দীপ্তিকে বলল, তোর বর ওকালতীর একটি চালে আমাদের ন্যায্য পাওনাটা প্রায় ফাঁসিয়ে দিয়েছিল আর কি। ভাগ্যিস আমাদের দিকে ঠাকুমার মত ঝানু ব্যারিষ্টার ছিল। এমন পয়েন্ট ঝেড়ে দিলেন যে, উকিলবাবু সুড় সুড় করে টাকা বের করল। তোর কালো বরটি কেবল চালাক নয়—বেশ রসিক আছে। বলে, রঞ্জনা কীর্তনের সুরে গান ধরল—রসিক নাগব কালিয়া তোমার—

খিলখিল করে হাসির শব্দে যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

এমন সময় দীপ্তিব মাসীমা এসে বললে, দীপ্তি উঠে আয়, বেলা অনেক হলো, একটু দুধ মিষ্টি মুখে দে এসে।

বরযাত্রীরা ভূরিভোজন এবং বধূ দর্শনে সকলেই তৃপ্ত।

আজ রওনা হবেন সত্যপ্রসন্ন, নাতবউ নিয়ে বরিশাল। সকলকে বারবার গুনে নিচ্ছেন, যেন কেউ থেকে না যায়। উমার সঙ্গে এ দুদিন কোন খিটিমিটি হয়নি, আজ তাও দু-এক বার হয়ে গেল।

তবু মন আজ খুশীতে কানায় কানায় পূর্ণ—কোন কিছুতেই মনের শান্তি নষ্ট হচ্ছে না।

চাটুজ্জেব হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বিলেত থেকে দেশে যাচ্ছে। বেশ ভাবিক্কি চালে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছে। গাড়ীতে উঠেও বেশ গম্ভীর হয়ে বইল।

ট্রেন এসে যখন বনগাঁ ষ্টেশনে থামল, ছেলেব দলের সঙ্গে চাটুজ্জেও নামল।

বনগাঁয়েব সিঙ্গাড়া বসগোল্লার নাম আছে। ওরা সকলেই কিনল। খাওয়ার পরে জল খেতে গেল ষ্টেশনের কলে। দু-চাব জনের কেবল জল খাওয়া হয়েছে, এমন সময় সিটি বেজে উঠল, গাড়ী এখুনি ছাড়বে। হৈ চৈ করে ছুটল সকলে গাড়ীর দিকে। কিন্তু চাটুজ্জে নির্বিকাবচিত্তে ধীরে সুস্থে জল খাচ্ছে, মুখ হাত ধুচ্ছে।

পিছন ফিবে পটলা ঐ দৃশ্য দেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, আবে করছেন কি চাটুজ্জে মশাই, গাড়ী যে এখুনি ছেড়ে দেবে?

চাটুজ্জে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ফুঃ। এই বুদ্ধি হলো তোর লেখাপড়া শিখে। আবে আমাব কাছে টিকিট আছে না? আমাকে ফেলে গাড়ী ছাড়বে কি কবে তাই শুনি? গাড়ী তীক্ষ্নস্বরে আবাব ডাকল—নাঃ, আব থাকা চলে না। পটলা ব্যঙ্গ করে বলল, আচ্ছা বোকা তো! আসতে হয় আসুন, না হয় দাঁড়িয়ে থাকুন টিকিট পকেটে নিয়ে—খুঁজতে আসবে এখন।

হনহন কবে ছুটে গেল পটলা। একটু পরে গাড়ীখানাও ঝিক্ ঝিক্ কবে ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেল।

আব চাটুজ্জের এত দিনেব বিশ্বাস গাড়ীর চাকার তলায় পিষে গুঁড়িয়ে ধুলো হযে গেল। গরুব মত ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাটুজ্জে।

আজ বউ আসবে, অনেক কাজ। সদর দরজার সম্মুখে ছোট ছোট দুটি কলাগাছ পুঁতে তার গোড়ায় জলপূর্ণ মাটির মঙ্গল-

কলস, কলসীব মাথায় আমের পল্লব, তার উপব কচি ডাব বাখা হয়েছে। সদর থেকে অন্দর পর্যন্ত আমের পাতা এবং রঙ্গিন কাগজের শিকলি টাঙ্গানো হয়েছে। সামনের গেটের থেকে উঠোন পর্যন্ত লাল শালু পাতা হয়েছে। নববধূ কোমল পায়ে তার উপর দিয়ে হেঁটে আসবে। সন্ধ্যে হতেই অনেকগুলি গ্যাসেব আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। উৎসবেব আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই।

সেই মহামায়ার পবে আজ আবার এ বাড়ীতে নতুন বউ আসছে।

মানদা ঠাকরুনের আলপনা দেওয়ার নাম আছে। তিনিই সমস্ত উঠোন ভরে বউ ছত্তর আলপনা দিয়েছেন। তার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো পড়ে অপরূপ দেখাচ্ছে। চিত্রকরা বড় দুখানা পিঁড়ি পাতা, তার পাশে বরণডালা। সামনে মস্ত কালো পাথবেব থালায় দুধে-আলতায় মেশান রয়েছে—তার উপরই নববধূ রাঙ্গা পা দুখানি ভিজিয়ে দাঁড়াবে। দুধের উপর ছায়া পড়বে সেই লক্ষ্মী প্রতিমার।

কল্পনার নেত্রে মহামায়া তা চোখ বুঝে দেখতে পান। কল্পনার এ দিনটিকে প্রভাতের জন্মের পব থেকে কতবার তিনি অনুভব করেছেন। যখন বড় দুটো কালো ঘোড়ার ফিটনগাড়ীতে আলো বাজনা লোক জন সমভিব্যাহারে বেলফুলের গোড়ে মালা গলায় দিয়ে প্রভাত এবং দীপ্তি আসছিল তখন পথের পাশের সব বাড়ীর লোকরা বেরিয়ে এসে দেখছিল, এবং বলাবলি করছিল—বাঃ বেশ মানিয়েছে তো। খাসা নাতবউ হয়েছে মিত্তির মশায়ের।

বউ দেখে মহামায়াও খুশী হলেন। এত দিনের স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। হ্যাঁ, এই মেয়েটিকেই কল্পনায় প্রভাতের পাশে তিনি দেখেছেন।

মহামায়া সাতলহর হার পরিয়ে বধূর মুখ দেখলেন। ঘিয়ের প্রদীপের পুবাতিতে ত্রবধূব মুখ দেখা যেন আর শেষ হয় না—

অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলেন। মুখে ক্ষীর চিনি আর কানে মধু দিলেন। তারপরে সযত্নে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ, রূপসী বউ হয়েছে। ভিড় অনেক হালকা হয়ে গেলে, দীপ্তি সুযোগ বুঝে মহামায়াকে বলল, মা, গায়ের গহনাগুলো খুলে ফেলব ? ভারী অস্বস্তি হচ্ছে।

মহামায়া একথা শুনে একটু অবাক হন। ছিঃ একটু লজ্জা নেই, নতুন বউকে কত সাধ্য-সাধনা কবে কথা বলাতে পারে না— আর এ কিনা নিজে থেকেই ডেকে খুঁজে কথা বলছে! কিন্তু মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। পাশের বাড়ীব বীণাকে ডেকে বললেন, বীণা, বৌমাকে ওঘবে নিয়ে গহনা এবং বেনারসী খুলে দে তো মা।

তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান শ্বশুরেব খাওয়াব যোগাড় কবতে।

খেতে বসে সত্যপ্রসন্ন বললেন, বউ তোমাব পছন্দ হয়েছে বৌমা ?

দেখতে পান মহামায়া, বৃদ্ধ শ্বশুরেব মুখের বলিরেখায় বেখায় আনন্দেব অভিব্যক্তি।

আপনাব পছন্দ করা মেয়ে আমাব কখনও অপছন্দ হতে পারে! তবে বড় বেশী ছট্‌ফটে মনে হয়। একটু হেসে বললেন, এর মধ্যেই আমাকে ডেকে খুঁজে পরিচয় করে নিয়েছে।

বুঝেছ বৌমা, ওরা পশ্চিমে মানুষ। তার উপর মা নেই। যাকে তোমরা লজ্জা বল, সেসব শেখেনি। তুমি শিখিয়ে বুঝিয়ে নেবে।

মহামায়া নিঃশব্দে শ্বশুরকে পরিবেশন করতে লাগলেন। মনের মধ্যে একটু খচখচানি রয়েই গেল।

সকলেই ভেবেছিল, প্রভাত বিয়ের পরে আর স্বদেশী হুজুকে মাতবে না। কিন্তু অতি শিগগির সে ধারণা সকলকে বদলাতে হলো—যেদিন দেখল নতুন বউ ফেলে আশ্রম থেকে ফিরল রাত বারোটায়।

দীপ্তি প্রতীক্ষা করতে করতে কোন সময় বালিশের উপর উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রভাত ঘরে ঢুকে দীপ্তির ঘুমন্ত কোমল তনুদেহখানি একটু স্থিব হয়ে দেখল। কেমন মায়া হলো। আস্তে ঠিক করে শুইয়ে দিতে গেল। ভয়ে আঁৎকে উঠল দীপ্তি, অস্পষ্ট স্বরে বলল, কে—। প্রভাত ওব মুখে হাত চাপা দিয়ে, কানেব কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস কবে বলল, আমি, দীপ্তি, আমি।

দীপ্তি খোলা চোখে প্রভাতেব মুখেব দিকে চেয়ে বলল, এত রাত অবধি কোথায় ছিলে? অভিমানে ঠোঁট থরথর করে কাঁপে।

প্রভাত এক হাতে বুকেব কছে টেনে নিয়ে বলল, সে আর-একদিন বলব, দীপ্তি। ওব কম্পিত ঠোঁট আদর করে টিপে বলল, শুয়ে পড়ো।

পবেব দিন মহামাযাব চোখেও সেই জিজ্ঞাসা—এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

মহামায়া প্রশ্ন কবার আগেই প্রভাত বলল, কাল মুক্তানন্দের ওখানে একটা মিটিং ছিল, তাই ফিবতে দেবী হলো।

মহামায়া গম্ভীব মুখে বললেন, তুমি একটি মেয়েব দায়িত্ব অগ্নি সাক্ষী বেখে গ্রহণ করেছ, তাব সুখ-সুবিধা দেখা তোমাব কর্তব্য বলে মনে কর না কি?

করি। তবে ভাবতকে স্বাধীন করাব কর্তব্য সকলের উপরে। তোমার সে-কথা অজানা নয়, মা।

সতপ্রসন্নর কয়েক দিন থেকেই বিকেলেব দিকে একটু জ্বর হচ্ছে। বাড়ীর সকলেই বিষম চিন্তিত। মুখে কচি নেই, কিছুই খেতে পারেন না। মহামায়া রোজ বদলে বদলে এটা সেটা রান্না করেন। বিকেলবেলায় দীপ্তি দাছুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সত্যপ্রসন্ন বললেন, অনেক দিন তো থাকলে দিদি বাংলা দেশে, দেশটাকে কেমন মনে হচ্ছে?

এক কথায় দাদু, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। একটা দেশকে জানার পক্ষে এই ক'টা দিন কিছুই নয়। এদেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কিছুর সঙ্গেই ঠিক যাকে ঘনিষ্ঠ বলা যায় সেরকম পরিচয় এখনও হয়নি। তাই এদেশকে যতটা ভালবাসা উচিত তা এখনও বেসে উঠতে পারিনি। আশা ছাড়িনি, একদিন নিশ্চয় পারবো। অবশ্য এখন না বোঝার জন্যে পদে পদে ভুল করে ফেলছি। আবার সব সময় এদেশের রীতি-নীতি মানার পক্ষে মনের সায় পাই না।

সত্যপ্রসন্ন দীপ্তির মুখখানা গভীর ভাবে দেখেন। মনের ভাব পড়তে চেষ্টা করেন। এ-প্রসঙ্গটাকে হালকা করে, পরিহাসতরল কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আমার নাতিটিকে বাংলা দেশের ছেলে বলে খারাপ লাগছে না নিশ্চয়!

দাদুর পায়ের উপর দীপ্তির হাতখানা স্থির হয়ে থাকে। নির্লিপ্ত গলায় বলল, উদাসীন প্রকৃতির লোকটিকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

কেন, তোমাকে কিছু অনাদর করেছে নাকি?

না, বরং উল্টো। তবুও যেন মনে হয় অনেক দূরের মানুষ।

সনিঃশ্বাসে সত্যপ্রসন্ন বললেন, হুঁ, ঠিকই বলেছ। আচ্ছা ভাই, ঐ উদাসীন মানুষটাকে তোর ভালবাসার দড়ি দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে পারিস না?

আরক্ত নতমুখে দীপ্তি দাদুর পায়ে হাত বুলাতে থাকে। যার মনের সাড়ে পনেরো আনাই তেত্রিশ কোটি দেশের লোকের দখলে, তাকে কি কোন কিছুতেই বাঁধা সম্ভব!

রোগশীর্ণ বৃদ্ধের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করেন, যাকে ভগবান সৃষ্টি করেছে সকলের জন্য, তাকে আমি কোন প্রলোভনে নিজের গৃহকোণে বেঁধে রাখব। শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ এঁদের কি ভোলাবার কম আয়োজন করেছিল সংসার! কিন্তু

পেরেছিল কি বাঁধতে ? পারেনি।

হঠাৎ দীপ্তি অন্যপ্রসঙ্গে চলে গেল। হেসে দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা দাদু, আপনি ঠাকুমাকে খুব ভালবাসতেন, না ?

দন্তবিহীন মুখে হা-হা করে হাসেন সত্যপ্রসন্ন। শোন পাগলীর কথা ! স্ত্রীকে কে না ভালবাসে !

দিনেব বেলায় আপনাদের দেখা হতো ?

না, ওটি হবাব জো ছিল না। বাড়ীব সকলে শুতে গেলে, তোমার ঠাকুমা পা টিপে টিপে শুতে আসতেন। আবার সূর্য উঠবাব আগেই চলে যেতেন। ববেব সঙ্গে শোয়া যেন কাক পক্ষীতে টেব না পায়।

তাবপরে দরাজ গলায় বৃদ্ধ হেসে বললেন, দিনের বেলায় দেখলে তোমার ঠাকুমা বোধহয় আমাকে চিনতে পারতেন না।

দীপ্তি খিল খিল করে হেসে উঠল, ভারী মজা তো।

মহামায়া ঘরে ঢুকে বিরক্তিপূর্ণ স্ববে বললেন, এত জোরে হাসির কি হলো ? যাও রান্নাঘরে, ঠাকুর কি দিয়ে কি করছে, একটু দেখতে শুনতে হয়।

অপ্রস্তুত দীপ্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখুনি যাচ্ছি, মা।

মহামায়া শ্বশুবের কপালে হাত রেখে বললেন, জ্বরটা এখন বোধ হয় নেই। মাথার কাছে বসে, বৃদ্ধেব কেশবিরল মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সত্যপ্রসন্ন আরামে চোখ বুজে থাকেন।

কোর্টে যাওয়াব সময় প্রভাত রোজই দাদুকে দেখে যায়, আজও এল। ঘবে ঢুকেই প্রশ্ন কবল, কেমন আছ, দাদু ?

রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে ক্ষীণ একটু হাসি। ভালই আছি দাদা —এই বয়সে এর থেকে বেশী ভাল থাকা কি সম্ভব ! যাওয়ার ডাক যে শুনতে পাচ্ছি।

তোমাকে আমি যেতেই দেব না।

দাতুর লোলচর্ম জীর্ণ শীর্ণ হাতখানা প্রভাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। উত্তেজনায় বৃদ্ধের হাতখানা ভীত পাখীর ছানার মত কাঁপতে লাগল। প্রভাত গভীর মমতায় একটুক্ষণ হাতখানা ধরে রেখে, আস্তে বিছানায় রেখে দিয়ে বলল, কোর্টের বেলা হলো দাতু, যাচ্ছি।

এসো দাদা। কোটবগত চোখ দিয়ে এক ঝলক জল গড়িয়ে পড়ল।

রবিবার। রুগী দেখা শেষ করে সুব্রত কাগজ পড়ছিল। ভারী পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় প্রভাত বলল, মনে কবেছি ওকালতী ছেড়ে দেব। দাতু বড় তুঃখ পাবেন, কিন্তু উপায় নেই। তোমার মত অসীম ধৈর্য আমার নেই। চবকা কেটে, নিরক্ষরদের শিক্ষা দিয়ে, গরীবদের তুঃখ দূর কবে, তবে পরে স্বাধীনতা আনব—এত সময় আমাব নেই। তা ছাড়া ও মতে আমি বিশ্বাসীও নই।

সুব্রত একটু হেসে বলল, বেশ তা যেন বুঝলাম। আগে চাই দেশবাসীব স্বাধীনতার মূল্যবোধ। তা না হলে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেব চেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জিত হলেও, এই আহাম্মকেরা তা কি রাখতে সমর্থ হবে? এতবড় একটা ব্যাপার কেবলমাত্র হুজুকে পর্যবসিত হয় তা আমি চাই না। জাতীয় চেতনার উন্মেষ আগে হওয়া চাই। তা না হলে স্বাধীনতার পরে সুশাসন তাদের কাছে কি আমবা প্রত্যাশা করতে পারি? "বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা" এই প্রবাদ বচন যাতে সফল না হয়, আমি তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি।

ইংরাজ দেশ থেকে চলে গেলে, এসব সমস্যা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে, সুব্রত। যেমন করেই হোক আগে ও'দের দেশ থেকে

তাড়াতে হবে। যতগুলো দোষে পূর্ণ বললে ভারত, তার মূলে কি ইংরাজ নয়? এই দেড়শো বছরে করেছে কি?

কথাটা একেবারে মিথ্যে বলনি। তবে বিদেশী শাসকের কাছে যা পেয়েছ তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ধর, এই জাতীয়তা-বোধই তো পেয়েছ ইংরেজের কাছে। তবে আরো অনেক কিছু করলে ভাল হতো। কিন্তু ভুলে যাও কেন, তারা এসেছিল সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভারতেব উপর বাজত্ব বিস্তার করতে—আসেনি তোমাদেব সব কিছু ভাল কবতে। তাছাড়া, সভ্য ইংরাজ সর্ব-ভাবতীয় একত্ববোধ জাগরিত করেছে, আজ যা স্বাধীনতা সংগ্রামেব হাতিয়ার। আমার মতে সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া উচিত বিচক্ষণতাব সঙ্গে।

অসহিষ্ণু প্রভাত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। দুর্বার আমাব আকাঙ্ক্ষা। আর গতি-পথে প্রতিকূল সমস্যা খড়কুটোব মত ভেসে যাবে। আমাব চাই স্বাধীনতা, তাব বিনিময়ে দেব আমি রক্ত। আমার পক্ষে পরাধীন ভারতে একটি দিন বেঁচে থাকা অসহ্য। সুপ্ত স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়ে যখন তাব প্রাপ্য সিংহগর্জনে দাবী করছে, তখন তার সে দাবী না মিটিয়ে জাতিব অব্যাহতি আছে কি?

সুব্রত বলল, সকলের পথ হয়তো এক নয়, তবে লক্ষ্য সকলেরই এক। সেখানে তোমাব লক্ষ্য আর আমার লক্ষ্য আলাদা নয়।

একটু বিরতির পরে, প্রভাত বলল, দাদুকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি, সুব্রত। অসুখটা কিছুতেই সারছে না।

বয়স হয়েছে, তাই সারতে একটু দেরী হচ্ছে, বলে সুব্রত মধুকে ডেকে চায়ের অর্ডার করল।

প্রভাত খুশী হয়ে বলল, তোমাদের বাড়ীতেই এ জিনিষটি পাওয়া যায়।

তখন বরিশালে চায়ের রেওয়াজ তেমন ছিল না। সুব্রতদের এ

অভ্যাস কলকাতা থেকে হয়েছে। এখন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে প্রভাত বলল, আচ্ছা, মেসোমশাইকে (সুব্রতর বাবা) দেখছি না তো ?

বাবা কালীমন্দিরে গেছেন।

প্রভাত এবং সুব্রত দুজনেব বাড়ীই ফকিরবাড়ী বোডে। বিপত্নীক তারাপদ সেন সময় পেলেই কালীবাড়ী গিয়ে বসেন। পাষাণময়ী কালীমন্দির বাড়ীব থেকে বেশী দূব নয়। ছোট-ছেলে সুব্রতকে নিয়েই তাঁব সংসাব। বড়-ছেলের সিমলা দিল্লী কাজ। সরকারী অফিসাব।

সত্যপ্রসন্নবাবু অনেক দিন রোগ ভোগের পর আজ অন্নপথ্য করবেন। খেতে বসেছেন, মহামায়া পবিবেশন করছেন, দীপ্তি এক পাশে বসে পাখাব বাতাস কবছে। শুক্তো দিয়ে খেতে খেতে সত্যপ্রসন্ন বললেন, বৌমা, তোমাব শুক্তোনি ভারী সুন্দর হয়েছে খেতে।

আর একটু দিই, বাবা—বলে, মহামায়া শুক্তোব পাত্রটা এগিয়ে আনলেন।

না না বৌমা, তা বলে আর পারবো না খেতে।

খাওয়াব শেষে যখন দুধেব বাটিতে চুমুক দিলেন, দীপ্তি খিলখিল করে হেসে উঠল, এই যা—সবটা সবই তো গোঁফে লেগে গেল। জিব দিযে সরটা চেটে খাওয়ার কৌশল দেখে দীপ্তি হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আচ্ছা দাদু, এত অসুবিধে, তবে গোঁফ বেখেছেন কেন ?

আবার তুমি লাগলে দিদি গোঁফের পেছনে ? তোমার ঠাকুমাব জ্বালায় গেছে দাড়ি।

ও বাব্বাঃ! দাড়িও ছিল নাকি ?

ছিল দিদি, এক কালে সবই ছিল।

ঠাকুমা হঠাৎ দাড়ির পেছনে লাগলেন কেন ?

সে দুঃখের কথা আর বল কেন! একটা ফোঁড়া হলো দাড়ির ভেতব। বাধ্য হয়েই ফেলে দিতে হলো। তারপরে ভেবেছিলাম আবার রাখব। একদিন তোমার ঠাকুমা হাসতে হাসতে বললেন, দেখো, আবাব যেন মুখখানাকে সুন্দববন কবে তুলো না। দাড়ি নয় তো যেন বাঘ-লুকোন জঙ্গল।

তাবপরে কি আর দাড়ি রাখা চলে, তুমিই বল ? কিন্তু মন খারাপ হয়ে রইল বেশ কিছুদিন। তোমার ঠাকুমাব উপর রাগও হলো, এ আবার কেমন রুচি, পুরুষেব মুখে দাড়ি থাকবে না। মেয়েদের মতো চিবুক, আমার লজ্জা হতো।

দীপ্তি হাসির ঝিলিকে চোখ নাচিয়ে বলল, তাই বলুন, আমাদেব ঠাকুমা বেশ আধুনিকা ছিলেন।

কি জানি, হবেও বা, বললেন সত্যপ্রসন্ন। হঠাৎ সত্যপ্রসন্নব স্বর একটু উদাস হলো। বললেন, দিদি, আর যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, গোঁফটা থাক, ও আমার সঙ্গেই যাবে।

জীবন-সন্ধ্যাঘনায়মান বৃদ্ধেব শেষেব কথা ক'টি শুনে দীপ্তিব মুখখানা অজানা বেদনায় নিষ্প্রভ হয়ে যায়। দাদুব কাছেই ওর যত আদর আবদার। বাঙ্গালীব রীতিনীতি অনভিজ্ঞ পুত্রবধূকে শাশুড়ী তেমন পছন্দ করেন না। স্বামীকে দীপ্তি কাছে পায় খুব কম সময়। আর যখন কাছে পায় তখনও মনের নাগাল পায় না। সর্বদাই গভীব চিন্তায় মগ্ন। কী যে লোকটা ভাবে এত। দীপ্তিব মতে এসব লোকেব ঘর বাঁধা উচিত নয়। প্রভাতেব দরাজ বুকে তেত্রিশ কোটি অসহায় ভাবতবাসীর প্রকৃষ্ট স্থান হওয়া সম্ভব, কিন্তু নগণ্য ক্ষুদ্র একটি হৃদয়ের স্থান হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। অভিমানে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় দীপ্তির। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

সত্যপ্রসন্ন সেদিকে তাকিয়ে বলেন, দিদি, এবারে তুমি খেয়ে নাও।

না দাছু, চলুন আগে আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই, তারপবে—

স্মিতহাস্যে সত্যপ্রসন্ন বললেন, তবে তাই চল, যা বায়না ধরবে তা না কবে তো ছাড়বে না!

বেলা প্রায় তিনটে। পাশের বাড়ীর বীণা এল দীপ্তির সঙ্গে গল্প কবতে। প্রায় রোজই বীণা একবার আসে। শহরের অনেক খবরই দীপ্তি ওর কাছে পায়। ছুটিতে প্রায় সমবয়সী, তাই ভাব জমেছে বেশ।

বীণা বলল, কাল বিকেলে রাজাবাহাছুরের হাবেলীতে একটা মিটিং হবে, যাবে বৌদি?

ফিসফিস করে দীপ্তি বলল, মা বাজী হবেন কি?

সে ভাব আমাব উপব ছেড়ে দাও। তাছাড়া প্রভাতদা বক্তৃতা দেবেন, তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে।

অভিমানে দীপ্তিব মুখখানা আরক্ত দেখায়, আমাকে তো কিছুই বলেননি! ক্রমশঃ আমি দূরে চলে যাচ্ছি। এমন কোন বিষয় আছে, যা আমাব কাছে বলা চলে না বা বলতে ভুল হয়ে যায়? আমি তো একথা ভাবতেই পাবি না। কর্মের আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। এই তো সেদিন, মাঘের শীতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, খালি গায়ে মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভেঙ্গে পাশে না দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি মেঝেতে একটা কালো কম্বলের মত কি যেন পড়ে রয়েছে। ঘুম-জড়ানো চোখে ঐ রকমই মনে হয়েছে। তারপরে খোলা চোখে তাকিয়ে দেখি, ওরই নগ্ন দেহটি মশকের উপস্থিতিতে ঐ রকম ঢেকে রয়েছে।

এই, মাটিতে শুয়ে আছ কেন ?

চমকে উঠে তাকালেন আমার দিকে। যেন একটা গোপন ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে।

আমতা আমতা করে বললেন, আমার গুরুর আদেশ। দীপা, যত রকম কৃচ্ছ্রতা আছে সবই আমাদেব অভ্যাস করতে হবে। আর বেশী রাত নেই, তুমি শুয়ে পড়।

অবশিষ্ট রাতটুকু, ঐ তাপসের মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে মশা তাড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম।

সকালবেলায় ঐ অবস্থায় আমাকে দেখে বললেন, এ তোমার ভারী অন্যায়। শীতেব রাত এমনি কবে বসে কাটিয়ে দিলে ?

ঘুমভাঙ্গা মোটা গলায় বললেন, "বঙ্গেব বধূ বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা।"

নাঃ, তোমরা বড় বেশী ভালবাসতে পাব।

বীণার ঠাট্টায় মুচকি হাসে দীপ্তি।

বীণা মুখ টিপে হেসে বলল, এমন তন্ময় হয়ে ভাবছ যার কথা, কে সেই ভাগ্যবান ?

যদি বলি, তোমার প্রভাতদা।

আরে দূর, তার কথা আর ভাবাভাবিব কি আছে। সে তো হাতের মুঠোয় এসেই গেছে।

কিন্তু যাব মুঠোয় থাকে না—

তার দোষ।

সে তো তুমি বলবেই।

দুঃখ করো না বৌদি, ওসব লোক কারো মুঠো কিংবা আঁচলের তলায় থাকাব জন্যে জন্মায়নি। প্রভাতদার কথা ভাবলে আমার মনে হয়, আমরা কত আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তায় বিভোর। আমার ভাই অমি প্রভাতদার ভীষণ ভক্ত। ও বলে, প্রভাতদাই "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" একথা

সার্থক করেছেন। সত্যি বউদি, এমনি নির্ভীক দেশপ্রেমিক যদি সবাই হতো!

স্বামীগর্বে দীপ্তি পুলকিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে, না ভাই, তা হলে দেশের মেয়েগুলির মুখে আর হাসি থাকত না।

বীণা হাসতে হাসতে দীপ্তির গালে ঠোনা মেরে বলল, ইস্ বরসোহাগীর ঠমক কত!

এমনি সময় মহামায়া একটা পাথরবাটি করে আমের আচার নিয়ে ঢুকলেন। কখন এসেছিস, বীণা?

হেসে বীণা বলল, এই একটু আগে।

আচারটুকু দীপ্তির হাতে দিয়ে বললেন, নাও বৌমা, দুটিতে মিলে খাও।

আচার দেখে দুজনেরই জিভে জল। একটু পরেই দেখা গেল নুনঝালে জড়ানো আম দুজনে রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছে, আর তার সঙ্গে চলছে গল্প। দীপ্তি মা হতে চলেছে, এসব জিনিসে ওর লোভ আরো বেশী।

অমরনাথ দত্ত বহরমপুর কলেজে প্রফেসর ছিলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের লোক তিনি। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে বরিশালে এসে বসবাস করছেন। শ্বশুর বরিশাল জেলায় বড় তালুকদার ছিলেন। শ্বশুরের পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা।

এ ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর আগে অমরনাথের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরে, কন্যা বীণা এবং পুত্র অমিতাভকে নিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বরিশালে বাস করতে থাকেন। পত্নী সুলতা তাঁদের প্রেমের নিদর্শন দুটি পুত্র কন্যা রেখে কবেই স্বর্গে চলে গেছেন, অমরনাথও বোধ হয় বেশী দিন নেই। হাঁপানী এবং বাত তাঁকে জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছে।

অমিতাভ এ বছর বি-এম স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, এখন আই-এ পড়ছে। বীণাকে অমরনাথ নিজেই বাড়ীতে পড়িয়েছেন। গতবছর বীণার বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাইকে নিজের কাছেই রেখেছেন অমরনাথ। কারণ, কন্যা ছাড়া তাঁর একটি দিনও চলে না। জামাইটি তুবার ম্যাট্রিক ফেল করে তৃতীয় বারেব জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমবনাথের জামাইটি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান, কিন্তু সরস্বতীর কৃপা-বঞ্চিত। ঘরজামাই থাকার মত এব থেকে সুপাত্র আর পাওয়া গেল না। অনিলের মা বাপ কেউ না থাকায় সহজেই এ প্রস্তাবে রাজী হলো।

প্রভাতদের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী। দূর সম্পর্কে লতায় পাতায় জড়ানো একটু আত্মীয়তাও আছে। তুই পরিবারে হৃদ্যতা যথেষ্টই। মহামায়ার কাছ থেকে বীণা এবং অমি মায়ের মতই স্নেহ ভালবাসা পেয়ে থাকে। প্রভাতের অনেকগুলি ভক্তের মধ্যে অমিতাভ বিশেষ একজন। প্রভাত এই ছেলেটিকে বেশ একটু স্নেহ এবং বিশ্বাস করে।

অমিতাভও গুপ্ত সমিতির একজন সদস্য। সে প্রথম পর্ব, গীতা পাঠ, লাঠি এবং ছোরা খেলা, শরীর চর্চা ইত্যাদি শেষ করে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণের গৌরব লাভ করেছে।

পরের দিন সকালে দাতুর পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়াব সময় দীপ্তি সভায় যাওয়ার কথা বলল। সহাস্যে সত্যপ্রসন্ন বললেন, যাবে বৈকি দিদি, নিশ্চয় যাবে। শাশুড়ীর মত নিয়েছ তো ?

না, বীণাদি বলবে বলেছে।

কেন, তুমি সাহস পাচ্ছ না ?

দীপ্তির মুখ ম্লান দেখায়। নত মুখে কাপড়ের পাড় টান করতে অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সত্যপ্রসন্ন ধীবে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা, আমিই খেতে বসে বৌমার মত আদায় করে দেব।

দীপ্তির সভায় যাওয়ার কথা শ্বশুরের মুখ থেকে শুনতে হলো বলে,

মহামায়া একটু রুষ্ট হলেন। মুখে শুধু বললেন, বেশ তো যাবে।

ছেলেমানুষ দীপ্তি শাশুড়ীর মুখের কথাকেই মনের কথা ভেবে খুশী হলো। দাহুকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল। সত্যি, দাহু না হলে আমার যাওয়াই হতো না। অবশ্য বীণাদি বলবে, তার চেয়ে দাহুর বলাই ভাল হলো।

সভা আরম্ভ হওয়াব আধ ঘণ্টা আগে বীণা এল। ওমা বৌদি, এখনও তোমার শাড়ী পরাই হয়নি। এরপবে গেলে যে জায়গা পাব না।

এখনও তো দেবী আছে, বীণাদি।

আরে, তোমার কোন আইডিয়াই নেই, শরৎ ঘোষ, প্রভাতদা, এঁদের বক্তৃতা শুনতে কত লোক হতে পারে? পেছনে বসলে কিছুই শুনতে পাব না।

দীপ্তি একটু হেসে যেতে যেতে বলল, হুমিনিটে হয়ে যাবে আমার।

মহামায়া এসে বললেন, বীণা, তোব কথা এবং তুই সঙ্গে কবে নিয়ে যাচ্ছিস বলেই আমি বৌমাকে যেতে দিতে রাজী হয়েছি। তা না হলে এ অবস্থায় যেতে দিতাম না। খুব সাবধানে রাস্তাঘাট দেখে শুনে নিয়ে যাবি। বেশী ভীড়েব মধ্যে যাবি না। খানা খন্দ যেন ডিঙ্গোয় না, বৌমা। আর সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবি।

বাব্বা! মামী, তোমার এত দফা শর্ত শুনে দস্তুরমত ভয় পাচ্ছি।

মহামায়া একটু হেসে স্থানান্তরে চলে যান।

বীণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দীপ্তির দিকে। সামান্য একটু সাজ, কিন্তু কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। বৌদি, খদ্দরের এই ঢাকাই শাড়ী-খানা কবে কিনলে?

বিয়েতে পেয়েছি।

তোমাকে ভারী মানিয়েছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বীণার গলায়।

সত্যিই প্রভাতদা নমস্য ব্যক্তি। এমন লোভনীয় একখানা বউ

ঘরে রেখে, দেশের কাজে মেতে ওঠা সহজ কথা নয়। পুরাকালের মুনি-ঋষিদের তুলনায় একালের তাপসরা অনেক শক্তিশালী। নারী দেখলেই তো তাঁদের নাড়ি চঞ্চল হতো।

দীপ্তি বীণার হাত ধরে টেনে বলল, বা রে যাবে না? না, এখানে দাঁড়িয়ে তোমার প্রভাতদার শক্তির ব্যাখ্যান করবে?

আচ্ছা চল। নাঃ, মামী আবার কোথায় গেলেন।

সহাস্যে মহামায়া এসে বললেন, কেন রে?

তোমার বউকে নিয়ে চললুম। বাপরে। তুমি যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছ। তোমার আহ্লাদে বউকে তোমার হাতে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি কোথায়।

আচ্ছা পাগলী মেয়ে! তাড়াতাড়ি ফেরাব কথা মনে থাকে যেন।

লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নেই। বীণা দীপ্তির হাত শক্ত করে ধরে, নীচু হয়ে ভীড় ঠেলে ঠেলে সামনে গিয়ে বসল। এখন মাঘের শেষ তবুও গরম লাগছে।

বন্দেমাতরম্—আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি দ্বারা সভার কাজ আরম্ভ হলো।

উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলো শ্যামাচরণবাবুর নাতনী রমা, 'বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং'—গানটি শেষ হতেই প্রচুর হাততালি পড়ল।

তারপরে সভাপতির ভাষণ। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সুবক্তা শরৎ ঘোষ জোরালো আবেগময়ী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। নিঃশব্দ সভাগৃহ। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ নেই। কিন্তু মনে সকলের এক সঙ্কল্প—বিদেশী শাসন হতে পরাধীন ভারতকে মুক্ত করা চাই।

বাণীপদবাবু এবং সুরেনবাবুর বক্তৃতার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি ছিল ইংরাজের ভারত ত্যাগের পক্ষে।

তারপরে উঠল প্রভাত, তরুণ দল হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে বলল—

হে আমার ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আজ আমার বক্তব্যের প্রথম আলোচ্য বিষয় হলো, ভারতবর্ষের উপর বিদেশী শাসনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বার বারই ভারতের বক্ষে পররাজ্যলোভীর নখর-চিহ্ন পড়েছে। সকলের বিষয় এখানে আলোচনা করা সম্ভবও নয়, দরকার আছে বলেও মনে করি না।

মুসলমান সম্রাটের হাত থেকেই সুচতুর ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করেছে দিল্লীর সিংহাসন।

এই দুই বিদেশীব রাজনীতি নিয়েই কিছু আলোচনা করা যাক।

পাঠান মোঘল এরাও এসেছিল ভারতে বাজ্যবিস্তার মানসেই, কিন্তু জয় কবার পবে তাদের আর নিজের দেশে ফিরে যাওয়া হলো না। এদেশেই এদেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে গেল। কিছুদিন বাদে তাবা ভুলেও গেল তারা পরদেশী। আমরাও ভুলে গেলাম। তাদেব শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদব-কায়দা ভারতীয়দের উপব প্রভাব বিস্তার করল।

তারা ছিল বিলাসী জাত। বিলাস ব্যসনে বিস্তর টাকা খরচ হতো। সে টাকাটা আবার আমাদের দেশের লোকের হাতেই ফিরে আসত। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা এমন জটিল হয়ে উঠেনি।

কিন্তু ইংরাজের নীতি স্বতন্ত্র। তারা এদেশের সম্পদ আহরণ করে, নিজের দেশে ধনরত্নের পিরামিড প্রস্তুত করছে। সেই পিরামিড প্রস্তুত করতেও কিছু আবশ্যক হয় বৈকি। সেই আবশ্যক-টুকুই ওদের হাত থেকে আমরা পাচ্ছি।

বণিক ইংরাজ ব্যবসা করতেই এদেশে এসেছিল, একথা সকলেবই জানা আছে—কিন্তু দেখা গেল “বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে”।

বর্তমানের অন্ধকারকে আমি ভয় করি না। বাস্তবের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা আদর্শবাদী ভারতকে আদর্শচ্যুত করতে পারবে না।

বাঙ্গালী নির্ভীক। কোন অকল্যাণ অসাফল্য তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কল্পনার নেত্রে এ জাতি তার গৌরবময় অতীতের মহান কর্মের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্ন তাদের অসাধ্য সাধনে সহায়তা করবে। দুঃখ জয়ের অনির্বচনীয় আনন্দের পূজারী তারা। সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে তাদের মায়ের পূজায় এগিয়ে আসতে হবে। পররাজ্যলোভী ইংরাজের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে, দিতে হবে নিজেদেব রক্ত। মুমূর্ষুপ্রায় জাতিকে বাঁচাতে নিঃশেষে নিজের জীবন দান করে, জাতির নবজীবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নৈরাশ্য যেন আমাদের জাতীয় চেতনার উপর মলিন ছায়া না ফেলে। সকল অবিশ্বাসেব জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নবপ্রেরণায় কর্মসাগবে। যত আসুক তুফান, আসুক ঝড়—হে বীর, তুমি নির্ভয়ে চলে যাও সফলতার তীরে। আমাব বাঙ্গালী তরুণ দল, তোমাদের ললাটে ভাগ্যবিধাতা এঁকে দেবেন জয়তিলক। নিজের নিজের কর্মে অবিচল থাক। সকলের দানে পূর্ণ কব মায়ের ভাণ্ডার। তোমরাই হবে নব ভারতের স্রষ্টা। বিরাট দায়িত্ব বহন উপযোগী উন্নত রাখ শির।

বল সব—বন্দে মাতরম্—আল্লা হো আকবর।

এই মন্ত্র হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

দীপ্তি এই প্রথম শুনল প্রভাতেব বক্তৃতা। বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে রইল। কেবলই মনে হতে লাগল দীপ্তির, সে কী প্রভাতের সঙ্গে পা ফেলে সমতালে চলতে পারবে! তার কী সে শক্তি আছে! ঐ প্রশস্ত বুকখানায় যে অগ্নি জ্বলছে, তার তাপে নিজের স্তিমিত বক্ষে আগুন জ্বলে উঠবে কি! সংশয়ের দোলায় মন দুলতে থাকে। মদের নেশার মতই এই চিন্তার নেশায় দীপ্তি মাতাল। খপ করে বীণা দীপ্তির হাত ধরে হেঁচকা টানে সরিয়ে আনল, সামনে গর্তটা দেখিয়ে বলল, পড়ে গেলে কি কেলেঙ্কারী হতো বলো তো। একেবারে ভাবে আত্মহারা হয়ে চলেছ! কেমন, এবারে আমার কথা বিশ্বাস হলো তো?

দীপ্তি নিঃশব্দ। নিজের চিন্তার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলল।

সুব্রত বাড়ীর গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ঐ রাস্তা দিয়েই বীণা দীপ্তি বাড়ী যাচ্ছিল। বীণা বলল, সুব্রতদা, মিটিংএ যাওনি ?

কই আর যেতে পারলাম ভাই, বিশেষ একটা কাজে আটকে পড়লাম।

অদূরে সুব্রতদের অনেকদিনের পুরোনো চাকর মধু গাছে জল দিচ্ছিল, মুখ তুলে বলল, তোমার কি আর কোন সাধ-আহ্লাদ আছে, দাদাবাবু। কতগুলো হাড়-হাভাতেদের নিয়ে তোমার দিন রাত কোথা দিয়ে ফুরিয়ে যায়।

আচ্ছা, তোর আর লেকচার দিতে হবে না, চট করে তিন কাপ চা করে নিয়ে আয় তো।

তারপরে দীপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন বৌদি, লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে পড়ুক।

আগ বাড়িয়ে বলল বীণা, এ প্রস্তাবে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ঐ পবিত্র ধুলোর কথা বললে না ? তা পায়ে দুজনের সের পাঁচেক কোন নেই। সেটা যদি তোমার গৃহে পড়ে, তবে তা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো বলে তুমি আনন্দে পুলকিত হতে পার—কিন্তু তোমার মধুর যে তা আনন্দের উদ্রেক করবে না—তা সুনিশ্চিত।

সুব্রত হা-হা করে হাসে, আরে মধুর কিসে আনন্দ, তা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানেন না, আমি কোন ছার।

দীপ্তি মুখ টিপে হেসে বলল, যতদুর আমি শুনেছি, মধুর গার্জেনশিপেই তো আপনি আছেন !

যেতে যেতে প্রাণখোলা হাসি হেসে সুব্রত বলল, ঠিক ধরে ফেলেছেন। ও মানুষ ভাল, তবে ভালমানুষীটা খুব কম সময়ের জন্যে।

কেন ? দীপ্তি সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

ওর অভিযোগ হচ্ছে, আমি ডাক্তার হয়ে মাষ্টারদের ভাত মারছি। তার উপর আরো জোরাল যুক্তি হচ্ছে, গরীবদের আমরা যত গরীব ভাবি আসলে ততটা নয়। আমি যদি ওদের বিনে পয়সায় না পড়াতুম, নিশ্চয় ওরা পয়সা খরচ করে পড়ত। তাতে মাষ্টারমশাইদের কিছু পয়সা হতো।

বীণা ফোড়ন দিল, নিশ্চয়। এ বিষয়ে শ্রীমধু দাসের সঙ্গে আমি একমত। কারুর প্রফেশনে হস্তক্ষেপ করা কোন ভদ্রলোকের উচিত নয়।

দীপ্তি বীণার বলার ভঙ্গী দেখে হেসে লুটোপুটি। সুব্রত হেসে বলল, মধু এ কথা শুনতে পেয়ে থাকলে, দু কাপ চায়ের জন্যে তুমি প্রস্তুত থাকতে পার, বীণা।

আচ্ছা, এবারে মধুর দ্বিতীয় অভিযোগ কি তাই বলছি, বলল সুব্রত।

ডাক্তার হয়ে আমি রুগী দেখে ফিস্ নিচ্ছি না এবং আমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে ওর বাইরে মান-সম্ভ্রম যেতে বসেছে। লোকেরা নাকি আমাকে বলে হাঘরেদের ডাক্তার। সেটা মধুর পক্ষে খুবই অসম্মানের।

বীণাকে চুপ দেখে দীপ্তি বলল, বীণাদি, চুপ করে কেন, একটা ওপিনিয়ান দাও।

বীণা হাসল না ; গম্ভীর হয়ে বলল, কিছু অন্যায় বলেনি মধু। তোমার জীবনটা কি হেলাফেলার জিনিস যে এমনি করে অপচয় করছ ? না করলে বিয়ে, না হলে সংসারী। তাই পয়সার উপর তোমার মায়া হলো না।

আঃ বীণা, তোমার বোঝার ভুল হচ্ছে। যারা দিতে পারে না আমি তাদের থেকেই নিই না। মধু অবশ্য বলে, ওরা নাকি ইচ্ছে করেই দেয় না। মানে আমার নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিচ্ছে।

দীপ্তি ওদেব কথা শুনছিল, আস্তে বলল, আপনি বুঝি রুগী দেখে ফিস্ নেন না !

এই দেখুন, আপনিও ভুল বুঝলেন। নোব না কেন, যারা দিতে পারে, তাদের থেকে নিশ্চয়ই নিই।

কিন্তু তাদেব জন্যে তোমার সময় কোথায় ! দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় তোমার হাড়ি, ডোম, মুচি মেথব, বাগদি পাড়ায় কাটে—বলে বীণা উদাস দৃষ্টিতে বাইবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি কববো ভাই, ওদের যে কেউ দেখবার নেই—নেই অর্থ, নেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা তো নেই-ই। সুব্রত ফিস্ ফিস্ করে কথাগুলি উচ্চাবণ কবল।

চড়া গলায় বীণা বলল, বুঝলাম সব, ওদের সব দায় কি একা তোমারই ?

দায় জিনিসটা কি জানিস বোন, যে ঘাড় পেতে নেয় তার। ওদের ভাঙ্গাচোরা স্রোতহীন জীবনে আবার দুকূলপ্লাবী স্রোত আনতে পারি, তবেই সার্থক হব আমি। প্রভাতের ব্রত আরো কঠোর—আমার এ-কাজ সে তুলনায় অতি সামান্য।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীপ্তি ধীবস্বরে বলল, একে আপনি সামান্য বলছেন কেন, সুব্রত বাবু! দেশেব দাবী তো একটা নয় ! যে যে-কাজ হাতে তুলে নেবে, সবই তো দেশসেবায় পৌঁছবে। কোন কাজই তুচ্ছ বলে আমার মনে হয় না।

এমন সময় তিন কাপ চা এবং তিন প্লেট খাবার নিয়ে মধু ঘরে ঢুকল। চা খাওয়াটা মধুর তেমন পছন্দ নয়। ওর ধারণা, চা বেশী দিন খেলে আয়ুক্ষয় হয়। নিজে তো ভুলেও কখনও খায় না, সুব্রত খায় যে সেটাও পছন্দ নয়। তাই চায়ের কাপে মধুর অন্ধকার মুখের ছায়া পড়ে।

চা রেখে বিরস মুখে মধু বলল, কেন যে এ বিষগুলো খাও তোমরা। খাবার খাও আপত্তি নেই—আবার চা কেন ? ঠাণ্ডা

মেটে কলসীর জল খাও কিম্বা গরম দুধ—এই কুলির রক্ত খাওয়া কেন ?

বীণা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে, আঃ—বলেই অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বলল, সত্যি যা বলেছ মধু। সুব্রতদা তোমার কথাব ভারী অবাধ্য।

হবে না ? এখন যে লায়েক হয়েছেন। আগে এঘর থেকে ওঘরে ভয়ে একা যেতে পারত না। তখন মধুকে ছাড়া এক মিনিট চলত না। পায়ে পায়ে ভয় জড়িয়ে থাকত।

দীপ্তি মধুর রকম-সকম দেখে হাসতে গিয়ে বিষম খেল।

আহা-হা একটু জল খাও, বৌদি। কে যেন স্মরণ করছে। বলে না, ভরণ মুখে স্মরণ। আপন মনেই কি যেন বিড়বিড় করতে করতে মধু চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে বীণা বলল, বেশ আছ সুব্রতদা, বক্তিয়ার মধুকে নিয়ে। আমি তো মধুকে নীবব দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে তোমাকে কিন্তু সত্যিই খুব ভালবাসে।

সুব্রত ধূমায়িত চায়েব কাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উদাস সুরে বলল, মা মৃত্যুকালে যে ওর হাতেই আমাকে দিয়ে গেছেন।

এর পবে যেন কথা গতি হারায়। কিছুটা সময় নিঃশব্দ। নীববতা ভঙ্গ কবে বীণা বলল, আর দেরী নয়, সন্ধ্যে হয় এল, মামী রেগে বারুদ হবেন।

চায়ের খালি কাপটা টেবিলে রেখে সুব্রত বলল, আর একটু বসো। বৌদি আমার বাড়ীটা দেখবেন না ?

দীপ্তির চা খাওয়া শেষ হলে সুব্রত তার ছোট্ট বাড়ীখানা ঘুরিয়ে দেখাল। গেটেব পবে বেশ অনেকটা জমি, জমিটা দু-ভাগ করে, দেশী এবং বিলিতী ফুলের গাছ বসানো। মধ্যে লালসুরকীর সরু রাস্তা। মুখোমুখী দেশী বিলিতী। ফুলের যেন কম্‌পিটিসান চলছে—অজস্র ফুটে আছে। প্রকৃতির দানের অজস্রতার এমন আয়োজন বড় চোখে পড়ে না।

বাড়ীটা বাংলো ফ্যাশানের। পাশাপাশি বড় বড় তিনটে ঘরের কোলে চওড়া ঢালা বারন্দা। উঠোন পেরিয়ে টালির ছাদ দেওয়া রান্নাঘর এবং মধুর কোয়ার্টার। তাকে কোয়ার্টার বলা চলে, মাঝারি সাইজের ঘরখানার সঙ্গে খোলা একটু ছোট বারান্দা। বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী মধুর—অন্তত মধু এর বেশী আর কিছু চায় না। সবচেয়ে বাড়ীটির পরিচ্ছন্নতা ভারী ভাল লাগল। অপ্রয়োজনীয় কোথাও কিছু নেই।

একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুব্রত বলল, এটা আমার শোয়ার ঘর—আসুন ভেতরে। দেয়ালে একটি মধ্যবয়সী মহিলার অয়েল পেন্টিং ছবি টাঙ্গানো। দীপ্তি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ইনি কে?

আমার মা, বলল সুব্রত।

ছবির গলার ফুলের মালার গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত। পূব দিকের কোণ ঘেঁষে টিপয়ের উপর বসান বুদ্ধদেবের ধ্যানী মূর্তি। ধূপাধারে সদ্য-প্রজ্জ্বলিত সুগন্ধি ধূপ। ধূপের ধোঁয়ার পরিমণ্ডলে বুদ্ধদেবের অপার্থিব পবিত্র মুখের জ্যোতি আরো পরিস্ফুট হয়েছে। করুণাঘন নেত্রে যেন নূতন জিজ্ঞাসা—কি পেলে সুখী হবে আজ পৃথিবীর প্রাণ!

সুব্রতর খাটের ডান পাশের দেয়ালে একটি সুন্দরী কোন তরুণীর ছায়া-ছবি। তার মুখে স্বপ্রতিভ একটু হাসি। পোশাক পরিচ্ছদ অতি আধুনিক। সেই মেয়েটির গলায় রক্তগোলাপের মালা।

দীপ্তি আগ্রহভরা চোখে ছবিটি দেখতে লাগল। মুখ ফিরিয়ে বলল, সুব্রতবাবু, এ ফটো কার?

আমার একটি বান্ধবীর।

ওঃ। দীপ্তির চোখে কৌতুকের রোশনাই। ওদের এগিয়ে দিতে সুব্রত গেট পর্যন্ত এল। বীণাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা কেমন আছেন?

ঐ একই রকম। আচ্ছা সুব্রতদা, তোমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কি এ রোগের কোন ওষুধ নেই?

না। একেবারে সারে না। তবে সাময়িক রিলিফ দিতে পারে বৈকি। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে মনে হয় শিগগিরই একটা কোন ওষুধ আবিষ্কার হবে।

বীণার কণ্ঠে হতাশা। ততদিন কি আর আমার বাবা বাঁচবেন।

মাতৃহীনা মেয়েটির রুগ্ন পিতাব জন্যে উদ্বেগ ব্যাকুলতা ওদের হৃদয় স্পর্শ করল।

দরদী গলায় সুব্রত বলল, বীণা, বাবাকে কার কাছে রেখে মিটিংএ গিয়েছিলে?

বীণা মুখ টিপে হেসে বলল, বাবার বিদ্যাসাগর জামাইটিকে বলে এসেছি; কেবল পুঁথি মুখে কবে বসে থেকো না—বাবা ডাকলে যেন পান।

দীপ্তিব কণ্ঠে প্রতিবাদ। না, তোমার ভাবী অন্যায় অনিল-বাবুকে এরকম ঠাট্টা কবা।

ঠাট্টা নয় বৌদি, ও একালের ব্যতিক্রম। এত যে হুজুক, তা ওকে স্পর্শ করতে পাবে না। বাত নেই দিন নেই, পাঠ্যপুস্তকে চোখ রেখে বসে আছে। আমাব দস্তুরমত সন্দেহ হয়, ও কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নাকি?

সুব্রত হো-হো কবে হাসে, ঘুমিয়ে কখনও পড়া যায়?

হাসছ সুব্রতদা? আমার শরীর রাগে জ্বলে যায়। এত যে পড়া, রেজাল্ট বেরুলে অনিলের নাম তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। কিন্তু অনিলের অভিধানে নিরুৎসাহ শব্দটা নেই। আবার পুরোদমে চলল পড়া, আগামী বছরের পবীক্ষার জন্যে। এ হেন লোককে বিদ্যাসাগর ছাড়া কি বলবো বল?

দীপ্তির দৃষ্টি উদাস। গেটের লতান মাধবীলতার একটা পাতা নখে ছিঁড়ে টুকরো করতে করতে বলল, কিন্তু বাড়ীতে থাকেন।

বীণা চমকে তাকাল ওর কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনায়। মৃদু সংক্ষিপ্ত কথা ক'টি ওর মুখে হালকা চিন্তার ছায়া ফেলল। তবে কি প্রভাতদাকে বৌদি বুঝতে পারেনি! এসব লোককে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেম-পূজা সবই করা যায়—কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। দীপ্তির নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এ বড় সামান্য নয়।

ভগ্নদূতের মত মধু এসে খবর দিল, দাদাবাবু তোমার এক ছাত্তর এসেছে। বীণা মুচকি মুচকি হাসে। তা দেখে সুব্রত লজ্জিত হয়। এখনই এমন হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে যাবে সুব্রতর সেবা-ব্রত, তা সুব্রতর মোটেই ইচ্ছা নয়। সুব্রত কোন কাজেই আড়ম্বর পছন্দ করে না। ওর মতে, কর্মের সহজ সাবলীল ধারা আড়ম্বরের কোলাহলে স্তিমিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নীরব কর্মের মধ্যে শক্তি আপন গতি পায়।

মহামায়ার ব্যস্ত পদচারণা বীণা দূর থেকে দেখে দীপ্তিকে বলল, এই মরেছে, মামীর কাছে বকুনি খেতে হবে দেখছি।

উৎকণ্ঠিত মহামায়া প্রশ্ন করেন, এত দেরী হলো কেন রে?

সুব্রতদা ধরে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়ী। চা-টা খাওয়ালেন কিনা তাই দেরী হলো।

বিরক্তি প্রকাশ পেল মহামায়ার পরবর্তী কথায়। এ অবস্থায় রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা উচিত নয়, তা তোর বোঝা উচিত ছিল। বৌমা না হয় মেড়ো খোট্টার দেশে মানুষ, কিন্তু তুই তো বাংলা দেশেরই মেয়ে। যাও বৌমা, এ কাপড় জামা নিয়ে ঘরে ঢুকো না, আমি জামা কাপড় এনে দিচ্ছি, বদলে ফেলে, আগুন ছুঁয়ে তবে ঘরে ঢুকবে।

অপরাধীগলায় বীণা বলল, মামী, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

মহামায়া একথা শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি বললেন,

শোন বীণা, একটু আগে অমি এসেছিল প্রভাতের খোঁজে—সেটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু ওব চোখের দৃষ্টি ছিল উদ্‌ভ্রান্ত, মনে হলো কি যেন একটা উদ্বেগ ও মনের মধ্যে চেপে রেখেছে। আমি বললুম, বিশেষ দরকার নাকি রে? ও ছট্‌ফট করে বেরিয়ে গেল, বলে গেল, না। আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না।

বীণা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ মনে পড়ল, অমি ক'বছর আগেও ওর পোষা বেড়াল ছানাটাকে ভাত খাইয়ে পুকুরে নিয়ে যেত আঁচাতে। জল লাগতেই বেড়ালটা আঁচড়ে দিত ওর হাতে। আইডিন দিতে চাইত না জ্বালা করবে বলে। কেবল কি এই, কি খেয়াল চাপল, ওর বেড়ালের পায়ের মোজা বানিয়ে দিতে হবে আমাকে। আমি অস্বীকৃত হওয়ায় চুল টেনে খিমচে আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। আমাদের এক-চোখ-কানা রান্নার ঠাকুরটাকে দেখে কি রকম ভয় পেত! আমি সঙ্গে না গেলে রান্নাঘরে একা ভাত খেতে যেতে চাইত না। আব ভূতের গলা শুনলে তো কথাই নেই। রাতে আমাকে এমন জড়িয়ে শুতো যে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসত।

আজ ওর চোখের দৃষ্টিতে মামাঁও ভয় পান। বীণার চোখের উপর যেন গোপন রহস্যে ভবা একখানা কালো পরদা ঝুলতে থাকে। অন্যমনস্ক পায়ে সে বাড়ি চলে গেল।

সত্যপ্রসন্ন দীপ্তিকে দেখে খুশী হয়ে উঠেন। দীপ্তি পায়ের কাছে বসে নিঃশব্দে দাহুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সত্যপ্রসন্ন ভেবেছিলেন, দীপ্তিই কিছু বলবে। কিন্তু এ পর্যন্ত যখন ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না, তখন নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই বললেন, কেমন লাগল বক্তৃতা?

ভাল।

শুধু ভাল—আর কিছু নয়? কি বিষয় বলল?

ইংরাজ রাজত্বের কুফল সম্বন্ধে।

বৃদ্ধ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় দিদি, ওরা একটু বাড়াবাড়ি করছে। বিদেশী জিনিস বয়কটের ঠেলায় অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীব উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তাকে আমি কোন রকমেই সমর্থন করি না। ওরা যেন ভাবের ঘোরে উন্মত্ত হয়ে চলছে, বিচাব করে কিছু দেখছে না।

কিন্তু দীপ্তি একটু আগেই প্রভাতের এমন উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনেছে যে, তাকে শুধুই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস ভাবতে পারে না। অথচ দাদুব কথাব উপর প্রতিবাদ চলে না।

সত্যপ্রসন্ন ক্ষুণ্ণ হবেন ভেবে বলল, আপনার কথাই হয়তো ঠিক, দাদু। এমন সময় উমাচরণ এসে জানায় শাশুড়ী দীপ্তিকে ডাকছেন।

সত্যপ্রসন্ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, যাও, শুনে এসো।

মহামায়াকে আহ্নিক করতে দেখে দীপ্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুর চরণে প্রণাম জানিয়ে, জপের মালা দেয়ালের পেবেকে ঝুলিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তাবপবে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌমা, মাছের তবকাবিটা গিয়ে তুমি বান্না কব। নতুন ঠাকুর হয়তো নষ্ট করে ফেলবে।

ছেলের খাওয়ার কাছে এসে না বসলে মহামায়াব তৃপ্তি হয় না। দীপ্তি না বুঝে অনেক সময় প্রভাত কোর্ট থেকে এলে জলখাবার নিজে দিতে গেছে, কিন্তু তার পবে লক্ষ্য করে দেখেছে, শাশুড়ীর মুখে অমাবস্যার অন্ধকাব। প্রভাতও দীপ্তিব হাতে খাবার দেখে বলেছে, তুমি যে, মা কোথায়? তখন দীপ্তি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এখন অবশ্য এ ভুল আর হয় না। মহামায়ার নির্দেশমতই যা কিছু করে। সীমা লঙ্ঘন কবে না। এত দিনের অভিজ্ঞতায় দীপ্তি এটুকু বুঝেছে, প্রভাতের কোন কাজই দীপ্তি নিজে থেকে করলে, মহামায়া ঠিক তা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ সেই কাজ মহামায়ার হুকুমে দীপ্তি করলে, আর কোন গোল থাকে না।

মায়ের মনস্তত্ত্বের এ দিকটা এখনও দীপ্তির জানা নেই।

আজ রাতে প্রভাত একটু তাড়াতাড়িই এসেছে। দীপ্তির কাছে এটা অভাবিত। ত্রস্ত পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে প্রভাতের খাওয়ার যোগাড় করতে লাগল।

খাওয়ার সামনে যথারীতি মহামায়া এসে বসলেন। অবশ্য রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে। বিধবা হওয়ার পরে, বড় একটা আঁশ হেঁসেলে তিনি প্রবেশ কবেন না। কোন কাবণে একান্তই যদি যেতে হয় তবে পরে স্নান কবে ফেলেন।

খেতে বসে রান্না নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা প্রভাতের স্বভাব নয়। ভাল লাগলে আগ্রহ করে খায়। ছেলেব খাওয়া দেখলেই মহামায়া ভালমন্দ বুঝতে পারেন।

দীপ্তির রান্না কবা মাছেব কালিয়া যখন প্রভাত সম্পূর্ণটাই ঢেলে নিল, মহামায়ার তা দেখে মনে একটু অসন্তোষ জমল। কিন্তু বেশ আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, বৌমা, আরো দু'খানা মাছ প্রভাতকে দাও।

প্রভাত বিশেষ আপত্তি কবল না।

মহামায়া একটু নড়ে চড়ে বসে গলা ঝেড়ে বললেন, প্রভাত, বৌমাব বাবার আজ চিঠি এসেছে, বৌমাকে নিয়ে যেতে চান, আমাদের মত চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ বিষয় তোর কিছু বলার আছে কি ?

অন্যমনস্ক প্রভাত মার প্রশ্নে তাকিয়ে বলল, কি বলছিলে ?

মহামায়া হেসে বললেন, এতক্ষণ মনটাকে কোথায় চালান করেছিলি বল তো ?

অপ্রস্তুত ভাবে হাসল প্রভাত।

বিমর্ষ মুখে মহামায়া বললেন, কি এত ভাবিস বল তো ? কি চেহারা হয়েছে আরশিতে দেখিস।

নতুন আর কিছু হয়নি। তোমার ছেলে এর চেয়ে কবেই বা

সুন্দর ছিল ? বলে প্রভাত মার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহামায়া বললেন, ভাল থাকলেই ভাল। বলছিলাম, বৌমাকে ওব বাবা নিয়ে যেতে চান।

এ বিষয় দাদু এবং তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

তবে বেহাই মশাইকে আসতে লিখে দিই। এ অবস্থায় দূরের রাস্তায় তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল।

আড়ালে দাঁড়িয়ে দীপ্তি মা ছেলের সব কথাই শুনল। আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় মনের পাত্রে ব্যথা জমে ওঠে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রভাত শুতে যাওয়ার আগে দাদুর ঘরে গেল। ঘুমন্ত সত্যপ্রসন্নব মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হলো বড় রোগা হয়ে গেছেন। মুখে নিষ্ঠুর মৃত্যুর ছায়া। প্রভাত ঐ করুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না। পা টিপে-টিপে চলে যায় নিজের শোয়ার ঘরে। একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল। দীপ্তি এখনও শুতে আসেনি। একটু পরেই কোমল পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারল দীপ্তি আসছে।

দীপ্তি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পাপোষে ঘষে ঘষে পা মুছে, খাটে গিয়ে বসল।

প্রভাত স্মিতহাস্যে বলল, এত দেরী হলো কেন ?

বা-রে দেবী কোথায়! মা শুতে গেলে তবে তো আসব। জমাখরচ মেলাতে দেরী হলো মার, তারপরে একখানা চিঠি লিখলেন আমার বাবার কাছে।

আর তুমি চুপ কবে বসে রইলে ?

হ্যাঁ। এসবের পরে মাব পায়ে একটু গরম তেল মাখিয়ে তবে আমার ছুটি।

প্রভাত হাসতে হাসতে বলল, কে বললে তোমার ছুটি ? এবারে মার ছেলের একটু সেবা করো—মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

বাহুবেষ্টনে কাছে টেনে আনে প্রভাত। দীপ্তি তার চাঁপার

কলির মত আঙ্গুলগুলি প্রভাতের ঘন কৃষ্ণ কেশের অরণ্যে হারিয়ে ফেলে। অদ্ভুত ছন্দে দীপ্তির আঙ্গুল নৃত্য করে বেড়ায় প্রভাতেব কেশের রাজ্যে। প্রভাতের চোখ আরামে বুজে আসে।

প্রভাতের আবেশমুদ্রিত চোখ, দীপ্তি কোমল আঙ্গুলের স্পর্শে খুলে দিয়ে, আহুরে গলায় বলল, বা-রে এরই মধ্যে ঘুমোলে চলবে না। বলেছিলে, তোমার স্বদেশপ্রেমের প্রথম সূচনার গল্প একদিন শোনাবে? আর চলেই তো যাচ্ছি, আজই শুনবো।

তারপর সোজা হয়ে বসে, মুখ টিপে হেসে বলল, এই শোন, তোমার বক্তৃতা আমার খুউব ভাল লেগেছে।

প্রভাতের তন্দ্রা যেন যাতুমন্ত্রে মিলিয়ে গেল। প্রশ্ন কবল, গিয়েছিলে নাকি?

হঠাৎ কি যে হলো, দীপ্তিব ঠোঁট অভিমানে ঝড়েব পাখীর মত থবথর কবে কাঁপে, চোখে ভরে আসে জল। প্রভাতেব কণ্ঠে বিস্ময়! এ কী তুমি কাঁদছ!

মুখে আঁচল ঠেসে দিয়ে দীপ্তি কান্নার তুরন্ত বেগ প্রশমিত কবতে সচেষ্ট হয়।

ধরাগলায় বলল, আমাকে কেন বললে না তুমি?

প্রভাত স্থানকাল ভুলে হো-হো করে হেসে উঠল, এরই জন্যে কান্না! নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে দীপ্তিব চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, ভারী ছেলেমানুষ তুমি। দীপ্তির কম্পিত অধরে সোহাগের একটি তপ্ত চিহ্ন এঁকে দিয়ে প্রভাত বলল, এবারে খুশী?

ফিক্ করে দীপ্তি হেসে ফেলল। সিক্ত চোখে যেন হাসির রামধনু। দীপের আলোয় সে হাসিতে কত রঙই প্রতিফলিত হচ্ছিল!

দীপ্তি আঁটসাঁট হয়ে গুছিয়ে বসে বলল, এবারে আরম্ভ কর।

প্রভাত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, দীপ্তির ছোট হাত তুখানা নিজেব প্রশস্ত হাতের মুঠোয় ধরে বলতে লাগল—আমার বয়স তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। সেটা ছিল ১৯০৬ সাল। বরিশালে সে বছর

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হলো। আহ্বায়ক ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, সভাপতি হয়েছিলেন, এ. রসুল। পূর্ববঙ্গ তখন আলাদা প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশের নতুন ছোটলাট নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। দুর্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করছেন। হুকুম দিলেন—বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যেন এ রাজ্যে উচ্চারিত না হয়।

দীপ্তি বিস্মিতকণ্ঠে বলল, কেন ?

ওদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, ঐ মন্ত্রে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে জনতা। কালো হয়ে উঠল নেতাদের মুখ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ নির্মম আদেশ মেনে নিলেন। প্রতিশ্রুতি দেন অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নেতারা, কনফারেন্সে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উচ্চাবিত হবে না। এর পরে ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেব অধিবেশনের অনুমতি দিলেন। উৎসবের আনন্দে শহর বরিশাল মেতে উঠল। কাছাকাছি গ্রামের লোকরাও পিছিয়ে রইল না, সকলেই এসে যোগ দিলে উৎসবে। আমি তখন ছেলেমানুষ। নিজেকে শুধু দর্শকের ভূমিকায় ধরে রাখতে অনাগত পৌরুষে আঘাত লাগল। সাধ্যমত টুক্টাক্ কিছু কাজে লেগে গেলাম। খুশীর জোয়ারে মনতরী পাল তুলে কল্পনার বিচিত্র কর্মপ্রবাহে পাড়ি জমাল।

ব্যস্ত আমি, ব্যস্ত দেশের সকলে। দেশের সর্ববরেণ্য নেতারা আসছেন, তাঁদের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য-গর্বে সকল বক্ষ স্ফীত। আমরা সব স্বেচ্ছাসেবকেব দল, বুকে ব্যাজ এঁটে গুরুগম্ভীর চালে ঘোরাফেরা করছি। নিজেকে সেদিন যেন আর ছোট গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। অধিবেশনের প্রায় পনেরো দিন আগে থেকে মজুরদের সঙ্গে আমরাও হাত মিলিয়েছিলুম শহর পরিষ্কারে। যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু কুশ্রী সব নির্বাসিত হলো। রাস্তাঘাটের চেহারা ফিরে গেল। আর প্যাণ্ডেল তো ইন্দ্রপুরীসদৃশ হলো। মোটের উপর বরিশালের এমন রূপ ইতিপূর্বে কেউ যে আর দেখেনি,

সেকথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করল। সকলেই যেন দেশপ্রেমের মদে মাতাল। নেই অন্য কথা, নেই অন্য চিন্তা।

কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে কলকাতা থেকে আসছেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অ্যান্‌টি-সার্কুলার সোসাইটিব সদস্যরা। ওঁদের আনতে ষ্টেশনে গেলেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা, কিন্তু শর্তের কথা শুনে নেতারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন।

বঙ্গচ্ছেদ হওয়ার পবে এই প্রথম কন্‌ফারেন্স—বাংলা দেশের নানা জায়গা থেকে অনেক প্রতিনিধি এসেছিলেন। এ সব দেখে, গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন বিদ্রোহ লেগেই গেছে। এখন শক্ত হাতে একে দমন করা দরকার।

দীপ্তি নিঃশ্বাস বন্ধ কবে শুনছে। যেন ঐ অবকাশে কিছু ফাঁক পড়ে না যায়।

প্রভাত বলল, দীপ্তি, একটু জল। দীপ্তি গল্পরাজ্যের সীমানা থেকে উঠে এক গ্লাস জল গড়িয়ে প্রভাতের হাতে এনে দিল। এক নিঃশ্বাসে প্রভাত জলটা খেয়ে ফেলে। স্মিতহাস্যে বলল, কেমন লাগছে, দীপ্তি ?

খুব ভাল। বলো—

সরকারেব হুকুমে সভামণ্ডপে যাওয়ার রাস্তার দু-পাশে ঘোড়সওয়ার ছিল। অ্যান্‌টি-সার্কুলার সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা বন্দে মাতবম্ ব্যাজ লাগিয়ে লাইন করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পুলিশ তাঁদের আক্রমণ করল। নিরস্ত্র লোকগুলির উপর বেত চালাতে সেদিন বৃটিশ শাসকদের বিবেকে বাধেনি। চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু নয়) গুহ খুব আহত হন। অন্যান্য সদস্যদের দেহও অক্ষত ছিল না। সেদিনের ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সকলের সংকল্প আরো দৃঢ় হলো।

বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্! আকাশে-বাতাসে ঐ মহামন্ত্র ধ্বনিত হলো। সুরেন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে গেল ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন

সাহেবের বাড়ীতে ; সেখানে তাঁর জরিমানা হলো। টাকা দেওয়ার পরে আবার তাঁরা এসে সভার কার্য আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভবী ভোলেনি। সে তাব পুরোনো কথায় ফিরে এল। পরের দিন পুলিশেব একজন কর্তা ব্যক্তি এসে বললেন, সভায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেওয়া চলবে না। এই রাজনৈতিক সভার সঙ্গে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজনও হয়েছিল। এই বিপর্যয়ে তাও পণ্ড হলো।

দীপ্তি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল। প্রভাত একটু থামতে বলল, ব্যস, তারপরে সব শান্ত হয়ে গেল ?

না না, তা কখনও হয় ! ইংরাজের বিষম ভুল হলো। সভা হতে দিলে ওদের যা ক্ষতি হতো, ভেঙ্গে দিয়ে হলো তাব শতগুণ। আমাদের পক্ষে সম্মেলন না হওয়াটাই লাভের হয়েছিল।

বরিশালের এ আঘাত ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সর্বত্র। লাঠির আঘাতে বরিশালেব নাম অক্ষয় হলো। সকলেব মুখে মুখে চলতে লাগল, "বরিশাল, পুণ্যে বিশাল, হলো লাঠির ঘায়ে।" সঙ্গে সঙ্গে সমানে চলল, বয়কট আন্দোলন। যুবকরা ভাবল, কেঁদে কেটে, অনুনয় বিনয় কবে এদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। বাঙ্গালী সেদিন নির্ভীক সাহসে তাদের দাবী আদায়ের চেষ্টায় ব্রতী হলো। সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এমন তাণ্ডবনৃত্য চলতে লাগল যে বিশেষ কিছু বলতেই পাবলেন না। সকলের অনুরোধে বললেন, "ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। সুতরাং কোন একজনকে আমাদের দেশনায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ কবিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বাঙ্গালীকে আহ্বান করিতেছি।"

এই পর্যন্ত বলে প্রভাত দীপ্তির হাতে একটু চাপ দিয়ে স্মিতহাস্যে বলল, দীপ্তি, এ তো গল্প নয়—নিষ্ঠুর সত্য।

দীপ্তি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এই নির্মম সত্য আমার জীবনেরও ব্রত হোক। এই ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্ব এসো আমরা ভাগ করে নিই।

প্রভাত দীপ্তির হাত আবেগে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়ে বলল, দীপ্তি, তুমি শুধু আমার সহধর্মিণী নও, আজ হতে সহকর্মিণীও হলে।

বেতসলতার মত দীপ্তিব তনুদেহখানি ভাবের হিল্লোলে আন্দোলিত।

সকাল বেলায় বীণা রুগ্ন পিতাব পরিচর্যায় রোজই ব্যস্ত থাকে। আজও গরম জল এবং সাবান দিয়ে গোটা দেহ মুছিয়ে কাচা জামা কাপড় পবিয়ে দিল বাপকে। রাতে অমবনাথের অঙ্গ প্রায় সবগুলোই অসাড়। অশক্ত বৃদ্ধেব মেয়েটি চোখের মণি। একটু না দেখলে আঁধার দেখেন। অমবনাথেব মৃত্যুব পর হয়তো অমিতাভকে প্রয়োজন হবে—পবলোকে মুক্তির পথ সুগম করতে ওর হাতের জল-পিণ্ডের দরকার আছে বৈকি। ইহলোকে কিন্তু পুত্র তার কোন প্রয়োজনেই আসে না। ইদানীং চোখের দেখাটাও রোজ হয় না।

খবরেব কাগজ অমরনাথকে পড়ে শোনাচ্ছিল বীণা। শহরের সন্নিকটে একটি গ্রামে একদল স্বদেশী ডাকাত নাকি পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়েছে।

ঘটনাটা শুনে অমরনাথের বুক অজানা বিপদাশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকান। তারপবে মেয়েকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে বীণা, অমিকে আজ-কাল রোজ দেখি না কেন?

কিছুদিন হলো বীণাও তা লক্ষ্য করেছে। বয়কট আন্দোলন চলছে প্রচণ্ডগতিতে। বোসেদের সতু বলছিল, অমি নাকি বলেছে, কলেজ ছেড়ে দেবে। হয়তো বা এতদিনে ছেড়েও দিয়েছে। জিজ্ঞাসা কবলে জবাব পাওয়া যায় না। বাবাকে বলবার মত সাহস পাচ্ছি কোথায়। ভাল ছিল পড়াশুনোয়, দলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

আবার অমরনাথ প্রশ্ন কবেন, কোথায় যেন ডাকাতিটা হয়েছে!

এই তো কাশীপুর।

বেলা বারোটা বেজে গেছে, অমি এখনও ফেরেনি। বেরিয়েছে সেই কাল বিকেলে। বীণার মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। একবার প্রভাতদার কাছে যাওয়া উচিত কিনা ভাবছে। পাঠনিরত অনিলের কাছে গিয়ে বলল, বিদ্যাসাগরমশাই পুঁথি রেখে একটু অমির খোঁজ করে এস।

অনিল ভারী বিপদে পড়ল।

অমির গতিবিধি সম্বন্ধে সে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। তাছাড়া যার-তাব কাছে অনিল যেতেও ভয় পায়। বলা যায় কি কার কাছে গেলে পুলিশের নজরে পড়ে যাবে! অথচ বীণাব হুকুম অমান্য করা ওর পক্ষে সম্ভবই নয়। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুঁজতে বের হতে হলো।

অনিল ভাবল, সুব্রতদার কাছে যাই; তিনি হয়তো হদিশ দিতে পারবেন। কিন্তু বেচারীর বরাতই মন্দ। সুব্রতর বাবার খুব জ্বর, সুব্রত মাথায় হাওয়া দিচ্ছে।

অনিলকে দেখেই সুব্রত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি? অমরবাবুর—

না না, তিনি ভালই আছেন। মুস্কিল হয়েছে অমিকে নিয়ে। কাল বিকেলে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। বীণা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আপনি জানেন কোথায় গেছে?

না। আমি দুদিন থেকে বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত আছি। প্রভাত হয়তো জানতে পারে। তুমি বরং সেখানে যাও।

রাস্তায় বেরিয়ে অনিল ভাবল, প্রভাতদার কাছে যেতে হয় বীণাই যাবে। ওসব লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই পুলিশ সন্দেহের চোখে দেখবে।

কিন্তু রাস্তায় এত লোক কেন। লোকে লোকারণ্য। বিরাট

মিছিল বেরিয়েছে। মিছিলের পুরোভাগে একটি যুবক গাইছে, তার গলায় হারমোনিয়ম ঝোলান, সে গাইছে—“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগত জনের শ্রবণ জুড়াক—হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক—”

হাজার হাজার কণ্ঠ তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঐ বিপুল জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে বিক্ষোভ জানাচ্ছে, হার্বার্ট বিজলির পরোয়ানা মানবো না—ওদেব স্কুল কলেজে আদালতে কেউ যাব না—কেউ যেতে চাইলে আমাদের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আগামী কাল সর্বত্র পিকেটিং হবে।

স্থানীয় লোকদের কিন্তু সকলেব সব সময় পিকেটিংএ সমর্থন থাকত না। বেশীর ভাগই করত ভাবপ্রবণ যুবক এবং বালকের দলরা। প্রথমে ওবা বিদেশী মাল কিনতে লোকদের বাধা দিত, তাতে না শুনলে অনুনয়-বিনয় কবত, কিন্তু তাতেও যদি না শুনতো তবে অবশ্য প্রহার করতেও পশ্চাৎপদ হতো না। এই সব কাবণে বাধ্য হতো লোকেরা বিদেশী জিনিস না কিনতে। অফিস আদালতে যাওয়াও ঐ কারণে ব্যাহত হতো।

আজকের পিকেটিংএ কিন্তু বাধ সাধল প্রকৃতি নিজেই। সকাল থেকেই এমন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো যে, শহরে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেল। উৎসাহী ছেলেরা তাতেও নিরুৎসাহ হলো না। ঐ ঝড়-জলেব মধ্যে ছেলেরা প্রত্যেক সরকারী প্রতিষ্ঠানেব সম্মুখে বসে, দাঁড়িয়ে লোককে যেতে বাধা দিতে লাগল।

এমন কি নিবারণ দারোগার ইয়া গোঁফ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং লম্বা ছড়ির ভয়েও ছেলেরা ভীত হলো না। পরে পুলিশ সাহেব নিজেই এলেন, দুর্বিনীত ছেলেদের শায়েস্তা করতে। বললেন, পথ ছেড়ে দাও।

ছেড়ে তো দিলেই না, গান গেয়ে তার জবাব দিলে : “বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান—”

লাল হলো ক্রোধে সাহেবের মুখ। চলল চাবুক—ছেলেদের নাকে মুখে, বুকে পিঠে। কিন্তু ছেলেরা কর্তব্যে অটল। মুখ দিয়ে ওদের একটা শব্দ পর্যন্ত বের হলো না। অদূরে দাঁড়িয়ে নিবারণ দারোগা পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন, কেমন লাগে? শত শত রক্তচোখের বহ্নিজ্বালা-দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেরা।

সেদিনের নিবাবণ দারোগার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তি বোধ হয় বিধাতার কানে পৌঁছেছিল।

ঠিক এ ঘটনার সাত দিন পরে খবর এল, দারোগা সাহেবের পাঁচ বছরের পুত্র মোটর চাপা পড়ে মাবা গেছে। ছেলেটি গিয়েছিল মামাবাড়ী কলকাতায়, সেখানেই ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। উৎপীড়িত ছেলেরা রাত্রে বড় বড় কবে একটা কাগজে লিখে দারোগার দরজায় টাঙ্গিয়ে দিয়ে এল: এবারে কেমন লাগে? পবে অবশ্য নিবারণ দারোগা এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

অনিল বাড়ী এসে দেখে অমি খেতে বসেছে। বলল, কখন ফিরলে?

অমি নীরবে খেয়ে যেতে লাগল, জবাব দেওয়া প্রয়োজনবোধ করল না।

রাত্রে অনিল বীণাকে জিজ্ঞাসা করে, অমির কি হয়েছে বলো তো?

কেন, কিছু বলেছে নাকি?

না, আমার কথার উত্তরই দিলে না। ওর ভাবগতিক আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।

বীণা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমাকে এতদিন বলিনি, ভেবেছিলাম বিশেষ কিছু না। কিন্তু কাল রাতে যখন ও এল না তখন সেদিনের ঐ কথাটা মনে পড়ে গেল—ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। বাবার শরীরের অবস্থা দেখে তাঁকে তো কিছু বলতে পারি না।

অনিল ভয়কণ্টকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি শুনেছিলে?

বীণা বলল, দিন চারেক আগে, সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে, নতুন শাড়িখানা যে কিনেছি, সেটা দীপ্তি বৌদিকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম ঝাঁকড়া আমগাছটার তলায় প্রভাতদা আর অমি কি যেন কথা বলছে। আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল, কামিনী গাছের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার এমনই বরাত, দু-একটা কথা মাত্তর কানে এল। ওদের কথা তখন শেষ হয়ে গেছে।

প্রভাতদা যেতে যেতে বললেন, অমি খুব সাবধান। অমি একটু হেসে মাথা নেড়ে ওর সায় জানিয়ে অন্য রাস্তা ধরল। তখন অবশ্য ভেবেছিলাম, অমিকে জিজ্ঞেস করব, প্রভাতদা তাকে এত সাবধান হতে বললেন কেন। তারপরে দীপ্তি বৌদিকে শাড়ি দেখানো এবং নানা কথায় ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে অমি নিশ্চয় বিপ্লবীদের দলে ভিড়েছে। এর যে বিপদ কত, তা-তো বুঝতেই পারছ। বাবা মৃত্যুশয্যায়, অমি তাঁর একমাত্র ছেলে—কিছু একটা হলে, বাপ-ভাই একই সঙ্গে আমার হারাতে হবে।

প্রভাতদা তো কত মাস হলো কোর্ট ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁদের পরিবারেও একটা অমঙ্গলের ছায়া পড়েছে। বৌদির বাচ্চা হবে, দু-এক দিনের মধ্যে পাটনা চলে যাবে। দাদুরও শরীরের যা অবস্থা, বেশীদিন আর নেই। জানি না, দেশ কোনদিন স্বাধীন হবে কিনা। কিন্তু যা দুর্ভোগ যাচ্ছে আমাদের উপর দিয়ে।

স্বামী-স্ত্রীর এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় বীণার মনে হলো দরজার পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে।

কে—কে—

অপ্রস্তুতের হাসি মুখে নিয়ে ওদের নতুন চাকরটি হাত কচলে বলল, আমি দিদিমণি।

ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ?

না, দাঁড়াইনি তো—পায়ে মশা কামড়াল তাই চুলকোচ্ছিলাম।

বীণা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়।

এমনি ছোটখাট ঘটনার ভেতর দিয়ে দিনগুলি গড়িয়ে যাচ্ছিল।

কাল চলে গেছে দীপ্তি। বীণার বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। মহামায়াব কাছে যায়, কিন্তু গল্প তেমন জমে না। অন্য সঙ্গীও বিশেষ কেউ নেই। সুতো কাটায় খুব মন দিয়েছে। চরকা রাতদিন ঘড় ঘড় করে ঘুবছে। বীণা স্বগতোক্তি করে, সুব্রতদার মত মিহি সুতো কিছুতেই আমি কাটতে পারি না। সুতো অনেকটা জমেছে, সুব্রতদাকে গিয়ে দিয়ে আসব।

সুব্রত তিনখানা তাঁত পরিচালনা কবে। তাতে বেশ কিছু সংখ্যক যুবকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। বীণাও ওখানেই দিয়ে আসে সুতো জমলে। অবশ্য ওর মোটা সুতোয় ঝাড়ন, গামছা, পরদা ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছু হয় না।

কিন্তু সুব্রত হাস্যোজ্জ্বল মুখে যখন বলে, বাঃ বেশ হয়েছে। বীণা উৎসাহিত হয়।

সুব্রত অবসর সময় সুতো কেটে নিজের ধুতি পাঞ্জাবীর কাপড় তৈরী করে। ওর মিহি সুতোয় কাপড় ভালই হয়। ধুতি এবং পাঞ্জাবীই ওর পোশাক। বিশেষ কোন উপলক্ষে কাঁধে পাটকরা চাদরও ওঠে। ওর এই পরিচ্ছদ মধুর মোটেই পছন্দ নয়।

মুখ ভার কবে বলে, আজকাল ডাক্তাররা কেমন ইংরাজি পোশাক পরে, ঐ যে গো কোট পেন্টুলান—আর তুমি ? সাধে কি আর লোকে বলে, তোর দাদাবাবু হাঘরেদের ডাক্তার।

সুব্রত হেসে বলল, তাই বলে নাকি ?

বলবে না—তুমি তো কান থাকতেও কালা। কিন্তু আমার যে লজ্জা লাগে।

বীণার মনে পড়ে সুব্রতর সেদিনের কথা।

প্রশ্ন করেছিল বীণা, আচ্ছা সুব্রতদা, গান্ধীজি সকলকে যে সুতো কাটতে বলছেন, এর দ্বারা কি আমরা বিলিতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারব ?

সুব্রত বলেছিল, তা পারব না। তবে স্বাবলম্বী হওয়ার যে একটা চেষ্টা তাও কম কথা নয়। তাছাড়া নিজেব শ্রমলব্ধ জিনিসের উপর একটা মমতা জন্মায়। নিজের শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ।

অন্ন এবং বস্ত্রেব জন্যে পরমুখাপেক্ষিতাকে আমি মানুষের অযোগ্য বলে মনে করি। মোটা চাল এবং মোটা বস্ত্র প্রস্তুত কবা মানুষের পক্ষে খুব একটা বড় কিছু নয়।

সুব্রতদার কথা শুনতে ভারী ভাল লাগে। সব কাজেই ওর দৃঢ় মনের পরিচয়। আর প্রভাতদা যেন কালবৈশাখীব ঝড়। প্রচণ্ড তার গতি, সব কিছু যেন ভেঙ্গেচুবে, পিষে গুঁড়িয়েও তার গতি শান্ত হয় না। প্রভাতদাব অভিধানে যেন অন্যায় শব্দটা থাকতে নেই। কোন কিছু রয়ে-সয়ে হবার জো নেই।

এমন সময় বীণা পাশের ঘর থেকে অমবনাথেব করুণ আহ্বান শুনতে পায়।

অমবনাথ ছটফট কবছেন, দৃষ্টি ঘোলাটে। বীণা মুখের উপর ঝুঁকে ডাকে, বাবা—কোন উত্তর নেই। ত্রস্ত পায়ে ছুটে গিয়ে অনিলকে ডেকে আনল। দেখ, বাবা যেন কিরকম করছেন। তুমি গিয়ে সুব্রতদাকে ডেকে আন। যদি তাকে না পাও, তারিণীবাবুকে ডেকে আনবে। অনিল ছুটে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই সুব্রতকে পাওয়া গেল না। তারিণীবাবু এসে একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। তাতে একটু আক্ষেপ কমে, চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়। তারিণীবাবু যাওয়ার সময় বীণাকে রোগীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলে গেলেন।

খুব সকালে অমি বেরিয়েছে, এখন রাত অনেক, কিন্তু অমির

দেখা নেই। বীণা এবং অনিল দুজনে অমরনাথের দুপাশে বসে আছে। ঘরের এক কোণে টাইমপিস্ ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করেই চলেছে। যেন কালেব সতর্ক প্রহরী সে। কুলুঙ্গিতে হ্যারিকেন জ্বলছে। রোগীর মাথার কাছে একখানা ছোট টেবিলে ওষুধের অসংখ্য শিশি বোতল। কত রং-বেরঙের ওষুধ তাতে। কোন শব্দ নেই ঘরে। মাঝে মাঝে অমরনাথের কাতর উক্তি শোনা যাচ্ছে। বীণা এবং অনিল একটু কোন শব্দেই চমকে তাকাচ্ছে। যেন কার আসাব কথা আছে। কে সে? অমি, না মৃত্যু?

খোলা জানালাব পাশে সঞ্চরমান গাছের পাতায় মৃত্যুব হাতছানি।

বীণা ভাবছে—অমি এখনও এল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল তিনটে বেজেছে।

অনিল বলল, বীণা, রাত আর বেশী নেই, তুমি একটু গড়িয়ে নাও—আমি তো রইলাম, কিছু ভেবো না।

একরকম জোর করেই বীণাকে অনিল শুতে পাঠিয়ে দিল।

বীণা কেবল শুয়েছে, দবজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনতে পেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠে বসল। হৃদযন্ত্রেব ক্রিয়া অস্বাভাবিক দ্রুত হয়। আবার শব্দ। দরজার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, কে—

ওপিঠ থেকে অতি অস্পষ্ট ফিস্‌ফিসে গলায় উত্তর, আমি—অমি—

বীণার হাত অসম্ভব কাঁপছে, কিছুতেই ছিটকিনি খুলতে পাবছে না। ওপিঠের অধৈর্য স্বর—খোল না—

সমস্ত শক্তি দিয়ে বীণা খুলে ফেলল ছিটকিনিটা। ঝুপ করে অমি ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল তুলে দিল। অসম্ভব অস্থিরতা তাব দেহে-মনে। ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বীণা বলল, অমি, তোর জামায় রক্ত! মধ্যমা এবং তর্জনী ঠোঁটে চেপে অমি বলল, চুপ!

নিঃশব্দ ঘরে দুই ভাইবোন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। সুগভীর

আতঙ্কের ছায়া ওদের মুখকে করেছে ভয়ানক। কোণে তেলের প্রদীপ হাওয়ায় কাঁপছে। একটা টিকটিকির মুখ থেকে শিকার ফসকে যাওয়ায়, টিক্‌টিক্ শব্দ।

ধ্যানমগ্ন রাত্রির নীরবতা পুলিশের গাড়ীর বিকট হর্নে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সচকিত অমিতাভর ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বীণার চোখে ব্যাকুল মিনতির আকুল ব্যঞ্জনা।

দৃঢ়হস্তে অমির হাত চেপে ধরল বীণা। বিশ্বের যত অকল্যাণ হতে মাতৃহীন ভাইটিকে তার স্নেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখবার দ্বিধাহীন প্রয়াস। শরৎ মেঘের গর্জনের মতই ক্ষণপূর্বে শ্রুত ধ্বনিকে লঘু করে ভাবতে সচেষ্ট হলো। প্রতীক্ষমান মৃত্যুশিয়রে পিতার মুখ মনে পড়ল। সান্ত্বনাহীন বেদনায় বুকের ভিতর হাহাকার করে ওঠে।

হিমশীতল একটা বস্তু যেন দেহাভ্যন্তব থেকে বেরিয়ে এখুনি ওকে প্রস্তরে পরিণত করবে। শীতে না ভয়ে? বীণা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

অমি জিব দিয়ে শুক্‌নো ঠোঁট চেটে বলল, একটু জল।

গ্লাসটাকে কিছুতেই বীণা ধরতে পারছে না। মনে হয় ওর, অমির কণ্ঠস্বর যেন পৃথিবীর কোন অজানা দেশ থেকে ভেসে আসছে। এ স্বর বীণার অপরিচিত। সে বুঝি এখুনি অচেতন হয়ে যাবে। আপ্রাণ চেষ্টায় চেতনাকে ধরে রাখে।

ভারী বুটের পদক্ষেপে বীণার বুকের পাঁজর যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। জলের গ্লাস অমির মুখের কাছে তুলে ধরল।

মরুভূমির তৃষ্ণা অমির। কম্পিত দু'হাতে গ্লাস ধবে সব জলটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। গায়ের রক্তমাখা জামাটা অনেক চেষ্টায়ও খুলতে পারছে না।

শঙ্কিত হরিণীর মত চকিত দৃষ্টি ফেলে বীণা বলল, ছিঁড়ে ফেল।

ছেঁড়া জামাটা বীণা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জলের কলসির মধ্যে ভরে

ফেলল। ধুতি খুঁজে না পেয়ে নিজের একটা শাড়ি অমির হাতে দিয়ে বলল, কাপড়টা ছেড়ে শাড়িটা লুঙ্গির মত ভাঁজ করে পর।

ছাড়া ধুতিটা হাতে নিয়ে বীণা একটু ভাবল কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়। এদিকে পুলিশ তখন ঘরেব দরজায়। তাড়াতাড়ি বিছানার তলায় লুকিয়ে ফেলল। অমির চেয়েও বীণার পা কাঁপছে অনেক বেশী।

নাঃ, জোরে দরজায় ধাক্কা পড়ল। দরজা খুলে বীণা একপাশে সরে দাঁড়াল। সদর্পে নিবারণ দাবোগা সিপাই-সান্ত্রী নিয়ে প্রবেশ করলেন।

ভাইবোনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও অমি প্রমাণসহ খুনী সাব্যস্ত হলো। শেষ রাতের আলো-আঁধারের ছলনায় পায়ের রক্তের ছিঁটা ওদের লক্ষ হয়নি। নিবারণ দারোগার শকুনের দৃষ্টি এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলো অমি।

এত সহজে এ রকম অপবাধী ধরা পড়তে অন্তত নিবারণ দারোগা দেখেননি।

বীণা দারোগা সাহেবের পায়েব উপর লুটিয়ে পড়ল। কেশ বেশ অসংবৃত। কখন যে খুলে পড়েছে গায়ের কাপড় টেরই পায়নি। ধূর্ত দারোগার দৃষ্টি আটকে পড়ে ওর উন্নত বুকে। লালসার দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেহন করে।

বীণা সিক্ত চোখে বলল, ছেলেমানুষ ভাই আমার, প্রথম অপরাধ বলে কি ক্ষমা করা যায় না? ভবিষ্যতের জন্যে আমি জামিন রইলাম। এবারটি ছেড়ে দিন! বরং এর পবিবর্তে আপনি যা চাইবেন, আমি তাই দেব।

বীণার প্রতিশ্রুতিতে অমির আত্মসম্মানে ঘা লাগে। পরুষকণ্ঠে সে বলল, নিবারণবাবু, যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। আমার বাবা যেন কিছু জানতে না পারেন।

কিন্তু গোল বাঁধাল পুরোনো দাসী সুখদা। খুব ভোরে ওঠা তার

অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে এসেই যখন দেখল বাড়ী-ভর্তি পুলিশ, তখন ভয়ে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল—ওবাবা গো—কি হলো গো—

ওর চিৎকারে অমরনাথের বিস্মৃতপ্রায় চেতনায় ঘা লাগল। অনিল পুলিশের আবির্ভাব কিছু আগেই টের পেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাস্থলে আসা নিরাপদ মনে করেনি। অমরনাথের সেবার আড়ালে আত্মগোপন করে বসেছিল।

চমকে তাকিয়ে অমরনাথ অস্পষ্ট স্বরে অনিলকে বললেন, কে কাঁদছে ?

সুখদা।

সুখদা কাঁদে কেন ?

পুলিশ এসেছে কি না তাই দেখে।

পুলিশ, পুলিশ কেন ?

অনিল ভাবল, আর লুকোন গেল না। কাঁচুমাচু মুখে অনিল বলল, অমিকে—

অমরনাথের জীবনপ্রদীপ যেন শেষবারের মত জ্বলে উঠল—চেতনার শেষ সম্বল দিয়ে বললেন, কি, কি বললে! অমিকে পুলিশ—অর্ধসমাপ্ত কথা মুখেই রয়ে গেল ; অমরনাথ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

এদিকে নিবারণ দারোগা সদলবলে অপরাধী অমিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বীণার যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল।

বীণা চমকে উঠল। পরিপূর্ণ যৌবনের পূর্ণতা ওর দেহে, এতদিন যেন উদাসীন ছিল সে বিষয়ে। আজ প্রথম উপলব্ধি করল, সে নারী, পূর্ণযৌবনা নারী। লজ্জার শিহরণ খেলে গেল চোখে মুখে।

অমিকে নিয়ে চলে যেতে বীণা অমরনাথের কাছে এসে বসল। জীবনের যেন একটা দিক খালি হয়ে গেছে। শূন্যদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অচৈতন্য অমরনাথের মুখে কোন বিকার নেই। নির্বিকার পরম শান্তির সে-নিদ্রা।

সে-নিদ্রা আর ভাঙ্গল না। বেলা ছুটোর সময় তিনি মারা গেলেন। বীণা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বীণার ছোট বুকখানায় যেন শোকের সমুদ্র উথলে উঠল। বীণা বেহুঁশের মত পড়ে রইল বাপের পায়েব তলায়। মহামায়া এসে কোলে তুলে নিলেন বীণাকে। সুব্রত বড় ভাইয়ের মত অনিল এবং বীণার পাশে এসে দাঁড়াল।

অমরনাথের একমাত্র পুত্র বলে অমিকে মুখাগ্নি করবার জন্যে পুলিশ-সমভিব্যাহাবে সরকার কয়েক ঘণ্টার জন্যে দয়াপরবশ হয়ে ছুটি দিয়েছিল।

বীণা সকলের সহায়তায় বাপেব শ্রাদ্ধ বেশ ঘটা কবেই কবল।

কাজকর্ম চুকে গেলে বীণাব বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। যেন ফাঁকা হয়ে গেছে জীবনটা। অমরনাথের অস্তিত্ব দিযে যে ওর জীবনেব অনেকটাই পূর্ণ ছিল, তা টের পেল তাঁব অবর্তমানে।

বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভাব অমরনাথের জীবিতকালেও নায়েব গোমস্তার উপরই ন্যস্ত ছিল, এখনও তাই। সুব্রত মাঝে মাঝেই এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়।

প্রভাত এখন বরিশালে খুব কমই থাকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষ বোসের প্রভাব তার উপর অনেকখানি। তরুণ নেতা সুভাষ প্রভাতের প্রেরণার উৎস। চলার পথের দিশারী।

তাঁদের সঙ্গেই ওর এখন বেশীর ভাগ সময় কাটে। পারিবারিক জীবনের যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন।

কোর্টে অমিতাভব কেস উঠেছে। এ সময় বীণাব প্রভাতের কথা বড় বেশী মনে হয়। উকিল প্রভাতের বুদ্ধির উপর ওর যথেষ্ট আস্থা ছিল। যদিও সে প্র্যাকটিস অনেক দিন ছেড়েছে, তবুও এইরূপ জটিল কেসে তার বুদ্ধির দাম অনেক। অবশ্য নায়েব অভয় গাঙ্গুলী এবং সুব্রত এ মোকদ্দমার তদ্‌বির যথেষ্টই করছে।

মহামায়া এখন আর মোটেই সময় পান না। দীপ্তি চলে গেছে

বাপের বাড়ী, বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা সবই ওঁর একাব করতে হচ্ছে। তবু ওর মধ্যেই সময় করে এসে বীণার কাছে বসেন। তাঁর নিজের মনও উদ্বিগ্ন ছেলের জন্যে।

এই সর্বনেশে দেশের ডাকে সে সময় যে সব পবিবারের লোকেরা সাড়া দিয়েছিল, তাদের গার্হস্থ্য জীবন বলে কিছু ছিল না। দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে ধূপের মত নিঃশেষে নিজেকে জ্বালিয়ে গেছে। তাদেব জীবনবেদ পববর্তী পুরুষেব মহান আদর্শ।

কাগজে ডাকাতির বিস্তারিত বিবরণ পড়ে বীণা হতবাক্।

ঘটনাটা এইরূপ, গত রাত্রে বরিশাল শহব থেকে মাইল তিনেক দূরে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে সশস্ত্র স্বদেশী ডাকাতের দল প্রবেশ করে গৃহস্বামীকে ছুবিকাহত কবে প্রায় দশ হাজাব টাকার অলঙ্কার এবং নগদ এক হাজাব টাকা নিয়ে উধাও হয়। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় একজন ডাকাত নিজ গৃহে ধবা পড়ে। তাব নাম অমিতাভ দত্ত। পুলিশ অনেক আগে থেকেই এই যুবকটিব গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য একজন সি. আই. ডি.-কে ওদেব বাড়ীতে গৃহভৃত্যের কাজের জন্য পাঠায়। এবং সে নিযুক্ত হয়। সমস্ত দিন এবং গভীর রাত্রিতেও যখন অমিতাভ বাড়ী ফিরল না, তখন থেকেই তার চক্ষুকর্ণ সজাগ রাখে। কাজেই অমিতাভর আগমন টের পেতে তাব দেরী হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই থানায় চলে আসে। এই কাবণে আসামী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে।

কাগজ পড়ে বীণা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। ইস্, আমি যদি সেদিনই ওকে তাড়িয়ে দিতাম, যেদিন আমার সন্দেহ হয়েছিল ও লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছে! তা ছাড়া ইদানীং অমির চাল-চলন দেখেই আমার আরো অনেক বেশী সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক ছেলেমানুষ, মাথার উপর একটা বুদ্ধি দেওয়ার কেউ নেই। আমি না বুঝলেও পুলিশ অনেক আগেই বুঝেছে। আর বোধ হয় প্রভাতদা জানতেন। সেদিনের

'খুব সাবধান' অশরীরী আত্মার মত পিছু নিয়েছে আমার।

অমি যখন স্কুলে পড়ত, তখন চুলটা ভাল করে আঁচড়াতে জানত না। অনেক করে বললে, মাথার মধ্যিখানে এক ইঞ্চি লম্বা সিঁথি কাটত। দু'পাশে একটু চুল সরিয়ে দিত, কেমন হাবলা হাবলা দেখাত। তখন স্কুলে ছেলেদের শাসন ছিল। কোন ছেলে নাকি লম্বা টেরি কেটে চুল আঁচড়ে ছিল, দেবু মাষ্টার তা দেখে রেগে আগুন। সেই ছেলেকে দিয়েই বেত এনে, তার সাধের টেবির উপর দু-তিন ঘা বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিঁথি ফুলে ঢোল।

সে-সময়ের পুলিশের অত্যাচার কসাইকেও লজ্জা দিত। বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে অমিও বেহাই পেলে না। নানা রকম পীড়ন চলল। তার কত নাম—গুম্ফ উৎপাটন, নখের মধ্যে ছুঁচ বিদ্ধকরণ, অনাবৃত পৃষ্ঠে চাবুক মারা, আরো অনেক কিছু। অমির প্রায় সবই এক এক করে হয়ে গেছে। কিন্তু এসবের পরও কর্তৃপক্ষ ওর জিভ দিয়ে দলের একটি লোকের নামও উচ্চাবণ কবাতে পারলে না।

বীণা যেদিন জেলে অমির সঙ্গে দেখা করতে গেল তার আগের দিনই ওকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হয়ে গেছে। দেহে তখনও তাজা আঘাতেব চিহ্ন। বীণা তা দেখে, চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তা দেখে যুবক অমির হাসি পায়। দিদি এখনও কি ছেলেমানুষ। কিন্তু একটু পরে যখন বীণা সিক্তচোখে কম্পিত স্বরে বলল, ভাই এ কী কবেছিস! সে-স্বরে বিপ্লবী অমিতাভ কেঁপে ওঠে। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংহত করে গাঢ়স্বরে বলল, দিদি, তোর আশীর্বাদ পেলে এ আঘাত তো কিছুই না, জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। জেলের কঠিন লোহার গরাদেব অতি কাছে এসে মাথা নত করে অমি বলল, দিদি, আমার মাথায় একটু হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ কর।

বীণার তখন আইন-কানুন, শৃঙ্খলা সব কিছুর উপর ধিক্কার

এসেছিল। কেন এত ব্যবধান! কেন ভাইটিকে সে বুকে চেপে ধরতে পারছে না!

যাওয়ার সময় বীণা ভাইয়ের মাথায় হাত রেখে নীরব আশীর্বাদ জানাল—ভগবান তোমার সাথে থাকুন।

পরের দিন অমিকে দেখতে গেল সুব্রত। দেখে অমি ভাবী খুশী। সুব্রতদা, আপনি! গলা আবেগে বুজে যায় অমির।

কিন্তু এ কী! সুব্রতর চোখে জল! ওর সুকুমাব তরুণ দেহটির এমন বীভৎস রূপ সে কল্পনা করতে পাবেনি। কোমবে ব্যাণ্ডেজের উপব দিয়েও যেন দেখা যাচ্ছে দগ্‌দগে ঘা-টা। সামনেব একটা দাঁত বোধ হয় ঘুসির চোটে ভেঙ্গে গেছে। দাড়িগুলি যেন পুলিশেব সঙ্গে বিদ্রোহ কবে আপন খেয়ালে বেড়ে চলেছে। বিপ্লবের এমন প্রত্যক্ষ রূপ সুব্রত আর কবে দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, বৃটিশসিংহ পূর্বতেজ হারাতে বসেছে। আজ সে ঐটুকু ছেলেকেও ভয় পায়। তার তূণে যত প্রকারের বাণ আছে, তা পরীক্ষা করতে ঐটুকু দেহও তার কাছে লজ্জার নয়।

সুব্রত কাছে আসতে অমি বলল, সুব্রতদা, আমার একাজ নিশ্চয় আপনার সমর্থন পাবে না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কোন হীন নয়।

সুব্রত স্মিতহাস্যে কাছে এসে বলল, লক্ষ্য আমাদের সকলেরই এক।

তবে তোমার আশীর্বাদ আমি পাব তো?

নিশ্চয়ই পাবে।

সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় সুব্রত অমির হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, আজ তা হলে যাই ভাই!

অমির চোখে সম্মতির একটু মিষ্টি হাসি।

যেদিন অমির মোকদ্দমার রায় বের হলো, বীণা কেঁদে ভাসিয়ে দিল। ছুটে এলেন মহামায়া, বুকে চেপে ধরলেন পিতৃমাতৃহীনা

মেয়েটাকে। মহামায়ার বুকে মুখ লুকিয়ে বীণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মহামায়াব বুকেও এক অনিশ্চিত আগুনের শিখা জ্বলছে। বীণার চোখের জলে সে শিখা যেন আরো প্রজ্জ্বলিত হলো। আজ যেন নিবিড় করে অনুভব করেন ব্যথাকে।

বীণা অবাক হয়ে ভাবে, সাত বছর!

অমির সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। সাত সাতটা বছর অমি এ বাড়ী আসবে না, একথা যেন বীণাব কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। ছুটে গেল অনিলের কাছে। সে পড়ছিল বসে। তাকে ঝাঁকিয়ে বলল, না না, আমি এ অন্যায় বিচার মানব না—আমি হাইকোর্টে আপিল করবো।

অনিল চায় না এ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। বীণার হাত ধরে কাছে বসিয়ে অনিল বলল, আচ্ছা সে পরামর্শ করে দেখা যাবে।

প্রভাত কিছুদিন হলো কলকাতা থেকে ফিরেছে। সত্যপ্রসন্ন প্রভাতের পরিবর্তনে বিস্মিত হন। একটু দুঃখও পান।

দাদু বলে গলা ছেড়ে ডাকা, কাছে বসা কিছুই নেই। সব সময় যেন কি একটা ভাবে বিভোর হয়ে আছে প্রভাত। সত্যপ্রসন্নর নিকট নাতির এ রূপ আনন্দের নয়। যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নিজেকে মানিয়ে নিতে। মনে হয়, প্রভাত কি একা দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছে? কত গণ্যমান্য ব্যক্তি গান্ধীজীব নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগ দিযেছেন। এত বড় ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে নেবেছেন। আরো কত নেবেছেন, ক'জনের নাম আমি আব করবো। কি আশ্চর্য! ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেও চাকুরি গ্রহণ করলেন না সুভাষ বোস। এই তো সেদিন নৃপেন বাঁড়ুজ্জে অধ্যাপনার কাজটা ছেড়ে দিলেন। শ্রীহেমন্ত সরকার, শ্রীকিরণশঙ্কর রায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন সরকারী কাজ। এ

তো গেল বাংলার কথা। এলাহাবাদের এত বড় ব্যারিষ্টার মতিলাল, তিনি ছাড়েননি ব্যারিষ্টারী! তাঁর এত বড় কৃতী পুত্র জহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নরেন্দ্রদেব, কৃপালনী—কে নয়! সবাই যেন দেশ-প্রেমের তুফানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

এত সব অকাট্য যুক্তিতেও বৃদ্ধেব মনেব স্থৈর্য ফিরে আসে না। অশান্ত মনে ভাবেন, এ কি আমার অপত্যস্নেহের জন্যে? একমাত্র সন্তান চলে গেল, একমাত্র নাতিটিকেই আশ্রয় করে বেঁচে রইলাম, এখন সে-আশ্রয়টুকুও যদি দেশের কাজে দশের হাতে চলে যায়, তবে আমি কি নিয়ে বাঁচবো!

কচি ছেলে অমি—তার কানেও গিয়ে পৌছল দেশের ডাক। কি কেলেঙ্কারিটাই না কবল! সাত বছব জেলের ঘানি ঠেলে ও ছেলের আর কি অবশিষ্ট থাকবে।

মহামায়াব ডাকে বৃদ্ধেব চিন্তাব সূত্র ছিঁড়ে যায়।

বাবা, দুধটুকু খান। সত্যপ্রসন্নর মুখেব কাছে মহামায়া দুধেব বাটি তুলে ধরলেন। বিকৃত মুখে দুধটা খেয়ে ফেললেন।

মহামায়া বললেন, আজ কি রাঁধব? কি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে?

কিছু না, বৌমা। মুখে সব কিছু তেতো লাগে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আব কত দিন সেবাযত্ন কবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে বৌমা? এখন ভগবান মনে করলেই যে বাঁচি।

অনেকদিন পরে আবার প্রভাত হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল, উঁহু, ভগবানকে মনে করতে দিচ্ছি না। তিনি অন্যত্র ডিউটি সারুন।

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে সত্যপ্রসন্ন বললেন, না দাদা, পৃথিবীব জমি আর আমার মত লোকের প্রাণধারণের উপযুক্ত নেই। দেশপ্রেমের ঢেউয়ের সাথে যার লড়বার ক্ষমতা আছে, তার পক্ষে আনন্দের।

প্রভাত হেসে বলল, এ তোমার অভিমানের কথা হলো দাদু। তার পরে গম্ভীর হয়ে বলল, স্বাধীনতার প্রয়াসকে তুমি সমর্থন কর না দাদু?

না ভাই। আমার যে নিজের নাড়িতে টান পড়েছে। তার ব্যথা তো কম নয়।

দাছর যে কোথায় ব্যথা তা প্রভাতের অবিদিত নয়। কিন্তু সে উপায়হীন। দাছর মাথার কাছে বসে, ধীরস্বরে বলল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্থভাস বোস এঁদের যদি একবার নিজের চোখে দেখতে দাছ, তবে বুঝতে পারতে কত বড় মহাপ্রাণ আজ দেশের ছঃখে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাঁদের ত্যাগের কাছে আমার এই সামান্য সেবা তো সমুদ্রের নিকট গোষ্পদতুল্য।

নাতির কথায় বৃদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বললেন, তোমরা যে দেশেব লোকেব ছঃখে এমন করে সর্বস্ব ত্যাগ করছ, তারা কিন্তু তোমাদেব আচরণকে অত্যাচাবই মনে করে।

প্রভাত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দাছর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কথার মানে?

মানে অতি সোজা। কাল আমাকে দেখতে এসেছিল ছিদাম বসাক। অমি ওর অনেক কালেব খদ্দের, তাই বসে ছটো স্থখ-ছঃখের কথা বলল। সে বলল, কর্তা, খোকাবাবুকে ছোট থেকেই দেখেছি, কত কোলে পিঠে কবেছি, আজ সে-ই কিনা দলের আগে থেকে আমাদের দোকানের বিলাতী কাপড় অগ্নিযজ্ঞে ফেলে দিলে। কেবল আমার দোকান নয় কর্তা, চকের মধ্যের সব দোকানের।

অসহিষ্ণু প্রভাত বলল, না জেনে সে যদি দেশের অনিষ্ট কবে, তাকে তা সমঝে দেওয়া কি তুমি অন্যায় বলবে?

না। শোন, আমার আরো বলার আছে। তোমাদের গরম গরম বক্তৃতাব তাপ দিয়ে দেশের লোকের মন গলিয়ে দামী দামী বিলিতী কাপড়গুলো দিয়ে যে সেদিন বহ্নি-উৎসব করলে সে টাকাটা গেল কোন দেশের? কচি কচি বউ ঝি, বাপ স্বামীর কত কষ্টের রোজগার করা পয়সায় ঐ সব কাপড় কিনেছিল। তা ছাড়া ছোট ছোট ব্যবসায়ীর যা লোকসান তোমরা করছ, সে লোকসান তারা

কোনদিন সামলে উঠতে পারবে ? ফলে দরিদ্রের সংখ্যা দেশে আরো বেড়ে যাবে। তোমাদের এমনভাবে তাদের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত ছিল যে, ভবিষ্যতে তারা যেন বিলিতী মাল আর না কেনে।

প্রভাতের তূণে এ যুক্তি খণ্ডন করবার অনেক বাণ আছে। কিন্তু, প্রয়োগ করতে সাহস হয় না। কি জানি উত্তেজনায় দাদুর পক্ষে হার্টফেল করাও অসম্ভব কিছু নয়।

শুধু এইটুকু বলল, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেব জন্যে ছোটখাট অপচয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অপচয়ের বুকের উপব দিয়েই প্রাচুর্যের রাস্তা প্রস্তুত হয়।

সত্যপ্রসন্ন যেন আজ মবিয়া হয়ে উঠেছেন, একটু দম নিয়ে বললেন, তোমাদের ঐ সব হেঁয়ালী কথা আমি বুঝতে পারি না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার আরো এক দফা অভিযোগ আছে।

আজ থাক না দাদু। এক সঙ্গে এত কথা বলা তোমার উচিত হবে না।

না প্রভাত, আমাব সময় এখন গণনাব মধ্যে। থামলে আমার হয়তো বলাই হবে না।

প্রভাত ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, এমন কি কথা যে এখুনি বলতে হবে ?

তোমার কাছে হয়তো এমন কিছু নয়, কিন্তু আমার কাছে তার দাম অনেক।

সত্যপ্রসন্ন বলেন, রায় মশাইদের প্রজা মঙ্গলদাস এসেছিল সাক্ষী দিতে আদালতে। ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। কথায় কথায় সে বলল, স্বদেশী বাবুরা বলে বেড়াচ্ছেন, ইংরাজ আমাদের শোষণ করছে, নানা রকম অত্যাচার করছে। কিন্তু আমরা দেখছি কর্তা অন্য রকম। অত্যাচারের যত রকম নমুনা তা আমরা আমাদের দেশের লোকের হাতেই পেয়ে থাকি। মনে করুন জমিদারদের কথা, তেনারা আমাদের দেশেরই লোক—তেনাদের নায়েব গোমস্তাও আমাদের দেশের লোক। শোষণ, শাসন, অত্যাচার

তাদের মত গরীব প্রজার উপর আর কেউ করতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। তবু যতটুকু আমরা সুবিচার পাই, সে তো ঐ ইংরাজের আদালতেই।

তবেই ভেবে দেখ প্রভাত, আগে কর্তব্য দেশের লোকের মানসিক সংস্কাব। সেদিকে চোখ বুজে তোমরা ভাবের ষ্টীম-রোলার চালাচ্ছ।

মহামায়া উত্তেজিত শ্বশুরকে লক্ষ্য কবে প্রভাতকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, দাদুকে দিয়ে এতক্ষণ কথা বলানো তোমার উচিত হয়নি প্রভাত।

বেলা প্রায় বারোটা। মহামায়া সহাস্যমুখে সত্যপ্রসন্নকে বললেন, বৌমাব চিঠি এসেছে বাবা।

পড়ে শোনাও, কি লিখেছে দিদি।

মহামায়া চিঠি পড়ে শোনাতে লাগলেন, চিঠিখানা ভবাই দাদুর শরীবের জন্যে ব্যাকুলতা এবং তাঁকে দেখবার আকুলতা। চিঠির শেষে লিখেছে, শবীর ওব ভাল যাচ্ছে না।

অসুস্থতাব কথা শুনে সত্যপ্রসন্ন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অসহায়-ভাবে বলেন, কি হবে বৌমা।

মহামায়া মুখটিপে হেসে বললেন, সন্তান পৃথিবীতে আসার সময় হলে সকল মায়েবই শরীব খাবাপ হয়। তা ছাড়া বৌমার বাবা নিজে ডাক্তার, ভাবনার কি আছে।

ছোট ছেলেকে যেমন যে কোন যুক্তি দেখিয়ে ভোলান যায়—সত্যপ্রসন্নও এখন তেমনটি হয়েছেন।

খুশী মনে বললেন, তোমাব বুদ্ধি বেশ স্বচ্ছ বৌমা। তারপরে হাসতে হাসতে বললেন, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কথার শেষে বুড়োর চোখ থেকে এক ঝলক জল গড়িয়ে পড়ে।

সেদিকে তাকিয়ে মহামায়া ভাবেন, আর বেশী দিন রাখব না বৌমাকে। ভালয় ভালয় মা ছেলে দু'ভাগ হলেই নিয়ে আসব।

সুব্রত সত্যপ্রসন্নকে দেখতে রোজের মতই এল। সুব্রতর সাড়া পেয়ে মহামায়া এঘরে এলেন।

সত্যপ্রসন্নর নাড়িতে উত্তেজনাব প্রকাশ দেখে সুব্রত বলল, নাড়ির গতি এত চঞ্চল কেন ?

মহামায়া স্মিতহাস্যে বললেন, একটু আগে প্রভাতের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক—

আর বলতে হবে না। বলে, সুব্রত হাসল।

সত্যপ্রসন্ন লজ্জিত ভাবে বললেন, না। ওকে কি আর তর্ক বলে। সে যাক, তোমার বাবা এখন কেমন আছেন ?

তেমন সেরে উঠতে পারছেন না। একটু হাঁটলেই হাঁপ ধরে। দাদাকে কিছুদিনেব ছুটি নিয়ে আসতে লিখেছি।

এমন সময় সেখানে এসে প্রভাত উপস্থিত। সুব্রতকে দেখে বলল, কখন এলে ?

একটু আগে। তারপর তোমার খবব কি ? আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

মহামায়া জানেন, দুই বন্ধু একসঙ্গে হলেই তুমুল মতবিরোধ আরম্ভ হবে। তার উত্তাপ পাড়াপড়শীব ঘরও বাদ যাবে না। সত্যপ্রসন্নর স্বাস্থ্যের পক্ষে তা অনুকূল নয়। তাই তিনি খেতে দেওয়ার ছল করে অন্য ঘরে ডেকে আনেন।

চিঁড়ে ভাজা আর নারকেল নাড়ু খেতে খেতে প্রভাত বলল, উপদেশের ছলে আজ দাদু আমাকে বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়েছেন।

মহামায়া ওদের আরো কিছু ভাজা চিঁড়ে দিতে দিতে বললেন, আড়াল থেকে সবই আমার কানে গেছে, তিনি অযৌক্তিক কিছু বলেছেন বলে কিন্তু আমার মনে হয়নি প্রভাত।

সুব্রত একটা নাড়ুতে কামড় দিয়ে প্রভাতকে বলল, এখন কিছুদিন এখানে থাকবে তো ?

হ্যাঁ ভাই। এখন এখানে কত কাজ। শিগ্গিরই আসছেন দেশবন্ধু বরিশালে।

কবে ? ব্যগ্রকণ্ঠে বলল সুব্রত।

এখনও তারিখ ঠিক হয়নি। তবে সে তারিখ বেশী দূরে নয়।

একথা সেকথার পরে সুব্রত বলল, কাগজে একটা খবর দেখে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে রয়েছে। নেতাদের মতের সঙ্গে কিছুতেই আমাব মতের মিল হচ্ছে না দেখে, অনেক সময় নিজের উপবই সন্দেহ হয়।

প্রভাত মুচকি হেসে বলল, ব্যাপারটা গুরুতর বলে বোধ হচ্ছে ?

সুব্রত হেসে বলল, নিশ্চয়ই গুরুতর, অবশ্য আমার তো সেরকমই মনে হচ্ছে।

আরে ভনিতা না করে বলেই ফেল না। খবরটা হয়তো আমার চোখও এড়ায়নি।

তবে শোন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নতুন যে সংবিধান রচিত হলো, তাতে দেখান হয়েছে মুসলমান আর অমুসলমান দুটো শ্রেণী—সেখানে হিন্দু শব্দটি সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে। এটা আমার তেমন ভাল মনে হচ্ছে না প্রভাত। ভারতের মূল অধিবাসী হলো হিন্দু। তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য না দেওয়া আমি অযৌক্তিক মনে করি।

কিন্তু সুব্রত, নির্বাচনদ্বন্দ্বে হিন্দুরাও আনন্দের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করছেন।

তা করেছেন। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, যে নির্বাচনের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে নির্বাচনে যোগ দেওয়ার মানেই হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া। আমার মনে হচ্ছে প্রভাত, নেতাদের অনবধানতার সুযোগ নিয়ে চতুর ইংরাজের

চাতুর্যের নবতর এক পদক্ষেপ। দ্বিজাতি স্বীকৃতিই ভারতের প্রধানতম সর্বনাশের কারণ হবে।

তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের নীচে বসেই একদিন জাতীয়তাবাদী মুসলমান পুনরায় নিজ রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবে। বৃটিশের পক্ষে সব চেয়ে বড় শত্রুতা সাধন হবে মুসলমানকে আলাদা স্বীকৃতি দেওয়া। যদিও এক সময় মুসলমানরা বিদেশ থেকেই এসেছিল। কিন্তু সে ভারতকেই নিজের দেশ বলে গ্রহণ করে ভারতীয় হয়ে গেছে। এখন ভারতের শত্রু হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শত্রু। কিন্তু ওদের মধ্যে যে সুপ্ত বিদেশী সত্ত্বা, বছরের পর বছর নিদ্রিত ছিল, তাকে জাগ্রত করতে সহায় হলো ধূর্ত ইংরাজ। জাগ্রত মুসলমান দাবী করবে তাব অংশ এবং তাই নিয়েই শুরু হবে ভারতে গৃহযুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে হারাবে ভারত তার সুমহান অতীত ঐক্য। এটুকু বোঝা বুদ্ধিমান ইংবাজের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

প্রভাত বলল, বন্ধু, সবই তোমার অনুমান মাত্র। বৃটিশ মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ পবে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। এখন সন্দেহের কুয়াশায় যদি আমাদের মন আচ্ছন্ন হয়, তবে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসেও মরীচিকাব মত মিলিয়ে যাবে। নিজেদের দেশের শাসন নিজেদের হাতে এলে, তখন হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই মিলেমিশে একটা বোঝা-পড়া করে নেওয়া যাবে।

এমন সময় মধু এসে তাড়া না দিলে আরো যে কতক্ষণ বাদানুবাদ চলত বলা যায় না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, ওরে বাবা, একটা বাজে!

মহামায়া কি একটা জিনিস নিতে ঘরে এসেছেন। সুব্রতর কথা শুনে বললেন, ঘড়ির তো তোমাদের তর্ক শোনার জন্যে থেমে থাকলে চলবে না, তার সময়মত এগিয়ে যেতেই হবে।

প্রভাতের হাতে ঝাঁকি দিয়ে সুব্রত বলল, চলি ভাই।

প্রভাতও ওঠে স্নান-আহারের জন্য। প্রভাত খেতে বসলে, মহামায়া নিরামিষ হেঁসেল থেকে ডুমুরের ডালনা, মোচাঘণ্ট, পোস্তর বড়া এসব এনে দেন। ছেলে খেতে ভালবাসে মা'র হাতের এসব জিনিস। মহামায়ার অশেষ যত্ন তাই এগুলির পিছনে।

প্রভাত খেতে খেতে সুব্রতর কথাগুলি ভাবে। কিন্তু যুক্তিগুলি ঠিক মনে আশ্রয় পায় না। তবে অসার চিন্তা বলেও মনে হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর প্রয়োজন আছে। এ নিয়ে গত মিটিংএ আলোচনা উঠেছিল বৈকি।

মহামায়া ছেলেকে নীরব দেখে বললেন, হ্যাঁরে প্রভাত, তরকারী ভাল হয়নি খেতে?

প্রভাত তাকিয়ে বলল, খুব ভাল হয়েছে। আমাকে আর দুটো পোস্তর বড়া এনে দাও, মা।

মহামায়া ত্রস্তপায়ে গিয়ে কতকগুলি বড়া এনে ছেলের পাতে দেন। তৃপ্তি এবং আনন্দে মন উচ্ছল।

প্রভাত বড়ার পরিমাণ দেখে একটু হেসে বলল, এই জন্যে কোন জিনিস ভাল বলতে সাহস হয় না।

আহা, খা না। ঐ দুটো বড়া কি আর লোকের বেশী হয়!

মহামায়া ছেলেকে মনের অতি নিকটে পেয়ে বললেন, বৌমার শরীরটা নাকি ভাল যাচ্ছে না। তোকে ও কিছু লিখেছে নাকি?

না। আর যেন কিছু কথা নেই। প্রভাতের খাওয়া শেষ হলে প্রভাত জল খেয়ে গ্লাসটা শব্দ করে রেখে বলল, জান মা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শিগগিরই বরিশাল আসছেন। আমার ইচ্ছে তাঁকে একদিন আমাদের বাড়ী নিয়ে আসি।

মহামায়া আনন্দ-প্রদীপ্তস্বরে বললেন, বেশ তো নিয়ে আসবি। এত বড় একজন মহামানবের পায়ের ধুলো যদি আমাদের বাড়ী পড়ে, সে তো আমাদের পরম ভাগ্য।

বিমর্ষমুখে প্রভাত বলল, কিন্তু দাদুর কথা ভেবে সাহস পাচ্ছি না। কি বলতে কি বলবেন, এত বড় একজন মানী লোক।

প্রভাত চলে গেলেও মহামায়া স্তব্ধ হয়ে সেখানে বসে রইলেন। স্বামীব মুখেও এ অভিযোগ তিনি শুনেছেন।

রাজনীতির জটিল পথে সত্যপ্রসন্ন পুত্র, পৌত্র কারুব সঙ্গেই একসাথে চলতে পারেননি। তিনি বৃটিশ শাসনের অনেকগুলি গুণকেই বড় করে দেখেছেন। মুসলমান রাজত্বেব বিভীষিকা তাঁর মনে এখনও আতঙ্ক সৃষ্টি কবে। হিন্দুদের অনেক কুসংস্কার যে বৃটিশ শিক্ষা এবং শাসনে বিদূরিত হয়েছে তা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি কবেন। সতীদাহর করুণ আর্তনাদ এখনও তাঁর কর্ণে ধ্বনিত হয়। পুরুষের বহুবিবাহের ইচ্ছা ইংরাজি শিক্ষায় অনেক কমেছে। তাতে প্রেম হয়েছে একনিষ্ঠ। আইনের সুযোগ পাচ্ছে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। চোর ডাকাত তস্করের হাত থেকে দেশের লোকের ধন মান প্রাণ নিরাপদ হয়েছে। আবো অনেক কিছুই পেয়েছে।

প্রভাতের মত কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে তিনি নারাজ।

সাত দিন পরে খবর এল, দীপ্তিব একটি মেয়ে হয়েছে। দীর্ঘ দিনের পরে এই নূতন জীবনকে স্বাগত জানাল এ-বাড়ীর সকলে পরম আনন্দে।

শুভ সংবাদ বহন করে টেলিগ্রাম এলে মহামায়া সাতবার শঙ্খধ্বনি করলেন। উমাকে ডেকে সন্দেশ আনতে পাঠালেন।

সত্যপ্রসন্ন আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন খোলা টেলিগ্রামখানার দিকে। কম করে দশবার পড়া হয়েছে, তবু ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

সত্যপ্রসন্ন ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, বৌমা সন্দেশ এখনও এল না!

হ্যাঁ বাবা, এখুনি এল।

কখন খবর এসেছে, এতক্ষণে সন্দেশ এল। জানি উমার হাত যখন পড়েছে—দেরী হবেই।

উমা এ কথার পরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, মহামায়া চোখ টিপে নিষেধ করলেন।

শহরের আত্মীয় বন্ধু সকলের বাড়ীতেই মহামায়া উমার হাত দিয়ে সন্দেশ পাঠালেন। একটি শিশুর জন্ম এনে দিল এই উদ্বেগ-ব্যাকুল পরিবাবে অনাবিল সুখানুভূতি।

সত্যপ্রসন্ন আনন্দের উত্তেজনায় রাগের ক্লান্তি ভুলে গেলেন। মহামায়াকে বললেন, বৌমা, আত্মীয় বন্ধু সকলের বাড়ী মিষ্টি পাঠান হয়েছে তো? দেখো, যেন কেউ না বাদ পড়ে।

মহামায়া মৃদু হেসে বললেন, কেউ বাদ পড়েনি, বাবা।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে সত্যপ্রসন্ন বললেন, প্রভাতের কন্যাসন্তান হওয়াতেই আমার আনন্দ আরো বেশী হয়েছে।

আশাহত সত্যপ্রসন্নব আশা বার বারই পুত্রসন্তানের কাছ হতে ব্যর্থতার অভিশাপ এনে দিয়েছে।

এ খবর শুনেই বীণা ছুটে আসে আনন্দ জানাতে।

মামী, বৌদিব মেয়ে হয়েছে শুনে আমার ভারী আহ্লাদ হয়েছে। নিশ্চয় বৌদির মত সুন্দর হয়েছে। কিছু লেখেনি?

না রে পাগলী মেয়ে, তাবে কি আর অত কথা লেখে কেউ।

বীণা চলে যেতে মহামায়া ভাবেন, আহা, মেয়েটা যেন আর আগের মত হাসি-খুশী নেই।

বীণার কণ্ঠে হাসির ঝরণার উৎস যেন ক্ষীণপ্রায়। কথায় কথায় আর উপছে পড়ে না প্রাণের ঐশ্বর্য।

দীপ্তি যাওয়ার পর থেকেই কর্তার পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে উমার হাতে।

রাত্রিতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উমা মন্তব্য করল,

যাই বলেন কর্তা, বৌদিমণির একটি ব্যাটাছেলে হলেই সব দিক দিয়ে ভাল হতো। মেয়ে তো পরের জন্যে।

সরোষে কর্তা বললেন, তুই চুপ কর উমা। সব কথায় নাক গলান ভাল নয়।

নাক কানের কথা হচ্ছে না। মেয়ে আর ছেলে কি এক হলো, আপনিই বলুন, কর্তা ?

স্বনিঃশ্বাসে সত্যপ্রসন্ন বললেন, সে তুই কি বুঝবি ব্যাটা, তা বুঝেছে সত্যপ্রসন্ন।

উমা তার কর্তব্য সমাপনান্তে যেতে যেতে বলল, মেয়ে আর ছেলে কখনও এক হয় না। মৃত্যুর পরেও জল-পিণ্ডি দিতে সেই ছেলে, আর জীবনকালে অন্ন-জল দিতেও সেই ছেলে। শাস্তর কি মিথ্যে 'বলে—মেয়ের নাম ফেলি, যমে নিলেও গেলি, পরে নিলেও গেলি।

সর্বরক্ষে, বৃদ্ধের কানে এসব কথা প্রবেশ করেনি।

সত্যপ্রসন্ন একা ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন আগামী দিনের।

দীপ্তি কন্যা সাথে করে এনেছে, সত্যপ্রসন্নর গৃহের জন্য—শান্তি সুখ আনন্দ। এই কল্যাণী কন্যাটিকে ঘিরে কত স্বপ্নই গড়ে উঠছে।

এদিকে নাগরিক জীবনে তখন বন্দেমাতরম্ আল্লা-হো-আকবর, পুলিশের ভারী বুটের শব্দ, আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চরকার ঘড়ঘড় শব্দ। এই শব্দে বরিশালের লোকেরা তখন খুবই অভ্যস্ত ছিল। তবে মাঝে মাঝে যখন পুলিশের জুলুম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন অসন্তোষ জমে উঠত সকলের বুকে পর্বত-প্রমাণ।

আর প্রভাত আরো ছড়িয়ে দিত নিজেকে দেশের সেবায়।

প্রভাতের এখন অধিকাংশ সময় কাটে গুপ্তসমিতির সভ্যবৃন্দের সঙ্গে গুপ্ত-মন্ত্রণায়। স্বামী মুক্তানন্দের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ প্রভাত। বিশ্বাসে, কর্মদক্ষতায়, ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র সে।

বোমা প্রস্তুতের গোপন পরামর্শ চলে গভীর রাত্রে নদীর ওপারে ছোট একখানা কুঁড়েঘরে স্তিমিত আলোতে।

স্বামীজী চাপা অথচ গম্ভীর স্বরে সভ্যদের বললেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বোমা, অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ যে কত বড় বিপদের কাজ, এখানে যে সকল সভ্য তোমরা উপস্থিত আছ—সকলেই নিশ্চয় তা অবহিত আছ?

নীরব সমর্থন সকলের চোখে।

স্বামীজী তারপরে নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে সকল সভ্যের ললাটে রক্ততিলক পরিয়ে দিয়ে ভাবগম্ভীর স্বরে বললেন, এই রক্ততিলক তোমাদের বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথের শুভসঙ্কেত হোক।

একে একে সকলেই স্বামীজীর পদস্পর্শ করে মৌন প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হলো।

স্বামীজী ইশারায় প্রভাতকে কাছে আসতে বললেন।

প্রভাত কাছে এলে তিনি বললেন, প্রভাত, শীঘ্রই তোমাকে একটি কঠিন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবো। তুমি তার জন্য প্রস্তুত থেকো।

প্রভাত সম্মতি জানিয়ে পুনরায় স্বামীজীকে প্রণাম করে নিজের জায়গায় এসে বসল।

সকল সভ্যকে সম্বোধন করে স্বামীজী বললেন, শীঘ্রই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এখানে আসছেন। তাঁর সম্মানার্থে তাঁর স্বরাজ্য ফাণ্ডে আমাদের সমিতির তরফ থেকে কিছু টাকা দিতে চাই; আশা করি তোমরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত?

হ্যাঁ, স্বামীজী।

স্মিতহাস্যে মুখ অতিশয় উজ্জ্বল দেখায় স্বামীজীর।

তারপরে তিনি বললেন, তোমাদের সকলের কাছ থেকেই আমি অর্থসাহায্য পাব; এই প্রত্যাশা নিয়েই আজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি।

প্রভাত, তোমার কাছে আমি একটা মোটা অঙ্ক আশা করছি।

প্রভাত মৃদু সতেজ গলায় বলল, আমি যথাশক্তি চেষ্টা কবব।

এবার স্বামীজী মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রভাতের পবেই তোমার স্থান, আশা করি তা মনে আছে?

চেষ্টার ক্রটি হবে না, দৃঢ়স্ববে বলল মুকুন্দ।

বলার পরেই মুকুন্দব মনে হলো, কিন্তু টাকা পাব কোথায়! নিজের বলতে বিশেষ কিছুই নেই। স্ত্রীব গায়ের গহনা দু'খানার উপব হাত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মেয়েদেব গহনা চাইলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ দেয়, এ আমার মনে হয় না। আমার স্ত্রী তো নিশ্চয়ই নয়। কাজেই বাকী রইল কৌশলের আশ্রয় নেওয়া। দেখা যাক।

মুকুন্দব মুখের ভাব লক্ষ কবে স্বামীজী বললেন, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমরা অর্থসংগ্রহ কবছি না, এ দেশের প্রয়োজনে। কাজেই দ্বন্দ্বের কোন স্থান নেই এখানে। মহৎ কাজের জন্য এই যে আমাদের ত্যাগ, ভাবছ কি তা বৃথাই যাবে! দেশ-মাতৃকার কণ্ঠমাল্যে তা পুষ্প হয়ে শোভা পাবে। এ লড়াই আমাদের মানুষের দাবীর লড়াই। প্রত্যেক মানুষেরই শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বাঁচবার জন্য চাই স্বাধীনতা। যে তা হরণ করে, তার জন্যে ক্ষমা নেই মানুষের বিধানে।

আমাদের এই ধর্মযুদ্ধের সারথি স্বয়ং ভগবান। অত্যাচারীর অত্যাচার তাঁকে বাধ্য করেছে সারথ্য গ্রহণে। কাজেই এ সংগ্রামে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

সেদিনের মত সভার কাজ শেষ হয়ে গেল।

অমাবস্যার গভীর রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে গুপ্ত সমিতির সভ্যরা ঘুর পথে সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হলো। পুলিশ সর্বদাই হুঁশিয়ার ওদের জন্যে, তাই রাজপথ ওদের পথ নয়। দুর্গম বন্ধুর পথই ওদের নিরাপদ রাস্তা।

যত নীরবেই প্রভাত বাড়ী ফিরুক, মহামায়ার মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আবেদন তা শুনতে পায়। নিঃশব্দে দরজা খুলে দেন ছেলেকে। ইঙ্গিতে মেঝেতে ভাতের থালা দেখিয়ে দেন। ইদানীং সত্যপ্রসন্নব ঘুম মোটেই হয় না, সামান্য শব্দও কর্ণগোচর হয়।

অসহায় রুগ্ন বৃদ্ধ শ্বশুরকে শেষ জীবনে একটু নিশ্চিন্ত শান্তি দেওয়ার জন্য মহামায়া সর্বদাই সচেষ্ট। তাই ছেলের এত রাত্রিতে গোপন আসা-যাওয়া নিঃশব্দে গ্রহণ করেন। প্রভাত খেতে বসলে নীরবে কাছে বসে থাকেন। তারপরে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বিনিদ্র কাটিয়ে দেন।

মহামায়া বোঝেন, সাবালক ছেলের নিজের মতামতের উপর কথা বলা নিরর্থক। কিছুদিন থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, প্রভাতের কর্মপন্থা সরল সহজ নয়। তথাপি তার আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় মতকে তিনি উপেক্ষার চোখে দেখেন না। তবু সন্তানের বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত তাঁর বক্ষ। অবাধ্য চোখ মানে না শাসন, ভরে যায় জলে। আজ স্বামীকে বড় বেশী তাঁর মনে পড়ে। এত উদ্বেগ তিনি একা আর বহন করতে পারছেন না।

একটি সঙ্গীতের সুর ভেসে এল, প্রভাত-কীর্তন গেয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন, "জয় জগবন্ধু বোল হরি বোল, হরি বোল"। মহামায়া তাকিয়ে দেখেন পুবের আকাশ লাল হয়েছে উষার আগমন-সম্ভাবনায়। উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে।

স্নানের পরে পুজোয় বসেন। আজ তিনি দেবতার চরণে বার বারই সন্তানের কুশল কামনা করেন। কিছুতেই মনকে আজ সমর্পণ করতে পারছেন না শ্রীগুরু-চরণে। অসহায় ভাবে তাকিয়ে

থাকেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মুখের পানে। ব্যাকুল চোখে করুণ ভাবে।

পূজা-শেষে শ্বশুরের খোঁজ নিয়ে যান প্রভাতের ঘরে। মনে হলো প্রভাতের ঘুম ভেঙ্গেছে অনেক আগেই।

মহামায়া প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠলেন। বললেন, তোকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বে?

এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে প্রভাত বলল, মা, তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ কথা আছে। কখন তোমার সময় হবে?

সন্দিগ্ধ চোখে মহামায়া তাকান ছেলের দিকে। পড়তে চেষ্টা করেন—কি সে বিশেষ কথা। না, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

বললেন, যদি বিশেষ কোন আলোচনার বিষয় হয়, তবে সেই দুপুরে। তোর দাদুর খাওয়াব আগে নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু শোনার সময় কোথায় আমার।

আচ্ছা, তবে দুপুরেই বলবো।

হ্যাঁরে, কি এমন কথা যে, শুনতে বিশেষ একটা সময় লাগবে?

প্রভাত হেসে বলল, আমার কাছে কথাটা বিশেষ কিছুই নয় —তবে তুমি কি ভাবে নেবে সেইটাই ভাববার বিষয়।

মহামায়া বিষয়টাকে সহজ করার উদ্দেশ্যে হেসে বললেন, তোর কাছে যখন বিশেষ কিছু নয়, তখন আমার কাছেই বা বিশেষ অর্থ নিয়ে দেখা দেবে কেন? তুই এত ভাবিস! ও ঘবে চল খাবার দিচ্ছি।

প্রভাতের মুখে একটু নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটিয়ে তুলতে মহামায়ার কতই না প্রয়াস।

গৃহকর্মের মাঝে মাঝেই কেবল মনে পড়তে লাগল মহামায়ার, কি এমন কথা বলবে প্রভাত?

সত্যপ্রসন্ন এখন আর মোটেই হাঁটাচলা করতে পারেন না। প্রভাত যে কিছুদিন যাবত বরিশাল এবং নিজের বাড়ীতে আছে, এটাই তাঁর কাছে পরম আনন্দের। প্রভাতের মুখে দাদু ডাকটি

শোনার জন্য বৃদ্ধের সকল ইন্দ্রিয় যেন উন্মুখ প্রতীক্ষা করে থাকে। প্রভাতের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বৃদ্ধের বার্ধক্য যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন নবীন আগন্তুকের চিন্তার চাহিদা মেটাতে। কিন্তু হায়! যে পাতা বিবর্ণ হয়ে গেছে—সে নব কিশলয়ের চিক্কণতা পাবে কোথায়! তাই তার কি ছিল, আজ নেই, তাই বোঝাবার মিথ্যে প্রয়াস।

বেলা দশটার সময় মহামায়া শ্বশুরকে মাথা ধুইয়ে গা-মুছিয়ে ছোট টেবিলটির সামনে বসিয়ে ভাত আনতে যান। ভাতের থালা টেবিলে রেখে, ছোটছেলে-ভোলান সুরে বললেন, আজ বাবা একটা নতুন জিনিস রেঁধেছি—আগে বলুন, সব ক'টি ভাত খাবেন, তবে দেব।

সকৌতুকে সত্যপ্রসন্ন বললেন, আগে তোমার নতুন খাদ্যটির নাম বল—তবে কথা দিতে পারি।

এ বছরের নতুন কচি আমের টক ঢাকা খুলে শ্বশুরের সামনে ধরেন।

কেমন, এবারে রাজী তো?

শিশুর মত লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ সত্যপ্রসন্ন। মন তাঁর বৌমার প্রস্তাবে সায় দেয়।

বেলা একটা বেজে যায়, প্রভাতের দেখা নেই। চিন্তিত মহামায়া রাস্তার কাছের জানালাটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রায় দেড়টার সময়, গেটটা খ্যাঁচ করে খুলে ভেতরে ঢুকল প্রভাত।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মহামায়া বললেন, নাওয়া খাওয়ার কথাও ভুলে যাস। যা—তাড়াতাড়ি চান করে আয়।

প্রভাতের খাওয়া দেখে মহামায়ার আজ ভারী অস্বস্তি হলো, বললেন, এমন তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছিস কেন? দুপুরে কিন্তু কোথাও বেরোতে পারবি না।

এ-কথায় প্রভাতের মনে পড়ে, দুপুরে মার কাছে সেই কথাটা বলতে হবে।

একটু হেসে প্রভাত বলল, ভাগ্যিস তুমি মনে করে দিলে; হ্যাঁ, তোমার কাছে সে কথাটা বলতে হবে।

এ-কথা শুনে মহামায়া আশ্বস্ত হন। ভাবেন, তবে তেমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়।

খেয়ে উঠে যাওয়ার সময় প্রভাত বলল, মা, তোমার খাওয়া হলেই আমার ঘরে এসো।

খাওয়া হতে মহামায়ার দশ মিনিটের বেশী লাগল না। একটু মশলা মুখে ফেলে ছেলের ঘরে গেলেন।

প্রভাত মাকে হাত ধরে তার কাছে বসাল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, মা তোমাব কাছে আজ একটা জিনিস চাইব—দেবে বল?

মহামায়া প্রভাতের এমনি ছেলেমানুষি আবদার অনেক কাল শোনেননি। তাই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে।

ঘোরটা একটু কাটলে বললেন, একটি কেন বাবা, আমার যথা-সর্বস্বই তো তোর জন্যে।

মার আরো একটু কোলের কাছে সরে এসে বলল প্রভাত, তোমার গহনাগুলি তো প্রায় বিশ বছর সিন্দুকে বন্দী হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে দাও মা, দেশকে তুমি—মানে দেশের সেবায় তা লেগে সার্থক হোক।

নির্বাক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মহামায়া। মনে ঝড় বয়ে যায়। কি করে বোঝাবেন তিনি প্রভাতকে, দেশের সেবায় তিনি কি দিয়েছেন! আজ দু'খানা অলঙ্কারের জন্যে প্রভাতের এত অনুনয়! কিন্তু আজ তো আমি কেবলমাত্র প্রভাতের মা নই—তার কন্যার পিতামহী। প্রভাত তার সম্বন্ধে যখন উদাসীন, তখন আমার কর্তব্য তাকে সর্ব অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা। প্রভাতের যখন কিছু আয় নেই, কোনোদিন করার ইচ্ছাও নেই, তখন ঐ

গহনা ক'খানা ঐ মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুলতে অনেক সাহায্য করবে। যে শিশু জন্মগ্রহণ করে পাবে না পিতার আর্থিক কোনো সুযোগ, তাকে আমিও যদি বঞ্চিত করি—তবে কি বিধাতা তা সহ্য করবেন। শ্বশুরের সামান্য সম্পত্তির আয়ে তিন চারটি প্রাণীর খাওয়া-পরার সংস্থান হওয়া খুবই মুস্কিল। যেটুকু আয় এখন আছে, শ্বশুরের অবর্তমানে তা থাকবে না। সত্য যতই কঠিন এবং অপ্রিয় হোক তা প্রকাশ করাই শ্রেয়।

আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, সে হয় না প্রভাত।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না প্রভাত। এ কি আমাকে বিশ্বাস কবতে হবে যে, ঐ বাক্সবন্দী গহনার উপর মার এখনও লোভ আছে! না, দেশের কাজে ব্যয়িত হওয়াটাকে তিনি গহনার সার্থক পরিণতি মনে করেন না! আমি যে অনেক নারীর চেয়েই মাকে উদারচেতা মনে করতাম। তাঁর মধ্যেও কি চিরন্তন অলঙ্কারপ্রিয় নারী বাস করে! না না, আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এতদিন যা জেনেছি সব ভুল—সব ভুল।

কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।

মহামায়াকে আর কিছু না বলে, ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল প্রভাত।

মহামায়া স্তব্ধ হয়ে সেখানে বসে রইলেন। আজ যে তিনি কত বড় সম্পদ হারালেন কয়েকখানা গহনার বিনিময়ে, তা তাঁর মত আর কে জানে। কিন্তু তাঁর এই ত্যাগের মূল্য কি প্রভাতের মেয়েটি কোনদিন বুঝবে? যে শিশুটিকে সে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি, তার স্নেহের আকর্ষণ এত দুর্বার! অবলীলায় সন্তানের দাবী প্রত্যাখ্যাত হলো। কেবল কি তাই, প্রভাতের চোখে তিনি অতি সাধারণ এক অলঙ্কারপ্রিয় নারীর পর্যায়ে নেবে গেলেন। এত বড় লোকসান কি দিয়ে পূরণ করবেন তিনি।

বীণা এসে মহামায়াকে ঐরূপ বসে থাকতে দেখে বলল, মামী, সব খবর ভাল তো? তুমি অমন চুপ করে বসে কেন?

বীণার প্রশ্নে মহামায়া বাস্তব জগতে ফিরে আসেন। বললেন, বোস বীণা। বিশেষ কিছু নয়, প্রভাতের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হলো এই আর কি। যাক তোদের কথা বল। অমির খবর-টবর পাচ্ছিস তো ?

দু-চার দিনের মধ্যে পাইনি। তবে আগের চিঠিতে লিখেছিল, শরীর নাকি ভাল যাচ্ছে না।

ভাল আর কি করে থাকবে বল। ভদ্দরলোকে কখনও জেলের কষ্ট সইতে পারে।

নিঃশ্বাস ফেলে উদাস স্বরে বীণা বলল, কিন্তু দেশের ছেলেরা তা বুঝতে পারছে কোথায়। শুনেছ বোধ হয়, কাল আনন্দমামার ছেলে দীপুকে গ্রেপ্তার করেছে। কোন কারণ নেই শুধুই সন্দেহ। গেল তো ছেলেটার পড়াশুনো শেষ হয়ে। নিবারণ দারোগাই নাকি সব ছেলে-ছোকরার পেছনে লেগেছে। এই করে একটা প্রমোশন শিগগির বাগিয়েছে।

একটু হেসে বীণা বলল, তোমাদের জামাই নিবারণ দারোগাকে দেখলে শত হস্ত দূরে থাকে।

থাকাই ভাল বীণা। তোদের জীবনে যেন কোন দুষ্টগ্রহ ছায়া না ফেলে।

বীণা মহামায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, মামী, তোমাব আশীর্বাদই আমাকে সর্ব-অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবে।

মহামায়া ভাবেন, সত্যিই কি আশীর্বাদের এত শক্তি !

বীণা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, না মামী বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, বৌদিকে কবে আনবে ?

তারপরই বীণা হেসে বলল, জান মামী, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। তোমার এখানে যখন আসছিলাম তখন দত্তদের পাগলা ঘোড়াটার পায়ের তলায় আর একটু হলে পড়েছিলাম আর কি!

ভীতকণ্ঠে মহামায়া বললেন, বলিস কি! সত্যিই কিছু লাগেনি তো?

খিল খিল করে হেসে উঠল বীণা, মামীর যেমন কথা। লাগলে কি আর তোমার এখানে আসতাম, একেবারে হাসপাতালে।

বিরক্তস্বরে বললেন মহামায়া, ওটাকে বেঁধে রাখে না কেন? ছুটবে যেন কালবোশেখীর ঝড়। তবে হ্যাঁ, দেখতে বেশ। গায়ে মাছি বসলে পিছলে পড়বে। শুনেছি ওর পেছনে দত্তরা অনেক খরচা করেন।

এমন সময় সুখদা ঝি তাব বিশাল দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাত মুখ নেড়ে বলল, তুমি তো এখানে বসে গল্প করছ দিদিমণি, ওদিকে তোমার এক খুড়শ্বশুর বাক্স-পেঁটরা নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন।

বীণা বিস্ময়ে চোখ গোল করে বলল, সে আবার কি! আমার খুড়শ্বশুর, না, মনে তো পড়ে না কোন কালে নামও শুনেছি। যা দিন পড়েছে, কে না কে তার কাছে ঘর-দোর খোলা ফেলে চলে এলি।

বিনা বাক্যে এত বড় অপবাদ সুখদা মেনে নেবে, সে রকম মেয়ে সে নয়। প্রকাণ্ড গোলাকাব মুখে ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে সে বলল, বেশী বোক না তো। সে-দিনকার খুকী এসেছে সুখীকে বুদ্ধিব খোঁটা দিতে। এমন মেয়ে আমাকে পাওনি। আমি তো প্রায় হাঁকিয়ে দিয়েছিলুম, খুড়শ্বশুর হওয়ার আর জায়গা পাওনি! বেরোও বলছি।

সুখী ঝি ঝিঙ্গে বিচির মত কালো দাঁত বের করে হেসে বলল, মিনসে তো বোঁচকা-বোঁচকি নিয়ে পালাতে পথ পায় না। এমন সময় জামাইদাদা বেরিয়ে বললেন, কখন এলেন সোনা খুড়ো?

আমি লজ্জায় জিব কেটে এক-পা দু-পা করে সরে পড়লুম। তার পরে ডেকে জামাইদাদাই বললেন, সুখদা, তোমাদের দিদিমণিকে ডেকে আন তো।

সেই যে বেরিয়ে গেছে, রাত বারোটা বেজে গেল এখনও প্রভাতের দেখা নেই। মহামায়া বিষণ্ণ মনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবেন, ছেলে আমার উপর অভিমান করেই বাড়ী আসছে না।

মশ্ মশ্ করে পাহারাওয়ালার বুটের শব্দ রাস্তায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল মহামায়ার দৃষ্টি যতদূর চলে তাকিয়ে দেখছেন। কোথাও একটু শব্দ হলে, প্রত্যাশায় বুক দুলে ওঠে।

গভীর রাত্রি। মহামায়া আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সময় প্রভাত বাড়ী এল। মহামায়া ছেলের খাওয়ার পরে নিঃশব্দে শুতে যান।

প্রভাতের চোখে ঘুম নেই আজ। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মত দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন মন। টাকা সংগ্রহের কোন সম্মানজনক উপায়ই মনে পড়ে না। অথচ মোটা রকমের একটা টাকার অঙ্ক মুক্তানন্দ ওর কাছে প্রত্যাশা করছেন, না দিতে পারলে নিজে দুঃখ পাবে, স্বামীজী এবং অন্যান্যদের কাছে ছোট হয়ে যাবে। এত দিনের তপস্যা নীরব উপেক্ষায় লাঞ্ছিত হবে।

হঠাৎ পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে কে যেন চকমকি জ্বেলে আলো দেখাল। সেই আলোতে দীপ্তির গহনার বাক্সটা দেখা গেল। কূলহারা নাবিকের কাছে কূলের ইশারা। আনন্দের অতিশয্যে উঠে বসল। এতক্ষণ এই সহজ কথাটা মনে হয়নি বলে নিজের উপর রাগ হলো।

আচ্ছা, দীপ্তি শুনলে কি রাগ করবে? কি জানি, স্ত্রী-চরিত্র বোঝা আমার কর্ম নয়। আমার মতে দেশের সেবায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এগিয়ে আসবে, দরকার হলে সব কিছু দিয়ে দেশকে সাহায্য করবে।

প্রভাতের বুকের উপর থেকে চিন্তার পাথরখানা সরে গেল। নিটোল একটি সুখনিদ্রায় রাত্রি শেষ হয়ে গেল।

সকাল বেলায় প্রভাতকে দেখে সত্যপ্রসন্নর মুখ নির্মল হাসিতে

উদ্ভাসিত। দাত্নুর মাথার কাছে বসে প্রভাত কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, দাত্নু লোহার সিন্দুকের চাবিটা একটু দাও। দীপ্তির গহনার বাক্সে একটা দরকারী কাগজ আছে, সেটা বের করবো।

শীর্ণ ডান হাতখানা বালিশের নীচে ঢুকিয়ে সত্যপ্রসন্ন চাবির গোছা বের করে নাতির হাতে দিলেন।

সিন্দুক খুলে প্রভাত ছোট একটা চামড়ার স্যুটকেস বের করে, তালা বন্ধ করে চাবির গোছা দাত্নুর হাতে দিয়ে ত্রস্তপায়ে নিজের শোয়ার ঘরে চলে গেল।

এমন সময় মহামায়া রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সেকথা প্রভাত জানে, তবু সাবধান হওয়াই ভাল। ঘরের দরজা জানালা একটি একটি করে সব বন্ধ করল।

হাত-পা এত কাঁপছে কেন? বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ, নিজের কানেই বিশ্রী লাগল প্রভাতের। বিকৃত হাসি হেসে সে স্বগতোক্তি করে, নিজেদের জিনিস নিচ্ছি, চুরি করছি না। কিন্তু চাবিটা কিছুতেই যথাস্থানে লাগাতে পারছে না। ভয়ানক হাত কাঁপছে। মনে হয় দীপ্তি পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

প্রভাত চকিত দৃষ্টিতে তাকায়। না, কেউ নেই। তবে কি মানসিক দুর্বলতার অভিব্যক্তি! ছিঃ, এত দুর্বল আমি! মনের দৃঢ়তার সঙ্গে হাতের লক্ষ্য ঠিক হয়ে যায়।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রভাত গহনাগুলির দিকে। মনে পড়ে, বিবাহরাত্রির সালঙ্কারা দীপ্তিকে। প্রতিটি গহনা যথাস্থানে কি শোভনতায়ই না শোভা পাচ্ছিল। সেই জ্যোৎস্না রাত্রে দীপ্তির প্রাণমাতানো হাসি আর গহনার ঔজ্জ্বল্য মিশে রাত্রিটিকে মোহময় করে তুলেছিল।

গহনাগুলির গায়ে অসীম মমতায় হাত দেয় প্রভাত। মনে হয় দীপ্তির অঙ্গের তাপ সেগুলির গায়ে এখনও লেগে আছে। মনে অপূর্ব পুলক সঞ্চার হয়।

নিজের ভাবপ্রবণতায় লজ্জিত হয় প্রভাত। ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকখানি গহনা তুলে নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলল। তারপরে সুটকেসটি বন্ধ করে সিন্দুকে রেখে এল।

মহামায়া এ-সবের বিন্দু-বিসর্গ টের পেলেন না। কাল থেকে তিনি নিজের কথাই ভাবছেন। প্রভাতকে দুঃখ দিয়ে তিনি শতগুণ বেশী দুঃখ পেয়েছেন। তবুও যা বলেছেন তার চেয়ে অন্য কিছু বললে অন্যায় হতো—এই আত্মপ্রত্যয়ে তিনি অবিচল আছেন। তবু প্রভাতের সঙ্গে আগের মত অসঙ্কোচে কথা বলতে পারেন না।

আর প্রভাত দীপ্তির গহনা না বলে নেওয়ার অপরাধের গ্লানিতে সহজ সরল গতি হারিয়ে ফেলেছে। মহামায়ার মুখের দিকে তাকাতে তার ভয় হয়। ফলে মা আর ছেলের মধ্যে যেন ভুল বোঝার প্রাচীর উঠল। মহামায়ার নিরানন্দ দিনগুলি যেন কাটতে আর চায় না।

এদিকে দেশবন্ধু দু-এক দিনের মধ্যেই বরিশাল আসছেন, প্রভাত সে সব ব্যাপাব নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত। স্নান-আহারের পর্যন্ত সময়ের অভাব।

কে কে বক্তৃতা দেবেন, সভামঞ্চ কোথায় হবে, কোথায় এসে তিনি উঠবেন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রভাত কেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই উদ্বিগ্ন। এত বড় মহামানবের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া চাই তো।

মুক্তানন্দের হাতে যেদিন সমর্পণ করা হলো দীপ্তিব গহনাগুলি, সেদিন স্বামীজী বিস্মিত হয়েছিলেন—এর মূল্য নির্ণয় করে। তিনি বলেছিলেন—ছেলেরা, প্রভাতের ত্যাগের মহান আদর্শ তোমাদের সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা যে মহান কর্মে অগ্রবর্তী হয়েছি, তাতে প্রচুর অর্থের এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন। ন্যায় নীতি এগুলি যেন আমাদের লক্ষ্যে পৌছনোর বাধা সৃষ্টি না করে।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের একাগ্রতা নিয়ে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

দেশবন্ধুব আগমন উপলক্ষে বিরাট আয়োজন হলো। দলে দলে ছেলেরা হলো স্বেচ্ছাসেবক। দেশাত্মবোধক গানে মুখর হলো আকাশ বাতাস।

এলেন চিত্তরঞ্জন বরিশালে, সাথে এলেন সাধ্বী স্ত্রী বাসন্তী দেবী।

চিত্তরঞ্জনের সৌম্য শান্ত মূর্তি, পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, কাঁধে খদ্দরের চাদর। ত্যাগের প্রতিমূর্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রথম দর্শনেই তিনি জয় করলেন বরিশালেব সকলের হৃদয়। মেতে উঠল বরিশাল, এই ত্যাগীকে কি দিয়ে তাঁর ত্যাগের সম্মান প্রদর্শন করা যায়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাঁব কিছুই নেই, কিন্তু মুক্তি-সংগ্রামের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য অনুরোধ জানালেন তিনি সকলকে।—টাকা, গহনা যা খুশী মুক্তহস্তে দান করুন দেশের জন্যে।

মহৎ মানুষ যখন সাধারণ মানুষের মত সাধারণ মানুষের কাছে এসে নেমে দাঁড়িয়ে মহৎ কাজের জন্য কিছু হাত পেতে চান, তখন যে মানুষের মনে বিচিত্র ভাবের উন্মেষ হয় তা লিখে বোঝান যায় না। তখন ঐ মানুষটির হাতে তুলে না দিতে পারে এমন বস্তু বোধ হয় সংসারে কিছু নেই।

যে যেমন পারলেন সকলেই কিছু এনে দিলেন দেশবন্ধুর হাতে।

একদিন শহর-পরিক্রমায় বের হলেন দেশবন্ধু। খোলা ফিটন গাড়ীতে চলেছেন তিনি, পাশে বরেণ্য নেতারা। গাড়ীর পাশে হেঁটে চলেছে প্রভাত, সুব্রত এবং শহরের আরো অনেক যুবক। উৎসাহে উদ্দীপ্ত তাদের মুখ। উত্তাল জনসমুদ্র অধীর আগ্রহে এগিয়ে চলেছে। বন্দে মাতরম্—আল্লা-হো-আকবর ধ্বনির অনুরণন আকাশে বাতাসে। এই আনন্দযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন শহরের বারবনিতারাও। তারা কিছু দিতে চায় এই মহানায়কের হাত দিয়ে দেশের সেবায়।

লোকের চাপে গাড়ী এগোতে পারছে না। মন্থর গতিতে চলেছে গাড়ী। এমন সময় প্রভাত দেখতে পেল, দেশবন্ধুর পায়ের তলায় একটি মেয়ে প্রণামের ভঙ্গীতে নত হয়ে রয়েছে। মেয়েটির মুখের দু'পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক রাশ চুল। মুখে কমনীয় স্বর্গীয় সুষমা।

প্রভাত চমকে উঠল—এ তো সেই কমললতা! সমস্ত অলঙ্কার পুঁটলি বেঁধে এনে দিয়েছে দেশবন্ধুর পদপ্রান্তে। দানের আনন্দে মুখ আরক্ত।

ছায়াছবির মতই সরে গেল এ দৃশ্য। কিন্তু প্রভাতের মনে ঘটনাটি ছাপ রেখে গেল। যে মেয়েকে সমাজ সংসার পাপের ভয়ে স্থান দিতে সাহস পায়নি—দেশের পূজায় তার অলঙ্কার চলবে তো? না, অর্থকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না!

জনতার সঙ্গে চিন্তিত প্রভাত এগিয়ে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার পরে দেশবন্ধুকে ধর্মরক্ষিণী সভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হলো।

গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাছাড়াও শহরের অনেকেই সেখানে ছিলেন। দেশবন্ধুর বাণী শোনার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহ সকলেরই।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি জানালেন তাঁব দেশবাসীকে, তাঁর মত এবং নীতি।

তিনি বললেন, বন্ধুগণ, আমাদের লক্ষ্য হবে, ইংরাজের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। ওদের চণ্ডনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত করা। আমাদের জীবনের মূল উপাদান তেজ—তাকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে হবে। তেজদীপ্ত তেত্রিশ কোটির মিলিত চেষ্টার কাছে বৃটিশশক্তি কত নগণ্য। সকল দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে, হিন্দু মুসলিম উভয় শক্তি দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুলোচ্ছেদ করতে

হবে। ইংরাজের আস্ফালনে আমরা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত না হই। আমাদের কবি বলেছেন—

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙ্গালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

আমার এই অনুরোধ, কবির এই বাণী আপনারা সার্থক করে তুলুন।

সেদিনের মত শেষ হলো সভা। দেশবন্ধুর বাণী সকলেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করল।

প্রভাত পিছন ফিরতেই সুব্রতকে দেখতে পায়। সুব্রতর ঠিক আগেই বীণা এবং মহামায়া।

বীণাই পিছন থেকে বলল, প্রভাতদা, আমাদের চিনতে পারছ?

প্রভাতের মন তখন দেশবন্ধুব কথায় ভরা। বীণার পরিহাসে সুর মেলাতে ইচ্ছা হলো না। কিছু না বললেও ভাল দেখায় না। তাই অল্প কথায় বলল, যাব এক সময় তোমাদের বাড়ী।

ভিড় একটু পাতলা হতে প্রভাতের চোখ আটকে গেল দুই মহিলার কাণ্ড দেখে। যে চেয়ারখানায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বসেছিলেন—সেই চেয়ারখানাকে মহিলা দু'জন গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে। প্রণামশেষে একজন আর একজনকে ফিসফিস করে বলছে, চেয়ারখানার ভাগ্য দেখে হিংসে হয়, অমন একজন লোকের স্পর্শ পাওয়া! ধন্য হলো ওর চেয়ার জন্ম।

মহিলা দু'জনের কথা প্রভাতের ভাল লাগল। মনে মনে ভাবে, সব কিছুর বিনিময়ে দেশবন্ধু যে সম্পদ অর্জন করেছেন, তা পৃথিবীর অল্প লোকের ভাগ্যেই সম্ভব হয়েছে।

সুব্রত প্রভাতের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলল, বাড়ী যাবে তো এখন ?

হ্যাঁ ভাই। ভীষণ পরিশ্রান্ত। চলো না তুমিও আমাদের বাড়ী।

ওরা সকলেই এসে সত্যপ্রসন্নর ঘরে বসল। সত্যপ্রসন্ন তাঁর তোবড়ান গালে এবং কোটরগত চোখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কেমন শুনলে বক্তৃতা ?

ভাল। বলে, প্রভাত রাজনীতিব কচকচি শুরু করতেই সত্যপ্রসন্ন সহাস্যে বললেন, ওসব আজ আর ভাল লাগছে না। বরং, সুব্রত, তুমি একখানা গান শোনাও। কত দিন যে তোমার গান শোনা হয়নি।

বীণা, মহামায়াও এসে বসল সেখানে। গানের প্রস্তাবে ওরাও খুশী।

প্রভাত মুখ টিপে হেসে বলল, দাদুর শরীর কি এখন খুবই ভাল ?

হ্যাঁ দাদা। ডাক্তার হাতের কাছে থাকলে সত্যিই শরীর বেশ সুস্থ বোধ করি।

এ-কথায় সকলেই হেসে উঠল।

এমন সময় জল-খাবার এনে উমা সকলকে দিল।

খাবার খাওয়াব পর্ব শেষ হতে সুব্রত গান শোনাল।

—ঐ মহা সিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।

সত্যপ্রসন্নকে তিন চার খানা গান শুনিয়ে সুব্রতর বাড়ী ফিরতে সেদিন একটু রাত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমেই মধুর সঙ্গে দেখা, তোমার একটু আক্কেল নেই দাদাবাবু। রাত এখন ক'টা বাজে জান, না ঘড়ি দেখতে ভুলে গেছ ? রোগা বাপ সেই থেকে ঘর আর বার করছে, তুমি এলে এতক্ষণে।

মধুর এরূপ মধুর সম্ভাষণে সুব্রত অভ্যস্ত। কিন্তু লজ্জা পেল সুব্রত ওর বাবার নীরব তিরস্কারে।

অনুশোচনায় পুড়তে লাগল সুব্রত, সত্যিই তো, রোগা মানুষ, তাঁকে ভাবানো আমার উচিত হয়নি। কোন সভা-সমিতিতে গিয়ে ফিরতে দেরী হলে প্রথমেই জেলের কথা মনে হয়। জেলে পুরতে আজকাল কোন কারণের দরকার হয় না। যুবক হওয়াই যথেষ্ট অপরাধ। তার উপরে বিবাহের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেনি, নিশ্চয়ই কোন গভীর কারণ আছে। এবং সে কারণটা যে রাজবিদ্রোহ তা সরকার বাহাদুর ধরেই রেখেছেন।

অপরাধের বোঝা আর না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘুম আসছে না। এলোমেলো চিন্তা ভিড় করে আসে। কিন্তু সব ভিড় সরিয়ে যে মুখখানা ভেসে ওঠে, তাকে আর নড়ানো যায় না। সে-মুখখানার সঙ্গে বিগত অনেকগুলি বছরের স্মৃতি জড়ানো।

প্রথম আমি যখন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় যাই, তখন আমার বয়স আর কতই বা হবে—উনিশ-কুড়ির বেশী নয়। তখন মনের যৌবরাজ্যে আমি একচ্ছত্র সম্রাট। ঠিক সেই সময় আমার সহপাঠিনী বেলা মণ্ডলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো। সবে কলকাতায় এসেছি, সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। ক্লাশ করা আর নিরিবিলিতে বসে পড়া, এই ছিল আমার কাজ।

একদিন আমি কলেজ লাইব্রেরীতে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলাম, বেলা তখন চারটে হবে। সেটা ছিল শীতকাল। তাড়াতাড়ি দিনের আলো চলে যেত। সূর্যদেব অস্তাচলে যাওয়ার সময় আমার টেবিলে সোনা-গলান সোনালী রোদ ছড়িয়ে দিলেন।

এমন সময়, গুড্ ইভনিং মিঃ সেন, বলে যে মেয়েটি আমার সমনে এসে দাঁড়াল, সে আমারই সতীর্থ বেলা মণ্ডল।

প্রথম অপরিচিত একটি যুবতীর এত নিকট সান্নিধ্যে লজ্জায় সঙ্কোচবোধ করলাম। এমন কি ওকে বসতে বলতেও ভুলে গেলাম।

বেলাই বলল, অনেক দিন থেকে মনে করছি আপনার সঙ্গে আলাপ করবো—কিন্তু আপনি যা লাজুক,—বলে, সে ফিক্ করে হেসে ফেলল। আমার স্বভাবের এদিকটা ঐ মেয়েটি জেনে ফেলেছে ভেবে, আমি আরো আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

অতি কষ্টে বস্থন ছাড়া কিছুই বলতে পারলাম না।

বেলা তখন জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ। বলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওর সহজ কথা বলার ভঙ্গীটি আমার ভারী ভাল লাগল।

বেলা বলল, এখানে ভাল ছেলে বলে আপনার খুব নাম হয়েছে।

এতক্ষণে আমি বললাম, কিন্তু আমার তো অন্য রকম ধারণা ছিল।

কি করে ধারণা হলো, আপনি তো মেশেন না কারুর সঙ্গে ?

হেসে বললুম, বোধ হয় কমপ্লেক্সেব থেকেই ঐ রকম ধারণা হয়েছে।

মুচকি হেসে বেলা বলল, আর একটা কথাও ওরা বলে কিন্তু।

কি ?

আপনি নাকি ভারী সিরিয়াস টাইপের।

বেলা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আর আমি অস্বস্তিতে মুখ লাল করে বসে রইলাম।

হাসি থামিয়ে বেলা বলল, রাগ করলেন নাকি ?

না। রাগের কথা তো আপনি কিছু বলেননি।

বেলা বলল, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

বলুন।

আপনি ভীষণ লাজুক।

এবারে আমি হেসে ফেললাম। এবং সহজ গলায় বললাম, ঠিকই বলেছেন আপনি।

আমার গোপন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরে, আমি সহজ হয়ে উঠলাম। গল্প জমে উঠতে বেশী সময় লাগল না।

বেলাও তখন প্রাণ খুলে আমার সাথে কথা বলার জন্য সহজ হয়ে উঠল।

এক সময় বেলা বলল, দেখুন মিঃ সেন, আপনি আমাকে বেলা বলেই ডাকবেন। সকলেই আমাকে ঐ বলে ডাকে। মিস্ মণ্ডল বলে দূরে সরিয়ে দেবেন না।

আমিও সুযোগ ছাড়লাম না। বললাম, আমাকেও সকলে সুব্রত বলে ডাকে। আপনার কাছেও ঐ ডাক আশা করছি।

মুখ টিপে হেসে বেলা বলল, ঘনিষ্ঠ হওয়ার আশা বুঝি!

এ-কথায় এত জোরে হেসে উঠেছিলাম যে, বেলা ভ্রূ কুঁচকে হাসি চেপে বলল, আঃ, কি জোরে হাসছেন!

তারপরে একদিন টের পেলাম, আমরা দু'জনে আর কেউ কারুকে আপনি বলছি না। আবো জানতে পারলাম, আমরা দু'জনেই এখন দু'জনের মন-জানাজানিব রহস্য নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছি।

একটা রবিবারে বুলু বলল, আজকেব ছুটিটা বোটানিকসে গিয়ে এন্‌জয় কবি আমবা, কি বল, সুব্রত!

আমি রাজী হয়ে গেলাম কিন্তু বিকেলেব দিকে বরিশালেব একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা কবতে এল। আমি উসখুস করছি ওঠাব জন্যে, কিন্তু তার ওঠার কোন লক্ষণ নেই। এ ধারে বুলু রেগে আগুন। ছেলেটি চলে যেতে আমি যখন ওর কাছে গেলাম, তখন এমন ভাব করল যেন আমাকে চেনে না। নিজের মনে এটা সেটা করেই যাচ্ছে। আমার অবস্থা শোচনীয়। বেশ কিছু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, প্লিজ, বুলু, আমার দিকে একটু তাকাও।

বুলু উষ্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার যদি কিছু মাত্র টাইম জ্ঞান থাকে। কখন থেকে বসে আছি, বলো তো?

আমি বিনা বাক্যে ওর কথা মেনে নিলাম। বললাম, বরিশালের একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল।

তাতে বুলু আরো রেগে গেল। বলল, কোন একটা ছেলে, তার কথার দাম হলো আমার কথার চেয়ে বেশী!

আমি দেখলাম, মেয়েদের সোজা কথা বোঝান সহজ কথা নয়, অন্তত আমার পক্ষে নয়। এর চেয়ে অনেক সোজা বায়োলজির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

যাই হোক, বুলুর রাগ ভাঙ্গিয়ে আমরা সেদিন বোটানিকসে যেতে পেরেছিলাম। এবং শুধু যাওয়াই নয়, সেই দিনটি আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

গঙ্গার পারে গিয়ে বুলু ঘাসেব উপর পা ছড়িয়ে বসল। আমিও ওব পাশে বসলাম। সেটা ছিল চৈত্র মাস। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। বুলুর শ্যাম্পু করা চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ছে—কখনও বা আমার গালে কপালে এসে লাগছে তার স্পর্শ।

শরীরতত্ত্ব নিয়েই আমাদের কারবার। কিন্তু, সেদিনের সেই অনুভূতিকে ঠিক কোন পর্যায়ভুক্ত করা যায়—তা এখনও আমার কাছে গবেষণার বিষয়।

বুলু ছিল বড় ছটফটে মেয়ে, কখনও চুপ করে বসতে তাকে দেখিনি। উচ্ছল জীবনানন্দে ছিল সে পূর্ণ।

আমার একখানা হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, সুব্রত একটা গান শোনাও।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে গঙ্গার বুকে। লতায় পাতায় আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। আধখানা চাঁদ কেবল দেখা যাচ্ছে আকাশে। আর গঙ্গা দু'হাত তুলে তাকেই ধরার জন্যে মেতে উঠেছে। চৈতি হাওয়ার উদাস দীর্ঘশ্বাসে আমের মুকুল ঝরে পড়ছে। দিনান্তে পাখীরা কুলায় ফিরে এসেছে। এমন একটা পরিবেশে যেন কথার চেয়ে গানই বেশী মানায়।

বুলু ফরমাস্ করল, ঐ গানটা গাও, "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—"

গান শেষ হলো, কিন্তু আমাদের মনের আবেগ তখনও স্থির হয়নি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বুলুকে আমি বললাম, বলো বুলু, তুমি আমার হবে ?

বুলুর একটি কথার উপর আমার জীবনের সব নির্ভর করছে।

কেন এত দেরী হচ্ছে বলতে বুলুর! যেন যুগযুগান্ত প্রতীক্ষা করে বসে আছি।

এ যেন সে বুলু নয়—যাকে আমি এত দিন ধরে জানি। কেমন গম্ভীর গলা।

বুলু বলল, সুব্রত, তোমাকে আমার জীবনের অনেক কথাই বলা হয়নি। ভেবেছিলাম সময়মত বলবো। সে সময় যে এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবিনি। যাক্ শোন, আমরা জাতিতে ছিলাম নমঃশূদ্র। বাবা ঘরামীর এবং মাটি কাটার কাজ করতেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় আমাদের দেশ ছিল। আমরা গ্রামে থাকতাম। সে বছর বাবাকে ধরল কালাজ্বরে। কাজকর্ম কিছুই বিশেষ করতে পারেন না। এমন জোয়ান মানুষটা দেখতে দেখতে আধখানা হয়ে গেল। খাওয়াই জোটে না—চিকিৎসার প্রশ্ন তো অবান্তর। দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এদিকে জমিদার গ্রামে পুকুর কাটাবেন, মেটেলদের সকলকে ডাকা হচ্ছে। আমার বাবাকেও জমিদারের পেয়াদা ডাকতে এলো। বাবা তখন বসে দুটি শুকনো মুড়ি খাচ্ছিলেন, পেয়াদা হাঁকল, ও রামচরণ মণ্ডল, তোকে জমিদার তলব করেছেন। বাবার জ্বরে জ্বরে মেজাজটা খিটখিটে হয়েছিল, রুক্ষ গলায় বললেন—এখন আমি যেতে পারবো না। দেখছ না আমার অসুখ।

পেয়াদা শাসিয়ে গেল, আচ্ছা, দেখা যাবে। কিছুক্ষণ পরে

জমিদারের তরফ থেকে যিনি এলেন তিনি আর কথা নয়, গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন বাবাকে ; পরে যখন বাবা ফিরে এলেন পিঠ দিয়ে রক্ত ঘামের মত ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। অসংখ্য চাবুকের দাগ পিঠে। তা দেখে মা আঁৎকে উঠে কেঁদে ফেলেন। বললেন, ইস্ এমন করে মানুষ মানুষকে মারে!

বাবার চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল। চাপা গর্জনে বললেন, আর দেশে থাকবো না, বউ চল শহরে।

এই ঘটনার দিন পনেবোর মধ্যে আমবা আমাদের ভাঙ্গা ঘরে মরচেপড়া তালা ঝুলিয়ে, ঢাকা শহরে চলে এলাম।

বাবার পিঠের ঘা তখনও শুকোয়নি। জ্বরের প্রকোপে হুঁশও সব সময় থাকত না। মা ভারী বিপদে পড়লেন। একটা ভাঙ্গা ঘোড়াব আস্তাবলে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। অবশ্য তখন ঘোড়া থাকত না ওখানে।

আমাব বয়স তখন সাত বছব। আমাদের জাতে রূপের বালাই বড় কাবো একটা নেই। কিন্তু আমার মা ছিলেন সুন্দরী। সেই রূপই এখন মাকে আরো ভাবিয়ে তুলল। ভাঙ্গা আস্তাবলের আশপাশে বদলোকেব আনাগোনা বেড়ে গেল। ওদের অশ্লীল আচরণে মা উত্ত্যক্ত হতেন খুবই। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। মার রূপোব গহনা বিক্রি করা টাকায় এত দিন কোন রকমে চলল —আর চলে না। বাবাকে হাসপাতালে দেওয়ার কথা উঠতে বাবাই ভীষণ আপত্তি করলেন।

মাকে বললেন, আমি হাসপাতালে গেলে তুমি খুকীকে নিয়ে একা থাকতে পারবে?

মা-ও ঐ মৃতপ্রায় মানুষটিকে আশ্রয় করে নিরাপদ হতে চাইলেন।

ভগবান একদিন মার সে আশ্রয়টুকুও সরিয়ে নিলেন।

বর্ষার দুর্যোগ রাত্রি, বাবা কাশতে কাশতে হার্টফেল

করলেন। সে-রাত্রির কথা ভাবলে এখনও আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মৃত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইলেন। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। সব যেন জমে বরফ হয়ে গেছে।

যাদের আমরা বদলোক বলি তারাও যে মানুষের অনেক উপকারে আসে সেদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

যে বদলোকগুলো মাকে প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তারাই এসে যখন মার ঐ অবস্থা দেখল, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা বাবার মৃত-দেহ কাঁধে কবে নিয়ে সৎকার করে এল। এমন কি দাহ করবাব খরচাপাতি যা লাগল সবই তারা চাঁদা করে তুলে সব ব্যবস্থা করল। মা এবং আমার দু-তিন দিনের খাওয়ার ব্যবস্থাও রেখে গেল।

ভগবানের দয়া যখন নেমে আসে তখন দশ দিক থেকেই আসে।

এ ঘটনাব তিনদিন পরে একজন মিশনারী মেম এলেন। পাড়ার লোকেরা তাঁকে খোঁড়া মেম বলত। একখানা পা একটু টেনে চলেন।

তিনি নাকি এ পাড়ার কোন দোকানীর কাছে আমাদের দুরবস্থাব কথা শুনেছেন। তিনি এসে মাকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নিলেন। কত সান্ত্বনার কথা শোনালেন। আর শোনালেন, খ্রীষ্টধর্মের উদার মতবাদ।

তিনি রোজই আসতে লাগলেন। তিনি এলে আমাদেব খুব ভাল লাগত। আমার জন্যে খেলনা, ছবির বই, লজেন্স এই সব আনতেন। তাছাড়া আমাদের খাওয়া পরা থেকে সব কিছুর ভারই তিনি নিলেন। মা যখন একটু সামলে উঠেছেন সেই সময় মাদার বললেন, তুমি যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর তবে তোমাদের কোন কষ্টই থাকবে না। তোমার মেয়েকে আমরা লেখাপড়া শেখাব, তোমাকেও আমরা

কিছু কাজের উপযুক্ত করে নেব।

মা প্রায় রাজী হলেন। তাছাড়া তখন বাঁচবার আর কোন উপায়ই ছিল না।

কাল আমাদের ধর্মান্তর হবে, সেই রাত্রেই মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। দড়িও পেয়েছিলেন আস্তাবলেই।

সকাল বেলায় মাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। মুহূর্তে অনেক লোক জড়ো হলো। পুলিশ দারোগা কেউ বাকী রইল না।

সেই মিশনারী মেম মিস মুরও এলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিস-ফিস করে বললেন, জীবন দিতে পারলেন কিন্তু ধর্ম দিতে পারলেন না। ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য সৃষ্টি মানুষের মন।

আমাকে তিনি নিয়ে এলেন। সেই থেকে আমি মিশনেই প্রতিপালিত। ডাক্তারী পাশ করার পরেও মাদারের ইচ্ছা, কোন মিশনারী হস্‌পিটালেই আমি যুক্ত থাকি।

বুলু থামল। কিন্তু আমার মন ছুটেই চলেছে একটু আগে শোনা গল্পের পিছনে। বেলার দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করলাম, ওর চিন্তার সাথী হতে। কিন্তু ওর শিশির-ধোয়া পবিত্র মুখে যেন কোন চিন্তার স্পর্শটুকু লেগে নেই। সত্য গোপন না করার গৌরবে ও-মুখ ভাস্বর।

বুলুর হাত দু'খানা আস্তে হাতে তুলে নিয়ে স্পষ্ট গলায় বললাম, তোমার অতীত এবং বর্তমানকে নিয়েই তুমি, সেই তোমাকে আমি গ্রহণ করতে চাই বুলু। যদি হিন্দুমতে তা সম্ভব না হয়, তবে আমাদের বিয়ে খ্রীষ্টধর্মমতেই করতে হবে।

বুলুর মুখে একটু হাসি স্থির হয়ে রইল।

আমি বললাম, নিশ্চয় তোমার অমত হবে না।

না। কিন্তু, পরীক্ষার আগে নয়।

আমি হেসে বললাম, সে তো বটেই। পরীক্ষার আর মোটে একটা বছর বাকী, তার পরেই।

এই কথাই পাকা হলো, ফাইনাল পরীক্ষার পরেই আমাদের বিয়ে হবে।

পরীক্ষার ঠিক পরেই, বাবার টেলিগ্রাম পেলাম, তোমার মা'র টাইফয়েড, অবিলম্বে চলে এসো।

এসে নিজেব ডাক্তারি জ্ঞান দিয়ে বুঝলাম, মায়ের জীবনের আশা খুবই কম। মনের সে এক অদ্ভুত অবস্থা। আমবা থাকবো আর মা থাকবে না—এমন ভয়ানক দিনের কথা ভেবে পাগলের মত হয়ে গেলাম। নিজের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিব পুঁজি নিয়ে অক্লান্ত সেবায় দিন আমার কেটে যেতে লাগল। একমাত্র চিন্তা, কি করে মাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়।

আসাব সময় তাড়াহুড়োয় বুলুকে বলে আসা হয়নি, এসেও চিঠি দেওয়ার কথা মনে হলো না।

মা'র মৃত্যুব কিছুক্ষণ আগে, তাঁর জ্ঞান হলো। রাত্রি তখন গভীর। সকলকেই একটু বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একাই মা'র মাথার কাছে জেগে বসে আছি। মা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। প্রাণের যেন কোন চিহ্নই নেই আর সে মুখে। আমার বুকটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল।

সকলেরই ধাবণা অন্য দিনেব তুলনায় আজ মা অনেকটা ভাল আছেন।

হঠাৎ তিনি চোখ খুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টিতে যেন বিশ্বেব ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে আছে।

আমি মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, কিছু বলবে মা!

মা চকিতে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে নিলেন, তারপর গভীর আবেগে আমার হাত দুটো চেপে ধরে অনেকটা আদেশের সুরে বললেন, কথা দে আমাকে খ্রীষ্টান-ধর্ম নিবি না। আমি

হতভম্ব হয়ে গেলাম মা'র এ আচরণে। কিন্তু, কথা আমাকে দিতেই হলো। সে আদেশ অমান্য করার শক্তি কোথায় আমার। তখনও মা'র হাতের মধ্যে ধরা আমার হাত। মা'র চোখে যেন স্বর্গের শান্তি নেমে এলো। কিন্তু এতটা উত্তেজনার ফল ভাল হলো না। মা'র অবস্থা আবার খারাপের দিকে চলে গেল। একটু পরেই যে বেহুঁস হয়ে গেলেন, আর জ্ঞান ফিরল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলাম আমরা সকলেই।

কালের স্নিগ্ধ হাতের সেবায় কিছুদিন পবে শোকের প্রাবল্য হ্রাস পেল। তখন বুলুর কথা মনে পড়ল। আর মনে হলো, তাকে কিছুই না জানানো আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। এখন মা'র মৃত্যুকালে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তারপবে লিখব কি!

মা'র শ্রাদ্ধের পরে কলকাতায় গিয়ে দেখা কবলাম বুলুর সঙ্গে।

মুণ্ডিত মস্তক আমাকে দেখেই বুলু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—এ কি! অসুখ করেছিল নাকি?

আমি বললাম, না। মা মাবা গেছেন।

কবে? আমি তো কিছুই জানি না।

তারপবে অভিমানে মুখ কালো করে বলল, আমাকে জানানোও একটু দবকার মনে করলে না?

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললাম, সময় পেলাম কোথায় আর। কয়েকটা দিনেব মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

তারপরে যে কি বলা উচিত, তাই ভাবতে লাগলাম। কিছুতেই ঠিক মনের কথা বলার মত ভাষা পাচ্ছি না। বুলু কি বিশ্বাস করবে, তাকে না পাওয়ার দুঃখ আমার কত গভীর!

বুলু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল, একটু কাছে এসে আমার হাত ধরে করুণ কণ্ঠে বলল, আমার কথায় তুমি দুঃখ পেলে সুব্রত? আমি যে তোমার খবর না পেয়ে এত দিন কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম তা যদি তুমি জানতে। তোমাকে দেখার পরে

অভিমানে আমি যা মুখে এলো তাই বলে ফেললাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আমি বুলুর হাতে নীরবে একটু চাপ দিয়ে বললাম, সেজন্যে নয়। আব একটা ব্যাপারে মনটা বড় খারাপ।

কি ব্যাপাব বলো তো?

তোমার কাছে সে-কথা কি করে বলবো আমি—কথার শেষে গলার স্বর অসম্ভব কেঁপে গেল আমার।

বুলু ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো আমাব কাছে। দরদভরা গলায় বলল, বলো সুব্রত, যত দুঃখের খববই হোক।

সব শুনল বুলু, শান্ত সংযত থেকে।

তাবপর বলল, এখন তুমি কি কববে ঠিক করেছ?

যদিও কথাটা বলতে আমার বুকেব পাঁজর যেন গুঁড়িয়ে গেল, তবু বলতেই হলো।

বললাম, তোমাকে আমি আমাদের অঙ্গীকার থেকে মুক্তি দিতে চাই বুলু।

বুলু কথাটার যেন অর্থ গ্রহণ করতে পারছে না এমনি দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওব সেই পাথরের মত দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলাম না। মাথা আপনিই নীচু হলো।

একটু পবে বুলুব দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে তাকিয়ে দেখি বুলুর চোখে জল কানায় কানায় পূর্ণ।

রুদ্ধ গলায় বুলু বলল, সুব্রত, অঙ্গীকার করা যত সোজা, ভাঙ্গা তত সহজ কি? অন্ততঃ আমার পক্ষে নয়। কিন্তু মৃত্যুকালে মা'র কাছে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ, কাজেই বিয়ে আমাদের এ-জন্মে হবার নয়। নাইবা হলো, আমি প্রতীক্ষা করে থাকবো আগামী জন্মের জন্যে। প্রেম মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর। এ সব বোধ হয় ভগবানেরই নির্দেশ। মাদারের বরাবরের ইচ্ছা আমি ডাক্তার হয়ে কোন মিশনারী হাসপাতালে লোকের সেবায় লাগি। বলেনও তিনি,

বিবাহ করে স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সকলেই প্রায় সুখে ঘর-সংসার করে, তুমি থাকবে তাদের উর্ধ্বে, এটাই আমার বাসনা। তাই হলো শেষ পর্যন্ত। আমার প্রেম আমাকে জগতের অন্য মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাবে।

তারপরে বুলু এমন কাণ্ড করল যা এত দিনের মধ্যে কোনোদিন হয়নি। হঠাৎ আমার পায়ে নত হয়ে প্রণাম করল।

আমি যেন পাথরের দেবতা বনে গেলাম। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুলু উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, মাদার আগামী মাসেই ইংল্যাণ্ড চলে যাচ্ছেন, হয়তো আর এদেশে ফিরবেন না। তোমার অনুমতি পেলে আমিও ঐ সঙ্গে বিলেত চলে যেতে পারি। ইচ্ছে হলে সে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে পারি।

আমি বুলুর যাত্রায় বাধা দিইনি। আমাকে দিয়ে যে দুঃখ সে পেয়েছে তা যদি অন্য পরিবেশে কিছুটা ভুলে যেতে পারে তবে ভালই।

সুব্রত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করে, সে আজ কত দিন হয়ে গেল। কত ঋতু এলো গেল কিন্তু বুলু আব এলো না।

বিনিদ্র সুব্রত উঠে একটু ঠাণ্ডা জল খেল। বুলুর ফটোখানাব দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভাবল, আচ্ছা, বুলু কি দেখতে এখনও এই রকম আছে? না মোটা হয়ে বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারায়?

দেয়ালে টাঙ্গানো আয়নায় নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল সুব্রত।

নিজেকে নিজে যেন অনেক দিন পরে দেখল। চুল অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত, শরীরে মেদ বৃদ্ধি হওয়ায় চেহারায় সে তারুণ্য আর নেই। নিজের চেহারাকে নিজেই পরিহাস করে বলল, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হলো সুব্রতর। কেবল চা খেতে বসেছে, এমন সময় উমাচরণ কেঁদে এসে ওর পায়ে পড়ল। বলল, দাদাবাবু আমাদের দাদাবাবুকে পুলিশ ধরে নে গেল। কর্তা তোমাকে এখুনি ডেকেছেন।

সুব্রত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

মহামায়াকে কাঁদতে দেখে সুব্রত বলল, এ কী মাসীমা, আপনি কাঁদছেন! আপনি এতটা ভেঙ্গে পড়বেন তা আমি ভাবিনি।

চোখের জল মুছে মহামায়া বললেন, চেষ্টা তো করছি বাবা অনেক, কিন্তু মন মানছে না যে।

উঠুন, আপনি কান্নাকাটি করলে দাদু যে আরো ভেঙ্গে পড়বেন।

মহামায়া স্ফীত চোখ তুলে বললেন, সুব্রত, তুমি বাবাকে দেখ গিয়ে।

দুর্বল কঙ্কালসার দেহ নিয়ে সত্যপ্রসন্ন বসে আছেন বিছানায়। উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছেন। চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। উপায়হীন অশক্ত বৃদ্ধ নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলছেন। সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, এই অবিচারের একটা বিহিত তোমাকে করতেই হবে সুব্রত।

রাজত্ব করা আর জুলুম করা এক কথা নয়। কোন প্রমাণ ছাড়াও বন্দী করে রাখবে—কী অবিচার! ইংরাজের সুবিবেচনার ধারণা আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। লোভে এতবড় একটা জাতকে কোথায় এনে নাবিয়েছে!

সুব্রত জানে, অধিকাংশ লোকই নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সত্যপ্রসন্ন কিছু বলতে পেরে যেন একটু সুস্থ বোধ করেন।

প্রভাতকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সত্যপ্রসন্ন অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু বিচারকের মন টলল না। বোমা তৈরীর ব্যাপারে লিপ্ত আছে এই সন্দেহই দৃঢ় হয়ে রইল তাদের মনে।

জেলে সুব্রত প্রভাতকে দেখতে গিয়ে বলল, বিনা প্রমাণেই শাস্তি হলো ?

বিদ্রূপ হাস্যে বলল প্রভাত, বাধা কোথায় ? রাউলাট অনেক আগেই পথ প্রস্তুত করে রেখেছেন। সন্দেহ হলেই বন্দী করা চলবে। তাছাড়া ওদের কাছে আমরা কি-ই বা আশা করতে পারি ? যাক, এ নিয়ে আর জল ঘোলা করো না সুব্রত। দাদুকেও বারণ করে দিও। হ্যাঁ শোন সুব্রত, মা আর দাদু রইলেন—তুমি যখন বাইরে আছ তখন আমি নিশ্চিন্ত।

দীপ্তি খোলা চিঠির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে—দু-বছর জেল !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে মেয়েকে ঐ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কার চিঠি ?

দীপ্তি নীরবে চিঠিখানা বাবার হাতে দেয়।

চিঠিটা পড়ে তিনিও কিছু সময় নির্বাক হয়ে থাকেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, প্রভাত যে শেষ পর্যন্ত একজন বিপ্লবী হবে, তা ছিল আমার ধাবণাব বাইরে। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন, এখন যাওয়া কি তোমার ঠিক হবে ?

দীপ্তি একটু জোর দিয়েই বলল, আমি যাব বাবা। এ সময় ওদের কাছে থাকা আমার একান্ত দরকার। তুমি আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

কিন্তু সব শুনে দীপ্তির ঠাকুমা বিপদ বাঁধালেন। প্রথমে প্রভাতের জেল হয়েছে শুনে চোখের জল ফেললেন, তারপর বললেন, প্রভাত জেলে, সত্যপ্রসন্নবাবু বৃদ্ধ এবং অসুস্থ, এ অবস্থায় ছোট বাচ্চা নিয়ে দীপ্তিকে কিছুতে যেতে দেব না।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত দীপ্তি ঠাকুমাকে রাজী করালো।

দীপ্তির যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসে, বাড়ীর সকলের তত মন খারাপ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভেবে অবাক হন, নাতনী তার এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের এতখানি স্থান দখল করেছে! চলে যাবে ভাবতেই ব্যথায় মন টনটন করে। খুব আশ্চর্য হন, মনের এই নতুন পরিচয়ে।

দীপ্তি কিন্তু দাহুর অবস্থা ভেবে, যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়। আবার গিয়ে প্রভাতকে বাড়ীতে দেখতে পাবে না তা ভাবলে অদ্ভুত এক রকমের ব্যথা অনুভব করে।

সবচেয়ে দুঃখ দীপ্তির, প্রভাতকে তার খুকুকে দেখাতে পাববে না। কন্যার জন্মের পরেই স্বামীকে দেখানোর রোমাঞ্চময় মুহূর্তটি নিয়ে কত স্বপ্নই দেখেছে সে। আব কি হয়ে গেল।

আবার অভিমান এসে দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে।

মনে মনে বলে দীপ্তি, প্রভাতের বুকে কি খুকুকে দেখার আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও জমে ছিল! হয়তো মনেই নেই, ওর একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়ে স্ত্রী এদের জন্যে ওর কত ভাবনা! দেশ দেশ করে লোকটা পাগল। আমার মনখানা জুড়ে যেমন প্রভাত, ওর সেবকম দেশ। কখনও বোধ হয় আমাব কথা খুকুর কথা ভাবেও না। আমার কথা না ভাবল, খুকুব কথা তো একটু ভাবা উচিত।

অভিমানিনী দীপ্তিব টপটপ করে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, গালে।

এমন সময় দীপ্তিব' বোন অসীমা খুকুকে কোলে নিয়ে সেখানে এলো। বলল সে, নাও দিদি তোমার মেয়ে, যা ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে।

ছ-মাস বয়সের খুকু কিন্তু মাকে খুব চিনেছে, মোটা দুটি নধর হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার কোলে।

দীপ্তি চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয় ওব কচি মুখটি। এই দৃশ্য দেখে অসীমা মন্তব্য করল, বাব্বা! আর কারো যেন মেয়ে হয় না।

মুচকি হেসে দীপ্তি বলল, হলে বুঝবি।

ইস্, তাই আর কি! বলে অসীমা তার সুগঠিত দেহে হিল্লোল তুলে চলে গেল।

বাপের বাড়ীর দিন ক'টা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল দীপ্তির। যাওয়ার সময় ঠাকুমা, বাবা, ভাই বোন সকলের চোখে জল। এ যাওয়ায় কেবলই কর্তব্যের দায়, যাত্রার আনন্দ নেই।

ববিশাল এসে পৌছল দীপ্তি গ্রীষ্মেব দীর্ঘায়িত দিনের শেষ—প্রায় সন্ধ্যায়। বিহাবেব শুষ্ক খরতাপেব পরে এখানেব সন্ধ্যাটি ওর কাছে বড় স্নিগ্ধ মনে হয়েছিল। সত্যপ্রসন্নব এত যত্নের বাগানের এখন আব সে রূপ নেই। মালিকের মনেব মতই বিক্ষিপ্ত, অযত্নে পালিত গোটাকয়েক ফ্লেব গাছ, আপন খেয়ালে বেড়ে উঠেছে। সেই গাছের ফুল থেকে ভেসে আসছিল মৃদু সৌবভ—প্রভাতের ভালবাসার মতই তা স্বতঃস্ফূর্ত আবেশময়।

দীপ্তিরা বাড়ী এসে পৌছনোব সাথে সাথেই মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে মহামায়া নাতনীকে বুকে তুলে নিলেন। মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে গলায় হাব পবিয়ে দিলেন। খুকু ঠাকুমাকে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মহামায়া নাতনীব মুখ দেখে সাময়িক বিস্মৃত হলেন ছেলের অনুপস্থিতির ব্যথা।

নাতনীকে বুকে চেপে মহামায়া দীপ্তিকে বললেন, চলো বৌমা, তোমাব দাদুব কাছে।

ওদের দেখে বৃদ্ধ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন। খুকুকে ওর কোলে নেওয়ার ইচ্ছা যেন। খুকুর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি রেখে, মহামায়াকে বললেন, এ যে রাজার ঘরে মানায় বৌমা। এত রূপ!

দীপ্তি প্রণাম করতে সত্যপ্রসন্ন আদর করে ওর মাথা বুকে চেপে,

মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, দিদি, তোর শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

দীপ্তি অপাঙ্গে নিজের ক্ষীণ দেহটির পানে তাকিয়ে বলল, না দাছু, ভালই আছি।

প্রভাত জেলে যাওয়ার পরে সত্যপ্রসন্ন আর দাছু ডাক শোনেননি, আজ অনেকদিন পরে দীপ্তি যখন দাছু বলে ডাকল, তখন তাব হৃদয়ের তন্ত্রীতে পুরনো স্থর নতুন কবে বেজে উঠল। শিরায় শিরায় যে আনন্দস্রোত বয়ে গেল, তাবই ছুটি ধারা গড়িয়ে পড়ল, ছ'চোখ বেয়ে।

অনেকদিন পর্যন্ত এ বাড়ীতে কেউ হাসেনি। হাসি শব্দটা যেন এ বাড়ীর অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিল।

আজ খুকুর মুখে হাসির ঝবণাধারা দেখে সত্যপ্রসন্ন আনন্দে অভিভূত হয়ে যান।

খুকুর হাসি দেখে মহামায়াও ভাবেন, এতদিনে হিমশীতল নৈরাশ্যেব অন্ধকার বুঝি খুকুর হাসিব স্পর্শ পেয়ে আবার আলোয় ঝলমল করে উঠবে।

কিন্তু আনন্দও চিরস্থায়ী নয়। কিছুদিনের মধ্যেই মহামায়ার সংসারে অর্থসঙ্কট দেখা দিল। পদে পদেই প্রভাতের অনুপস্থিতি সংসারের সকলের মনে পড়তে লাগল।

বিশেষ করে দীপ্তি, প্রভাত ছাড়া বরিশালকে তার অসহ্য বোধ হলো।

শোয়ার ঘরে প্রভাতেব ফটোর দিকে তাকিয়ে দীপ্তি ভাবে, কতদিন হয়ে গেল দেখিনি।

কত কথাই ভিড় করে আসে দীপ্তির মনে। কিন্তু ফটোর প্রভাতের মুখ নির্বিকার। নেই সে মুখে কোন গোপন কথা জানার আগ্রহ। বোবা ব্যথায় দীপ্তির বুক টন্‌টন্ করে।

এমন সময় উমা এসে বলল, বউদিমণি তোমাকে মা খেতে ডাকছেন।

মহামায়া বসেছেন দীপ্তির খাওয়ার সামনে, আজ ওব বুকের সমস্তটুকু স্নেহ যেন দীপ্তিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। দীপ্তিকে আদর করে, এটা খাও, সেটা খেলে না কেন? রোগা হয়ে গেছে বলে, বাব বার প্রশ্ন কবেন, শরীবের অযত্ন করনি তো, বৌমা? তোমার ঠাকুমা বুড়ো হয়েছেন, তিনি কি আর এখন সব দিক দেখতে শুনতে পারেন। না বাপু, এবার থেকে খুব নিয়মমত থাকবে। এ সময় শরীব ভেঙ্গে গেলে বড় ভুগতে হয়। এখন ভাল ভাল জিনিস খাওয়া তোমাব নেহাৎ দবকাব।

একথা বলেই তাঁব মনে পড়ল, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াতে যে পরিমাণ পয়সার দবকার, তা কোথায় তাঁদেব। প্রভাত কোনদিনই য় আর রোজগার করবে সে আশা করি না। শ্বশুরেব দেশে যা একটু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাও দেখাশোনাব অভাবে কর্মচারীবা লুটেপুটে খাচ্ছে। এ তো গেল টাকা পয়সাব কথা, অভিভাবকের প্রয়োজনই কি কম। বাবাব যা শবীবের অবস্থা, আজ আছে তো কাল নেই। তাবপরে ব্যাটাছেলেব মধ্যে উমা, তার না আছে সাহস না আছে হিম্মৎ—ব্যাটাছেলে নামের অযোগ্য।

কচি বউ নিয়ে একা থাকা মোটেই নিবাপদ নয়। চোর ছ্যাঁচড়ের উৎপাত লেগেই আছে। এই তো সেদিন আশুবাবুদেব বাড়ী চুরি হয়ে গেল। চোব যে আবার মাথায় ঘোমটা টেনে মেয়ে সেজে চুরি করতে আসে. এ তো আমাব এতখানি বয়সে আব শুনিনি।

ওদের ভোজপুরী দারোয়ানটা নাকি মেয়েছেলে ভেবে রসিকতা করতে গিয়েছিল।

নিজের মনে ঐ দৃশ্য কল্পনা করে হাসেন।

মহামায়ার চিরদিনের অভ্যেস সূর্যোদয়েব আগেই ওঠা। এখন নাতনী আসায় তা শেষ রাতে এসে ঠেকেছে। ছোট মেয়েটির কাজ কি কম কিছু। সকাল হতেই জামা বদলানো, মুখ হাত পরিষ্কাব করা, তারপরে দুধ খাওয়ানো—সে তো এক মহামারী কাণ্ড। খুকুও

খাবে না মহামায়াও খাওয়াবেনই। পাক্কা একটি ঘণ্টার চেষ্টায় খুকু ঠাকুমার কাছে পরাজিত হয়ে, মাপের দুধটা খেয়ে ফেলে। তারপরে আছে মহামায়ার পূজোপাঠ। সব শেষে আছে শ্বশুরের জন্যে রান্না। অবশ্য কুটনোটা দীপ্তিই কুটে দেয়। আর সেই সময় চলে শাশুড়ী বউতে গল্প।

প্রভাতের অনুপস্থিতির অবকাশে মহামায়া আর দীপ্তি বড় কাছাকাছি এসে গেছে।

প্রভাত ওদের দু-জনেরই ভালবাসার পাত্র—সেই ভালবাসাই ওদেব দুজনকে দুজনের মনের কাছে নিয়ে এসেছে।

রাঁধতে রাঁধতে মহামায়া প্রশ্ন করলেন, রমেশবাবুদের তোমরা আগেই চিনতে নাকি বৌমা ?

না মা, হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল, পার্কে। আমি আর অসীমা পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওবাও এসেছিলেন স্বামী স্ত্রী সেখানে। পাটনায় যে নতুন এসেছেন, তা দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম। কারণ, ওখানেব প্রায় সব বাঙ্গালীদেরই তো আমরা চিনি। অসীমাই আলাপ কবল আগে।

আপনারা বুঝি নতুন এখানে এসেছেন ?

হ্যাঁ, আমরা কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, বললেন মহিলাটি।

অসীমা আবার প্রশ্ন করল, কোথায় উঠেছেন ?

আমার ভাগ্নে রমেন গুপ্তের বাড়ী।

অসীমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওমা, তাই নাকি! তিনি তো আমাদের খুবই পরিচিত। তাছাড়া আমার ভগ্নীপতি প্রভাত মিত্রেব খুব বন্ধু।

এই কথা শুনে, ভদ্রলোক অগ্রসর হয়ে এসে বললেন, সত্যপ্রসন্ন মিত্রের নাতি প্রভাত মিত্রের কথা বলছেন কি ?

আপনারা তা হলে চেনেন তাদের !

বিলক্ষণ! আগে তো আমরা বরিশালেই ছিলাম। আমি সেখানে কালেক্টরীতে কাজ করতাম। তখন খুবই আলাপ পরিচয় ছিল। এখন পেন্‌সান নেওয়ার পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নানা দেশবিদেশে। তবে শিগগিরই আমাকে বিশেষ দরকারে বরিশাল যেতে হবে।

আমি এতক্ষণ কিছুই বলিনি, ওদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ যখন আমার আসা ঠিক হলো, ঠিক সেইদিন মাসীমারা (রমেশবাবুর স্ত্রী এবং তিনি নিজে) আমাদের বাড়ী বেড়াতে এলেন। ঠাকুমা প্রথমেই বললেন, আমার বরিশাল যাওয়ার কথা। তারপরে বললেন, কিন্তু একটু মুস্কিল হয়েছে, বড় নাতিটিকে দিয়ে দীপ্তিকে পাঠালে, তার বড় পড়ার ক্ষতি হবে—সামনেই পরীক্ষা কিনা।

একথা শুনে মাসীমা বললেন, অসুবিধা যদি না মনে করেন আমাদের সঙ্গে দিন না। আমরা তো পরশুই বরিশাল যাচ্ছি। একেবারে ওর শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দেব।

ঠাকুমা বললেন, তবে তো খুবই ভাল হলো। আপনার সঙ্গেই যাবে। আমরা ওর শাশুড়ীকে সে কথা লিখে দেব। কচি বাচ্চা নিয়ে মেয়ে যাচ্ছে, আপনারা মা বাবার মত দুজন সঙ্গে রইলেন, আমাদেরও কোন ভাবনা থাকল না। ঠাকুমা, মাসীমার হাত দুটো ধরে বললেন, আপনারা আমাদের বড় উপকার করলেন।

অবশ্য মাসীমা মেসোমশাই আমাকে খুবই যত্ন করে এনেছেন। খুকুকে তা ওরা সমস্ত সময় কোলে করে থাকতেন।

সব শুনে মহামায়া বললেন, কাল ওদের দুজনকে খেতে বলি, কি বল, বৌমা? খুকুর মুখে ভাত হবে সামনের মাসে, ততদিন তো আর ওরা থাকছেন না!

বিকেলের দিকে বীণা এলো, খুকুকে কোলে নিয়ে খুব আদর করল। দীপ্তিকে ঠাট্টা করে বলল, বাঃ! বেশ বিরহোপযোগী চেহারা বানিয়েছ তো।

দীপ্তি হেসে বলল, আমার না হয় রোগা হওয়ার একাধিক কারণ আছে, কিন্তু তোমাকে দেখেও তো খুশী হতে পারছি না।

পারবে কি করে ভাই, আমার উপর দিয়ে কি কম ঝড়ঝাপটা গেল। আমি মেয়ে বলে তাই এখনও টিকে আছি।

সলজ্জভাবে দীপ্তি বলল, সব শুনেছি ভাই।

এর পরে যেন অন্য কথা তেমন অগ্রসর হয় না।

খুকুকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে পরিবেশটা সহজ করতে চায় বীণা। খুকুর মুখে চুমু খেয়ে বলল, এত সুন্দর হয়েছিস কেন রে! চটকে একেবারে শেষ করে দিতে ইচ্ছা হয়। আবার হাসে দেখ না! কি এমন হাসির কথা বললুম। ফোকলা মুখে হাসতে তোমার লজ্জা করে না।

খুকু কিন্তু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হলো না। ফোকলা মুখে খুশীর লহর তুলে হাসতে লাগল।

খুকু যেন হাসির খোঁচা দিয়ে বীণার সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে দিল। অন্তর নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল, তিন বছর হয়েছে বীণার বিয়ে হয়েছে, আজও তার কোলে একটি শিশু আসেনি। ওর সমবয়সী মেয়েদের কোলে একটি কেন, দুটিও এসেছে। পিতা অমরনাথের ভারী ইচ্ছা ছিল নাতির মুখ দেখার। কিন্তু বীণা পিতার সে সাধ পূর্ণ করতে পারেনি। একটি শিশুর অভাববোধ ওকে আজ ব্যথিত করল। শিশু বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব খুঁজে বেড়াতে লাগল।

খুকুকে শুইয়ে দিয়ে বীণা বলল, যাচ্ছি বৌদি।

আজ খুকুর অন্নপ্রাশন। প্রভাত জেলে না থাকলে আনন্দে মুখর হতো বাড়ী। এ যেন কর্তব্যের দায়, কোন রকমে সেরে ফেলা।

কিন্তু নিয়মকর্মের কিছুই বাদ দিলেন না সত্যপ্রসন্ন এবং মহামায়া।

আত্মীয়স্বজনদের ডেকে চেষ্টা করলেন আনন্দের অভিনয় করতে।

সাত মাসের খুকুকে চেলি চন্দনে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

নামকরণের সময় পুরুত ঠাকুর বললেন, কি নাম কন্যাব হবে, বলুন।

সত্যপ্রসন্ন চিন্তামাত্র না কবে বললেন, নাম হবে, মুক্তি।

আপত্তি উঠল অনেকের থেকে, আবো তো অনেক ভাল ভাল নাম রাখা চলত—মুক্তি এমন একটা কি নাম।

সত্যপ্রসন্ন ও কথাব পিঠে বললেন, তা হয়তো আছে। আমাব পাশবদ্ধ জীবনটাকে ঐ কন্যাটিই যেন মুক্তি দিতে পাবে।

বৃদ্ধেব কথায় সকলের মুখেই সাময়িক ব্যথার মলিন ছায়া ফেলে।

খাওয়াব আগে নিমন্ত্রিত মেয়েরা গিয়ে বসলেন বড় ঘরখানায়। মেঝেতে আগেই সতবঞ্চি পাতা হয়েছিল। ছেলেবা বসলেন সত্যপ্রসন্নব ঘবে। খেতে এখনও একটু দেরী হবে। এই অবকাশটা নানা গল্পে জমিয়ে তুললেন মেয়েরা।

অবিনাশ ঘোষ শহরের বেশ মানী লোক। মস্ত বড় তালুকদাব। তাঁর স্ত্রী অবলাবালাব দেমাক তাই একটু বেশী। ভারী ভাবী গহনা পরে, একটি অলঙ্কাবেব দোকানে পরিণত করেছেন নিজেকে।

তিনু বোসেব বোগা মত বউটি এগিয়ে এসে, অবলাবালার অনন্ত জোড়া হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই তাগা জোড়া নতুন গড়ালেন বুঝি?

অবলাবালা ঠোঁটের অপূর্ব ভঙ্গী করে বললেন, হ্যাঁ গো, আগের জোড়া বড্ড সেকেলে হয়ে গিয়েছিল। আমি একবার বলতেই কর্তা বললেন, বেশ তো হাল আমলের একজোড়া গড়িয়ে নাও। তা কেমন হয়েছে?

বারংবার অনন্ত গাছায় হাত বুলিয়ে, লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনু বোসের বউ বলল, চমৎকার হয়েছে। কী সূক্ষ্ম কাজের বাহার! আর ওজনেও বেশ ভারী।

বেচারী তিনু বোসের স্ত্রীব গহনার ভারী সখ। ছা-পোষা মানুষ একঘর ছেলেমেয়ে, ভাত কাপড় দিয়ে ওঠাই দায়, গহনার তো প্রশ্নই উঠে না। এয়োতির চিহ্ন একজোড়া মোটা শাঁখা ছাড়া অঙ্গে সোনাব চিহ্নটুকু নেই।

ভুবন চৌধুবীর মা বললেন, ওগো, সোনা-দানা আজকাল যত কম থাকে ততই নিরাপদ। সেদিনের অতুল মুখুজ্জের বাড়ীর চুরির কথা শোননি ?

একটা গুঞ্জন উঠল, একটু একটু শুনেছি, কি হয়েছে বলুন তো ? আপনার বাডী থেকে তো ওদের বাড়ী খুবই কাছে।

চৌধুবীগিন্নি বললেন, কাছে বলেই তো শোনা মাত্তর ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি, অতুল মুখুজ্জের ভাগনে বউ নাকে হাত রেখে বসে কাঁদছে। হাত বেয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তারপবে সব শুনলাম, ওর মামী শাশুড়ীর মুখে।

বেশী রাতও নয়, সাতটা আটটা হবে। মুখুজ্জেদের ছোট বউ একরাশ বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে চলেছে মাজতে। ভাগনে বউকে বলেছে, আমাব সঙ্গে আলোটা নিয়ে চল। ভাগনে বউয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে, গায়ে দু-চাবখানা গহনা আছে, নাকে নথ পর্যন্ত। ওদের পুকুরঘাটের পারেই কামিনী ফুলের ঝোপ, বউটি আলোটা সামনে রেখে ঝোপটি পেছন করে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

ছোট বউ ভাগনে বউকে সাবধান করে বলল, তুমি কাপড় দিয়ে হাত-পা ঢেকে বসো। দিনকাল যা পড়েছে, ভয় লাগে।

একথা শুনে ভাগনে বউ ফিক করে হেসে বলল, সেদিন শুনলাম, কার নাকি নাক ছিঁড়ে নোলক নিয়ে গেছে। আচ্ছা, জলজ্যান্ত মানুষের তা নেয় কেমন করে বলুন তো।

কামিনী ঝোপের ভেতর থেকে লম্বা একখানা হাত বেরিয়ে নথটি হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে কে যেন বলল, এমন করে।

উপস্থিত সকলে খিল খিল করে হেসে উঠল।

মহামায়া মধুর শিশি নিতে এ ঘরে এসে বললেন, এত হাসি কিসের ?

মুখুজ্জে বাড়ীর চোরের গল্প শুনে হেসে বাঁচিনে, বলল কাদম্বিনী।

আশুবাবুর বাড়ীর চোরের গল্প শুনেছেন ? বলে হাসলেন, মহামায়া।

তা আবার শুনিনি—বললেন, হেমন্ত রায়ের দিদি।

সকলে তাকে ধরে পড়ল, বলুন না।

তিনি দাঁতে তামাকপাতার গুঁড়ো খানিকটা ঘষে দিয়ে বললেন, আরে সে আর এক মজার চুরি। চোর এসেছে রঙ্গিন শাড়ি পরে কনে বউ সেজে। আশুবাবুর ছোট ছেলের বউভাত সেদিন। হৈ-হুল্লোড়ের অন্ত ছিল না। এর মধ্যে চোর এলো।

রাত্তির তখন তিনটের কম হবে না। খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে। যে যেখানে পেরেছে শুয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। আশুবাবুর সেজ মেয়ে এক গা গহনা পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। চোর যখন ওর গায়ের থেকে গহনা খুলছিল, তখন নাকি ঘুম জড়ানো চোখে একবার তাকিয়েও ছিল। ভেবেছে মা বোধহয় গহনাগুলো খুলে নিচ্ছেন। এমনি করে আরো অনেকের গা থেকে গহনা খুলে নিয়েছে।

যাওয়ার সময় ভোজপুরী দারোয়ানটা চোরটাকে ভেবেছে নতুন কোন ঝি বোধহয়। মিনসের ওকে দেখে রস উথলে উঠল, কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, পিয়ারী কাঁহা যাতে হেঁ, আও হামারা পাশ, বলে যেই নীচু হয়ে ওর মুখ দেখতে গেছে, দেখে ব্যাটা ছেলে! হারে বাপরে! বলে, পাকড়ে ধরতে গেল, কিন্তু এক ঝটকা মেরে চোর বেরিয়ে গেল। হৈ চৈ শুনে সকলে এসে জড়ো হলো সেখানে।

আশুবাবু সব শুনে রেগে মারলেন এক লাথি দারোয়ানের ভুঁড়ির উপর।

ব্যাটা পিরিত করতে গেছে—বলে খুব হম্বি-তম্বি করতে লাগলেন।

সবাই আরেক দফা খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় দত্তগিন্নী এসে ঢুকতে সকলে বলল, আপনার এত দেরী হলো যে!

আর বল কেন! ছোট ননদাইটি এসে হাজির। বিলেত থেকে এসে পেরাচিত্তির করেনি কিছু না, ওকে তো আর ঘরে ঢোকাতে পারি না। সকলে তখন কত বলেছিল, গোবর খেয়ে, পেরাচিত্তির করে শুদ্ধ হয়ে সমাজে দশ জনের একজন হয়ে থাক। তা তো শুনলে না কারুর কথা। খ্রীষ্টানী বুলি কেবল, কেন কি পাপ করেছি যে প্রায়শ্চিত্ত করবো!

আরে, সাত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে খানা খেয়ে এলে, সেটাই তো মহাপাতক। এ সহজ কথাটা তাকে কে বোঝাবে বলো।

ভুবন চৌধুরীর মা বললেন, এতর পরেও আবার কুটুমবাড়ী এসেছে কেন?

একখিলি পান দত্তগিন্নী মুখে পুরে বললেন, সুশীকে নিতে। বলছেন, আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব। শুনছি হালে নাকি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। তা নিক গে। ওসব লোকের তো হিন্দু ধর্মে স্থান হবে না।

কিন্তু ঐ বিধর্মীর কাছে মেয়েটাকে দেই কি করে তোমরাই বল। শাশুড়ী মৃত্যুকালে দু বছরের মেয়েকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন, সেই থেকে ভগবান সাক্ষী নিজের সন্তান থেকে আলাদা করে দেখিনি।

সকলেই তো জানেন, কত টাকা পয়সা খরচা করে বিয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু মেয়ের অদেষ্টে দুঃখ থাকলে আটকাবে কে। ননদায়ের রূপ গুণ দেখে শত্তুরকেও বলতে হয়েছিল—না, বোনের বর এনেছি বটে, অমুক দত্ত।

বছর ঘুরল না, বৃত্তি পেয়ে ননদাই চলে গেলেন বিলেত। এখন তো শুনি মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছেন।

তাতে আমাদের কি হলো। সামনে এক থালা ভাতও তো ধরে দিতে পারলাম না। বৈঠকখানা ঘরে করিম শেখকে ডেকে খানা বানিয়ে খেতে দিতে, বললাম। জান তো তোমরা, আমাদের বাড়ীর কর্তা আবার এসব বিষয়ে খুব হুশিয়ার। বলেন, ধর্মই যদি না রইল, তবে বেঁচে থেকে লাভ কি। জাতিচ্যুত হওয়ার মত আর মহাপাতক আছে! ঐ এমন যে যুধিষ্ঠির তাঁকেও একটি মিথ্যে কথার জন্যে নরক দর্শন করতে হলো। এ তো তার চাইতেও কত বড় পাপ—ম্লেচ্ছদের সঙ্গে অন্ন পান গ্রহণ করা। বোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবো, তবু ঐ অনাচারীর হাতে দেব না।

তবে কি জানেন ভুবনের মা, মেয়েটার কান্না দেখে বুকের হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কথায় আছে, পতিই স্ত্রীলোকের পরমগতি।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ও মেয়ের অদৃষ্টের ঐ লেখন, আমরা নিমিত্ত মাত্র।

সুশীর অদৃষ্টের জন্য সকলেই দুঃখিত হলো। কেবল নববিবাহিতা পারুল বলল, আপনাদের উচিত সুশীদিকে বরের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া। সে না হয় আপনাদের কাছে কোন দিন আসবে না—তাই বলে কোন দিনই বরের কাছে যেতে পারবে না, এ কি রকম ব্যবস্থা!

চাপা গর্জন করে বললেন দত্তগিন্নী, তুই তো এ ধরনের কথা বলবিই, ছুঁড়ী! দুদিন মেমদের স্কুলে পড়ে, চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শিখেছে। বলি মেয়েটাকে জাতিচ্যুত করলে, ধর্ম কি আমাদেরই ছেড়ে কথা কইবে? বলি, ঘরে ভাতের তো অভাব নেই, বিধবা বোনের মত থাকবে সংসারে।

এমন সময় মহামায়া এসে বললেন, চলুন সকলে, খেতে দেওয়া হয়েছে।

যখন খেতে বসলেন সকলে, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। তবে এতে কেউ আশ্চর্য হয় না—মধ্যাহ্ন ভোজন মানেই বিকেল চারটে পাঁচটা।

বীণা সেই সকাল থেকেই খাটছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে পরিবেশনে লেগে গেছে। স্বাস্থ্যের পূর্ণতায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওকে। তা শাড়ীর শাসন উপেক্ষা করে অনেককেই ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে।

অবলাবালা মাছের কাঁটা বেছে মুখে দিয়ে আড় চোখে বীণাকে দেখে মন্তব্য করলেন, বীণাকে এখন আর খালি কোলে মোটেই মানাচ্ছে না। ওর বিয়ে তো প্রভাতেরও আগে হয়েছে, তার মেয়ে হয়ে মুখে ভাতও হয়ে গেল—আর ওর কিনা এখনও খালি কোল। গাছের শোভা যেমন ফলে ফুলে, মেয়েদেরও তেমনি সন্তান সংসার। তা না থাকলে মেয়েদের কোন সম্মান নেই, সৌষ্ঠব নেই।

বীণার মুখখানায় কে যেন কালি মাখিয়ে দিলে। মেয়েটির সব উজ্জ্বলতা যেন কর্কশ জিহ্বা দ্বারা লেহন করে নিলেন অবলাবালা। দীপ্তিও পরিবেশন করছিল, সব শুনে লজ্জায় ক্ষোভে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ছিঃ! এমনি করে বলে কেউ!

অন্য আরো কয়েক জন অবলাবালার কথায় সায় দিতে গিয়ে, বীণার মুখের অবস্থা দেখে থেমে গেলেন।

খাওয়া শেষ হলে পান মুখে দিয়ে সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলে গেলেন।

এবারে মহামায়া বীণাকে বললেন, আয় বীণা তুই আর বৌমা খেতে বোস, বেলা আর নেই।

বিষন্ন মুখে বীণা বলল, মামী, শরীরটা ভাল নেই, খেতে ইচ্ছা করছে না।

মহামায়া ওর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে, সরে কাছে এসে হাত ধরে বললেন, বীণা, তুইও আমার পর্বতপ্রমাণ দুঃখের উপর আরো কিছু চাপিয়ে দিতে চাস! আয় মা, যা পারিস দুটি খেয়ে নে।

খেতে বসেছে দুটিতে, পরিবেশন করছেন মহামায়া নিজে ; কারুর

মুখে একটু শব্দ নেই। বীণা দীপ্তির বাসি ফুলের মত ম্লান মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আহা, আমার জন্যে এরাও ব্যথা পেলে।

দিল্লী থেকে প্রায় দু মাস পরে সুব্রত বরিশাল ফিরল। দিল্লী ওকে দিয়েছিল উত্তেজনাহীন বিশ্রাম। নেই সেখানে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন—চলছে শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন, নিউদিল্লীর সরকারী চাকুরেদের। মনে হয় না, বাংলা আর নতুন দিল্লী ভারত-বর্ষেরই দুটো অংশ। এখানে রাজপথ মুখরিত করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে না মুহূর্তে মুহূর্তে।

সুব্রত ভাবে, দাদা যখন দিল্লী এসে আমাকে লিখলেন, তাঁর আসা এখন সম্ভব নয়, আমাকেই বাবাকে নিয়ে যেতে, তখন এ প্রস্তাবে মনের সায় পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু, গিয়ে দাদা বৌদি এবং ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম পারিবারিক জীবনের মধুর আনন্দের স্বাদ। দিল্লীর নির্জন নিস্তব্ধতা জুগিয়েছিল আমার নবতর চিন্তার চাহিদা। এবার দিল্লী ছেড়ে আসার সময় আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল।

মধু দরজা খুলে একগাল হেসে সবক'টি দাঁত বের করে বলল, দাদাবাবুর দিল্লী বেড়ানো শেষ হলো!

কেন, তোর একা খুব কষ্ট হয়েছিল নাকি?

উদাস সুরে মধু বলল, শূন্য বাড়ীটার মধ্যে মন টিকতে চাইত না।

একটু হেসে সুব্রত বলল, এই কথা।

মধু এবারে বলল, কর্তার সঙ্গে তবু সুখ দুঃখের দুটো কথা কয়ে মনটা হালকা করতাম, তুমি এখানে থাকলেও বাড়ী থাক আর কতক্ষণ—তা তিনিও এলেন না। কেমন আছেন কর্তা ওখানে গিয়ে?

খুব ভাল। দিল্লীর জল-হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে। তাছাড়া নাতি-নাতনীদের নিয়ে বেশ আনন্দেই আছেন। এখানেব খবর কি তাই বল।

তুমি আগে জামাকাপড় ছেড়ে সুস্থ হয়ে নাও দিকি। এখানে আর নতুন কি খবর, ছেলেদের ধরছে আর জেলে পুরছে। ও, হ্যাঁ, একটা নতুন খবব আছে। দীপ্তি বৌদি এসেছেন।

কবে ?

এই তো কিছু দিন আগে।

হ্যাঁবে, দাদু কেমন আছেন ?

ঐ একই বকম—তেমন আব হাঁটা-চলা কবতে পারছেন না।

এ সব কথা সুব্রত জামা খুলতে খুলতেই বলছিল। আর মধুও দিল্লী থেকে আনা জিনিসপত্তর গুছিয়ে বাখছিল আব উত্তব দিচ্ছিল।

মধু বলল, মাঝে একদিন বীণাদি এসেছিলেন, তুমি এসেছ কিনা খোঁজ নিতে। আর সেই মেঠেল ছিনাথকে চেন তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি, তার হয়েছে কি ?

তার পেটে নাকি জল হয়েছে। অন্য ডাক্তার দেখলে তো পয়সা লাগবে, তাই তোমাব খোঁজে।

মধুব গলায় শ্লেষেব আমেজ দেখে, সুব্রত তাকিয়ে একটু হাসল।

তুমি তাড়াতাড়ি চান করে এসো দাদাবাবু, আমি চা করে আনছি। বলে মধু বান্নাঘবেব দিকে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুব্রত বলল, হ্যাঁরে, আর কেউ আসেনি ?

মধু বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আসবে না কেন, মাগনা দায় তুলতে তুমি ছাড়া আর কে আছে। মতি গয়লানী এসেছিল। তার বসত বাড়ীটুকু নাকি জমিদার নিলাম করে নিতে চাইছে—তার একটা পরামর্শ কবতে তোমার সঙ্গে। তোমার আসতে দেরী আছে শুনে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এত দিনে বোধ হয় ওকে ভিটেছাড়া করেছে জমিদার।

বিষণ্ণ হেসে সুব্রত বলল, এই দু মাসে অনেক খবরই জমেছে দেখছি।

মধু শাসিয়ে গেল, এখুনি যেন হুট করে বেরিয়ে যেও না। নেয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে যত খুশী পরের উপকার করে বেড়াও। রান্না আমার প্রায় হয়ে এসেছে, শুধু মাছের ঝোলটুকু বাকী।

মধু ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল, আর সুব্রত সেদিকে তাকিয়ে ভাবল, মধু আমাকে ভালবাসে এটা কিছু নতুন নয়, কিন্তু আজকের মত অপত্য স্নেহের স্বাদ অন্য দিন পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো অনেক দিনের অদর্শনে প্রাত্যহিকের তিক্ততা মুছে গিয়ে স্নেহের মধুর স্বাদটুকু ধরা পড়েছে।

বিকেলবেলা শ্রীনাথকে দেখতে গেল সুব্রত। ওর শারীরিক অবস্থা দেখে খুবই হতাশ হলো। রক্তমাংস বলে দেহে যেন কোন পদার্থই আর অবশিষ্ট নেই। থাকার মধ্যে আছে, বৃহৎ জলপূর্ণ জালার মত একটি উদর।

সুব্রত তাকিয়ে হতাশ স্বরে স্বগতোক্তি করে, উহুঁ, সিরসিস্ অব লিভার, সারানো এখনও চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরে।

সুব্রতকে দেখে, ছেঁড়া কাঁথাখানা এক পাশে ঠেলে ফেলে উঠে বসল, শ্রীনাথ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাঁচার প্রবল বাসনা। কম্পিত হাতে সুব্রতর পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, বাঁচান আমাকে।

সুব্রত পাশে বসে ওর কম্পিত হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, ভয় কি! ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীনাথের হাতখানা শরাহত পাখীর ন্যায় সুব্রতর বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকে।

সুব্রত বলল, দুমাস আগেও তো তোমাকে মোটামুটি ভালই দেখে গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি এতটা বেড়ে গেল!

চোখের উপর শ্রীনাথের আগের চেহারা ভেসে উঠল সুব্রতর।

দত্তদের পুকুর কাটানোব সময় শ্রীনাথই ছিল মেঠেলদের প্রধান। গায়ে কি অসুরেব মত জোর। এক এক কোপে কোদালের মাথায় তুলে আনতো পৃথিবীর বুক থেকে এক ঝোড়া করে মাটি। পরিশ্রমে কালো পিঠে বৃষ্টিব ধারার মত ঘাম ঝরে পড়তো। আর আজ—

ডাক্তারেব মুখ গম্ভীব দেখলে, আপন জনের রোগের গুরুত্ব বুঝতে দেবী হয় না। লজ্জা সবম ত্যাগ করে শ্রীনাথের অল্পবয়সী স্ত্রী তাবা এগিয়ে এসে সুব্রতব মুখেব দিকে তাকিয়ে বলল, খোকার বাবাকে কেমন দেখলেন?

দু বছবের খোকা মায়েব কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। নাদুস-নুদুস কালো কুচকুচে ছেলেটিব দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, খোকা তোমাব বাবার কাছে এসে বোস। তাবপবে শ্রীনাথেব স্ত্রীব প্রশ্নের জবাবে বলল, ভয় পাওয়াব কিছু নেই।

খোকা তাব বাবার কোলের কাছে বসে খেলা করতে লাগল। আর শ্রীনাথ সর্বশক্তি দিয়ে আপন সন্তানকে দেখতে লাগল।

সুব্রত শ্রীনাথকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, মধুকে দিয়ে আমি এখুনি গিয়ে তোমাব ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারার চোখ কৃতজ্ঞতায় ভিজে উঠল। শ্রীনাথ নিজের দু বছরেব শিশুপুত্রটিকে সুব্রতব পায়েব কাছে বসিয়ে দিয়ে, সজল চোখে তাকিয়ে বলল, আমার এই গুঁড়োটুকু বেখে গেলাম আপনাব পায়ে। আব আমার কিছু বলবাব নেই। এবারে মৃত্যু আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

এতখানি বলে শ্রীনাথ ছেলের মাথাটা সুব্রতর পায়ে চেপে ধরল।

আহা-হা একি করছ—বলে, সুব্রত শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়।

বাড়ী ফেরার পথে সুব্রতর কেবলি ওদের কথা মনে হতে লাগল। শ্রীনাথ যে আর বেশীদিন এ জগতে নেই, একথা সুব্রত ভাল করেই জানে। নিষ্ঠুর নিয়তিব বিরুদ্ধে তাই ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বাড়ী এসেই সুব্রত মধুকে দিয়ে শ্রীনাথের জন্যে ওষুধ, দুধ মিশ্রী আর একখানা কম্বল পাঠিয়ে দিল।

মধু কম্বল দেখেই রুক্ষস্বরে বলল, আবার এখানা কেন? ওষুধ দিচ্ছ, দুধ মিশ্রী দিচ্ছ, ব্যস, আবার কম্বল কেন?

আঃ! মধু, তাড়াতাড়ি দিয়ে আয়।

যা-খুশী তোমার তাই কর, আমি মাইনের চাকর বৈ তো অন্য কিছু নই। থাকলেও তোমার গেলেও তোমার। মৃত্যুকালে মাঠাকরুণ হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, তাই যা বলা। যখন ঘরসংসার করবে জিনিসপত্তর চাই কিনা, তুমিই বল? না, উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই হলো। আব জুটেছেও যত হাড়হাভাতেব দল! যত জ্বালা আমার।

সুব্রতব বাড়ী থেকে শ্রীনাথদেব বাড়ী বেশ খানিকটা দূব, এই দূবত্বটা মধু অসন্তোষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যখন সুব্রত দাদুর ঘরে ঢুকল, চমকে উঠলেন তিনি ওকে দেখে। কুঞ্চিত মুখ এক ঝলক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আরে, সুব্রত যে—এসো এসো। কবে এলে?

খুশীর আমেজ কণ্ঠে নিয়ে তিনি উঠে বসলেন।

আজই সকালে, দাদু। একথা বলে সুব্রত নত হয়ে সত্যপ্রসন্নকে প্রণাম করল।

আবেগপূর্ণ স্বরে তিনি বললেন, সুখে থাকো দাদা। তা আরো আগে কেন এলে না?

শ্রীনাথের খুব অসুখ শুনে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

ওঃ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, উমা সেদিন বলছিল, ওর পেটে নাকি জল হয়েছে, মানে উদরী।

হ্যাঁ দাদু, আশা নেই কিছু, একেবারে শেষপর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

আহা, এই বয়সে কেন এমন দুরারোগ্য ব্যাধি হলো। কি জোয়ান ছেলে! বছরখানেক আগে, আমাদের ঢেঁকি ঘরের ভিত ওই তো বেঁধেছিল। ওর যেতে দেরী হলে, ওর সোমত্ত বউটা কচি ছেলেটাকে বুকে চেপে এসে দাঁড়াত। এখন ওদেব দশা কি হবে বলো তো, সুব্রত। এদের পরিণামেব কথা কি তোমরা কেউ চিন্তা কর?

ভাবি বৈকি, দাছু। জীবনেব এত অপচয় পৃথিবীব কোন সভ্য দেশে সম্ভব নয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিব দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা অনাগত ভবিষ্যৎ দেশবাসীর জন্যেও প্রস্তুত করে রাখে, প্রশস্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবন। তাই তাদের জীবনেব প্রারম্ভেই বেজে ওঠে জয়ের মঙ্গলশঙ্খ। সুদূবপ্রসারী জ্ঞানেব আকাঙ্ক্ষা তাদেব অন্তরে! তাদেব বিজ্ঞানেব অবদান সকলেব জীবনেই এনে দিয়েছে গতির সঞ্চার, আর সত্যকে জানার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ আর সীমাবদ্ধ নেই, পৃথিবীর সকলকেই উত্তপ্ত করেছে। আমি চাই দাছু, আমাদের দেশেব প্রতিটি মানুষের জীবনে এসে লাগুক সেই উত্তাপ।

সত্যপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বললেন, তোমার মত এমন কবে ক'জনে ভাবে, ভাই। অধিক সংখ্যক লোকই সস্তায় বাহবা পাওয়ার লোভে ব্যাকুল। এবারে বলো তোমার দিল্লী কেমন লাগল।

ভালই। সেখানের জীবন বেশ নিরুদ্বেগ। লোকের মনে জমে ওঠেনি বিশেষ অসন্তোষ। বিশেষ নিউদিল্লীর সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। মাস গেলে বাঁধা মাইনে হাতে আসে—অভাবের জ্বালা নেই বড় একটা কারো ঘরে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন সত্যপ্রন্ন, বল কি সুব্রত! এমন লোভনীয় দেশে আমার যে এই বৃদ্ধ বয়সেও যেতে ইচ্ছা করছে।

সুব্রতর গলার আওয়াজ পেয়ে মহামায়া মুক্তিকে কোলে নিয়ে এঘরে আসেন।

সুব্রত মহামায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, বাঃ! ভারী সুন্দর হয়েছে তো খুকী। কি নাম রাখলেন?

প্রশ্নের উত্তর দেন সত্যপ্রসন্ন, ওর নাম দিয়েছি আমি, মুক্তি।

সুব্রত বলল, বাঃ, বেশ নাম হয়েছে। দেশের সমস্যা একটি নামের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে পরিষ্কার ভাবে। সত্যিই, আপনি নাম নির্বাচনে কৃতিত্বেব পবিচয় দিয়েছেন। প্রভাত শুনলে ভারী খুশী হবে।

প্রভাতের নাম হতেই বৃদ্ধেব মুখের আলো দপ করে নিবে গেল। ঘবে নেমে এলো বিষণ্ণ এক নীরবতা।

দীপ্তি সুব্রতর জন্যে খাবাব নিয়ে এসে দাঁড়াতে, ঘবের পরিবেশ আবার সহজ হয়।

সুব্রত দীপ্তিব হাত থেকে খাবাবের থালাখানা নিয়ে বলল, এত রোগা হয়ে গেছেন কেন?

আপসোস করে বললেন মহামায়া, বৌমার আগের চেহারাব আর কিছুই নেই। তুমি বাবা, ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে একটা ভাল টনিক লিখে দাও। খেয়ে দেখুক দু শিশি, কেমন থাকে।

দীপ্তি মুখ টিপে হেসে বলল, ভালই আছি আমি, মিথ্যেই মা আর দাদু ব্যস্ত হচ্ছেন।

মিথ্যে নয় দিদি, শরীরটা তোর সত্যিই ভেঙ্গে গেছে। না সুব্রত, তুমি ওর কথা শুনো না, বেশ বলকারক একটা ওষুধ লিখে দাও।

কাগজে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে সুব্রত বলল, আজ তাহলে উঠি দাদু।

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুব্রতর দিল্লীর কথা মনে পড়ে। এতক্ষণে বৌদি টেবিলে প্রতঃরাশের খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে ধূমায়িত চা সকলের সামনে ধরে দিচ্ছেন। আর আমার মধু এতক্ষণে শয্যাত্যাগ করেছে কি না সন্দেহ।

সুব্রতর মনেব আকাশে আজ বেলার মুখ ভেসে উঠল।

আচ্ছা, বুলু এখন কি করছে? হয়তো ব্রেকফাস্টের পরে, তৈরী হচ্ছে নিজের ডিউটির জন্যে। আচ্ছা, ও কি এখন প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে কোন মিঠে সুরে গুনগুন করে গান করছে, না কোন গবেষণার বিষয় নিয়ে ভেবে মরছে? সত্যি, ওকে এত দেখতে ইচ্ছা করে। আর কি কোন দিন দেখা হবে না! একদিন আমাব জীবনে ও মেয়ে ছিল অপরিহার্য। আর আজ—মানুষ তো তাব বুদ্ধির সাহায্যে অনেক কিছুই জানতে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু পেবেছে কি নিজের জীবনেব গতি নিয়ন্ত্রণ করতে! তবে—তা যদি কোন অদৃশ্য অমোঘ শক্তিব হাতেই রয়ে গেল, তাহলে আব নিজেদের শক্তিব এত বড়াই কবা কেন?

মধু চা রুটি ডিমসেদ্ধ সুব্রতব সামনে দিয়ে বলল, তুমি খাও, আমাব ওধাবে অনেক কাজ পড়ে আছে।

সুব্রত খেতে খেতে ভাবে, মধু মায়েব জায়গাটা পুবোই প্রায় দখল করে নিয়েছে। ওব চোখ দিয়েই যেন মা তাঁব ছোট ছেলেটির খাওয়া-দাওয়া সব কিছু দেখছেন। বাবা মা, বুলু সকলেব দায়িত্বই যেন ও-বেচারীব ঘাড়ে এসে চেপেছে। সব কিছু মিলিয়েই পৃথিবীটা ভারী বিচিত্র মনে হয়। ভূগোলের পৃথিবী আর মানুষের মনের পৃথিবী তো এক নয়!

এমন সময় বাইবের দালানে ছেলেদের কলরব শোনা যায়।

সুব্রত উঠে দাঁড়ায়, কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। মর্নিং স্কুলের ছেলেরা এসে গেছে, ক্লাশ এখুনি আরম্ভ হবে। মধুর মতে গরীবদের জন্যে পাঠশালা খোলা সুব্রতর একটা খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়। দু'মাস পরে পাঠশালা আবার খুলছে আজ।

সুব্রত এসে দাঁড়াতে ছেলেরা এক এক করে সকলে প্রণাম করল। সুব্রতও সকলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। প্রশ্ন করল ছেলেদের সুব্রত, কি রে সতীশ, তুই দু'মাসে বেশ খানিকটা লম্বা

হয়েছিস। পড়া ভুলে যাসনি তো? ছুটিতে যা কাজ দিয়েছিলাম করেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই।

আশু, তোর বোনের বিয়ে হয়ে গেছে?

না মাষ্টার মশাই, বাবা টাকার যোগাড় করতে পারলেন না।

হরিধন, তোর দু'খানা বই কেনার কথা ছিল, কিনেছিস?

কিনেছি, মাষ্টার মশাই।

তারপরে সুব্রত ওদেব সকলের জন্যে যে গল্পের বই এনেছে দিল্লী থেকে, তাতে নাম লিখে লিখে ওদের হাতে দিল।

ছেলেদেব আনন্দ আব ধবে না। বই খুলে ছবি দেখছে, গল্পেব নামেব উপব চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন অজানা জগতের রহস্য এখনই উদ্‌ঘাটিত হবে ঐ বই থেকে।

পনেবো ষোলটি ছেলে নিয়ে সুব্রতব এই শিক্ষাদানের প্রয়াস। ইচ্ছা আছে আস্তে আস্তে স্কুলটি বাড়াবাব। নিবক্ষর মানব-জমিতে একদিন অক্ষবেব সোনাব ফসল ফলবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই সুব্রত এগিয়ে চলেছে অসীম ধৈর্যে।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলে, একটু বেলা হতে বিনা পয়সার রোগীতে ডাক্তারখানা ভরে উঠে সুব্রতর।

সুব্রত ঘরে ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়ায়। অনেকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, সুব্রতর বাবণ কিছুতেই শোনে না ওরা। এত দিনের অদর্শনের পর সকলকেই বড় ভাল লাগল সুব্রতর। শিক্ষা সংস্কারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সকলেই অতি নিকটে এসেছে।

হরিচরণ দে তাব আট বছরের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, ছেলেটার কি হলো! জ্বর-জ্বালা কিছুই নেই, কিন্তু কিছু খেতে চায় না আর চুপ করে শুয়ে থাকে।

সুব্রত বলল, এসো তো খোকা।

পরীক্ষা করে দেখে বলল, ওর রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে, হরিচরণ। যতদূর মনে হচ্ছে জন্‌ডিস্‌ হয়েছে।

সেটা আবার কি অসুখ, ডাক্তারবাবু?

সুব্রত একটু হেসে বলল, যাকে ন্যাবা বলে। খাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান। তেল ঘির জিনিস একেবারে খেতে দেবে না। কাল ওর রক্তটা নেব।

এগিয়ে আসে হেমলতা, ওর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারার দিকে তাকিয়ে সুব্রত উদ্বিগ্ন হলো। হঠাৎ মেয়েটার কি হলো। চুল অনেক উঠে গেছে, গায়ের চামড়া হয়েছে খসখসে। আখের ছিবড়ের মত, কেউ যেন ওর সমস্ত মাধুর্য নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

ওকে পরীক্ষা করে সুব্রত বলল, এ রোগ তুমি পেলে কোথায়?

হেমলতা চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, আগে আমার বরের হয়েছে। কলকাতায় নাকি এ রোগ প্রায় সকলেরই হয়।

বিরক্তি চেপে সুব্রত বলল, তোমাকে কে বলেছে?

হেমলতা লজ্জিত স্বরে বলল, আবার কে, যে রোগ নিয়ে এসেছে সে-ই বলেছে। বলে, ওদের কারখানায় যত মজুর আছে, এ রোগ আছে সকলের।

হেমলতার স্বামী কলকাতায় কোন কারখানায় কাজ করে। সে-ই আমদানী করেছে সিফিলিস ব্যাধিটি।

সুব্রত গম্ভীর গলায় বলল, তোমার স্বামীকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

এবারে হেমলতা সত্যিই ভয় পায়। তার কালো চোখে জল ভরে আসে।

ডাক্তারবাবু, খুব খারাপ অসুখ নাকি?

অসুখটা ভাল নয়, তবে জীবনের ভয় নেই। আরো কয়েক জন রুগী দেখার পরে, সেদিনের মত রুগী দেখা শেষ করে সুব্রত উঠে পড়ল।

বাড়ী ঢুকতেই মধু রুষ্ট স্বরে বলল, বেগার খাটতে তোমার জুড়ি নেই। বিনে পয়সায় এতবড় একজন ডাক্তার দেখাতে পারলে কে আব ছাড়ে বলো। আবার ওষুধের দাম পর্যন্ত ট্যাঁক থেকে দেবে। নামই তো হয়েছে, মাগনা ডাক্তার। ওদের কানে খবর এত শিগগিব পৌছল কি কবে যে, তুমি এসেছ? হতভাগাবা যেন ওৎ পেতে বসে ছিল।

হেসে বলল সুব্রত, তোর ফূর্তি দেখেই সকলে বুঝতে পেরেছে।

বাখ তো তোমার ঠাট্টা। সব সময় ভাল লাগে না। একটা অসুখ-বিসুখ হলে—তখন!

মধু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, বুড়ো হয়ে যেন ভীমরতি হয়েছে আমাব—ভব দুপুবে অসুখেব নাম করলাম, একটা কিছু না হলে বাঁচি।

সুব্রত গায়ের জামাটা খুলে ঝুলিয়ে বাখতে বাখতে বলল, আচ্ছা মধু, আমাদেব তো কোন অভাব নেই, কি বলিস?

কি অলক্ষুণে কথা—অভাব হবে কেন আমাদেব!

তবে ওদের যদি একটু সাহায্য কবি, রাগিস কেন?

মধু ব্যাজার মুখ করে বলল, আজই না হয় আমবা দুটো প্রাণী, বে-থা করলে তো সংসাব বড় হবে, তখন এ টাকা কি বেশী হবে?

ওঃ, এই কথা। সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। এটা বুঝিস না কেন, অভাবে না পড়লে কি কেউ কাবো অনুগ্রহ নেয় রে! ওদেব যে কত অভাব তা আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি। আমি বিনে পয়সায় ওদের রোগে না দেখলে, আমাকে নিতে পারত না, বিনে চিকিৎসায় মবে যেত। ওবা আমার দেশের লোক, এভাবে মরবে এটাই কি তুই চাস?

বিরস মুখে মধু বলল, যা-ইচ্ছে তোমার তাই করো। এখন নেয়ে এসে, দুটি ভাত মুখে দিয়ে আমাকে কেতার্থ করো।

পরের দিন রুগীরা এসে পড়ার আগেই সুব্রত মতি গয়লানীর বাড়ী গেল।

সুব্রত যেতেই অন্যান্য ঘোষেরা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে, কেষ্ট ঘোষের দাওয়ায় মোড়া পেতে বসাল।

বিধবা মতি গয়লানীর ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা দেখে সুব্রত বলল, মতির মোকদ্দমার কি হলো ?

যামিনী ঘোষ বলল, আর বলেন কেন, দিন দশেক আগে জমিদার নিলাম ডেকে বিক্রি করে দিলেন। তেনাদের দোষও দিতে পারি না খাজনা বাকী পড়ে আছে, দু-বছরের।

মুরারি ঘোষের মৃত্যুর পরে আর একটি আধলা ছোঁয়ায়নি জমিদারকে। কাজেই অন্যায্য কিছু হয়নি, কি বলেন ?

সুব্রত চুপ করে ভাবে। এ প্রশ্নের জবাব তো এক কথায় হয় না। ন্যায্য আর অন্যায্য দু'টো কথার মানে সকলের কাছে এক নয়। তবে মোটামুটি একটা ধারণা প্রায় সকলেরই আছে।

মতি গয়লানীর বঞ্চনার পেছনে যে যুক্তি, তা সুদূরপ্রসারী মানুষের বাঁচার জন্য কেন পদে পদেই এত বাধা থাকবে ? জমিদারী প্রথার আমূল পরিবর্তন হওয়ার দরকার। জমিদারের হস্ত যদি কেবল প্রজা শাসনের জন্যেই উদ্ধত হয়ে থাকে, তবে তারা আশ্রয় পাবে কার কাছে ! একটি অনাথা বিধবা প্রজাকে জমিদার রক্ষা না করে গৃহহীন করলেন, এটা আইনসিদ্ধ হলেও, মানবতাবহির্ভূত। মানবতাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই আমার ব্রত। জানি না কতদূর কৃতকার্য হবো।

এমন সময় কেষ্ট ঘোষ একখানা কাঁসার রেকাবে গোটা কয়েক নারকেল নাড়ু আর ঘরে ভাজা মুড়ির মোয়া এনে সুব্রতর সামনে রেখে বিনীত স্বরে বলল, ডাক্তারবাবু, এ আমার ঘরের তৈরী জিনিস. আমার ইস্তিরির ইচ্ছে, আপনি এটুকু খান।

তারপরে ঘোষ হেসে বলল, আমরা গরীব মানুষ, আপনাদের উপযুক্ত কীই-বা দিতে পারি।

ইতিমধ্যে কেষ্ট ঘোষের পরিবার আধহাত ঘোমটা টেনে এক

বাটি ক্ষীর এনে সুব্রতর সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, মোয়া দিয়ে খান কর্তা।

সুব্রত ক্ষীর সহযোগে মোয়া খেতে খেতে বলল, বাঃ! এ তো চমৎকার ফলারের আয়োজন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোষগিন্নীর এই সামান্য খাদ্য এত তৃপ্ত করে খেতে দেখে চোখে জল এসে গেল। ভাবল, আহা, ঘরে তো মেয়েছেলে নেই, কে করে দেয় এ সব জিনিস। মাঠাকরুণ গেছেন আজ কত বছর হলো—এমন ছেলে সংসারী হলো না।

খেতে খেতে সুব্রত বলল, মুবাবি ঘোযেব পরিবাব এখন কোথায় আছে?

ছিদাম ঘোষ বলল, আজ্ঞে, সে তার বোনঝিব বাড়ী চলে গেছে। আর তো আপনার বলতে তিনকূলে কেউই নেই। তাদেবও পাঁচজনেব সংসার, কত দিন টিকে থাকতে পারবে, তাই দেখুন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘোষ বলল, সবই অদৃষ্ট ডাক্তারবাবু—সবই অদৃষ্ট। অমন জোয়ান সোয়ামীটা তিন দিনের জ্বরে মবে গেল—পেটের একটা কুঁচো-কাঁচাও হলো না—কে দেখবে বলুন। আমার বাবা বলতেন, তুমি যেখানে যাবে, তোমার বরাত সঙ্গে যাবে, সে কথা তো মিথ্যে নয়।

বিষণ্ণ হেসে ঘোষ আবার বলল, সব ঝেড়ে ফেলতে পাববে—কিন্তু বরাতকে এক চুল নড়াতে পারবে না।

আরো দু-চারটে কথার পরে সুব্রত উঠল।

ইতিমধ্যে ডিস্‌পেনসারি রুগীতে ভরে গেছে। তারই মধ্যে শ্রীনাথের প্রতিবেশী গুরুচরণ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, ছিন্‌নাথের বোধ হয় শেষ অবস্থা।

এ সংবাদে সুব্রত মোটেই অবাক হলো না। ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে, গুরুচরণকে বলল, চলো।

ঠিক এতটাই আশা করেনি—একটু আগেই শ্রীনাথের মৃত্যু

হয়েছে। শ্রীনাথের বুকের উপর তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর দু-বছরের শিশুপুত্র মায়ের এলো চুলের বাশি নিয়ে আপন মনে খেলছে। এ দৃশ্য সুব্রতর মনে বড় আঘাত করল। দু'জন ওদের জাতেরই মেয়েছেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে।

সুব্রত যখন দেখল শ্রীনাথ মারা গেছে, তখন তারাকে মাথায় চোখে জল দিয়ে হুঁশ কবাল।

তারার চেতনা ফিবে আসতেই সুব্রতর পায়েব উপব মুখ গুঁজে ডুকবে কেঁদে উঠল। বড বড় চোখ দুটো সুব্রতর মুখের উপর রেখে বলল, মেরে ফেলুন ডাক্তারবাবু—মেবে ফেলুন, আমাকে। আবাব আমাকে বেহুঁশ কবে দিন, আপনাব দুটি পায়ে গড় করি। আমি যে আর সহ্য করতে পাবছি না গো, আব সইতে পারছি না—

তারার ক্রন্দনে সুব্রত বিচলিত বোধ করে। পকেট থেকে কিছু টাকা বের কবে গুরুচবণের হাতে দিয়ে বলল, আব কয়েকজন লোক ডেকে সৎকারের ব্যবস্থা কবো।

সব ব্যবস্থা কবে সুব্রতর বাড়ী ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়। বাড়ী এসেও সুব্রতর স্নানাহারেব কথা মনে হয় না। একখানা ইজিচেয়ারে চুপ করে শুয়ে থাকে। ওর গম্ভীব শোকাচ্ছন্ন চেহারা দেখে, মধুও কেমন ভড়কে যায়, কিছু বলতে সাহস পায় না।

মুক্তিকে একটা গরম জামা পরাতে গিয়ে দীপ্তি স্বগতোক্তি কবে, নাঃ, জামাটা দেখছি আঁট হচ্ছে গায়ে। হবেই বা না কেন, কত দিন হয়ে গেল। পব মুহূর্তেই মনে পড়ল, প্রভাতেব কারাজীবন শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। এ কথা মনে হওয়া মাত্র বিশটি বসন্তের সুরভি-সিঞ্চিত দীপ্তির মনের মালঞ্চে খুশীর হাওয়া বইল। পলাশের মত বাঙ্গা হলো মুখ। আবশিতে সে মুখের ছায়া দেখে লজ্জিত হলো। তারপরে আর একটা জামা বের করে মুক্তিকে

পরিয়ে দিল। একটা গানের একটা লাইন—"কবে যার কাছে পাব—" মনে পড়তে শরমে রাঙ্গা হয়ে উঠল। মুচকি হেসে ভাবে দীপ্তি, জেলে বসে নিশ্চয় এখন আসার দিন গুনছে। তাছাড়া মুক্তিকে তো এখন পর্যন্ত দেখেই নি, তাকে দেখাব ব্যাকুলতা যাবে কোথায়। যতই দেশকে ভালবাসুক না কেন, এ হলো গিয়ে রক্তের সম্বন্ধ। প্রথম যেদিন বাড়ি আসবেন, মুক্তিকে দেখে ভাববেন, এ আবার কে? কী মজাই না হবে!

আমি যখন পাটনা ছিলাম, তখন একখানা চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিটা যে আমি কত বাব পড়েছি—কয়েকটা লাইন আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। লিখেছিলেন, দীপ্তি আমাব কর্মজগৎ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জান দীপ্তি, চলাই আমাব স্বভাবধর্ম, থামাটাকে আমি মৃত্যু মনে কবি। তা যত দেবীতে আসে, ততই মঙ্গল। ভারতেব নির্বাণোন্মুখ প্রাণপ্রদীপকে আমি আবার জ্বালিয়ে তুলতে চাই। প্রাণেব সেই দীপালি উৎসবে, জগৎ এসে যোগ দেবে। আমি একদিন নিবে যাব, কিন্তু আমার প্রাণস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাগুলি নিববে না কোন দিন—।

হঠাৎ বীণা ডাকে, বৌদি কি কবছ গো?

এসো বীণাদি—তোমাব হাতে কি ওটা?

একটা ব্লাউজ পিস্ কিনেছি, বৌদি, দেখ তো কেমন হলো।

বাঃ! বেশ দেখতে, কে কিনে দিলে, অনিলবাবু নাকি?

তবেই হয়েছে! একটা নতুন লোক কিছুদিন হলো, খদ্দবের শাড়ি, ব্লাউজ পিস্, টেবিল ক্লথ এই সব নিয়ে বিক্রি করতে আসছে বাড়িতে। তার থেকেই নিয়েছি।

দীপ্তি হেসে বলল, ঐ যে পাগলা মতন, লম্বা সুব করে হাঁকে, তার থেকে কিনেছ?

তুমিও ওর থেকে কিছু কিনেছ নাকি?

না। তবে রাস্তায় ওর হাঁক শুনলে আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে

শুনি—কি মজা করে বলে, না ভাই ? আবার কখনও কখনও নাচে, তা দেখেছ ? পাগল নাকি লোকটা ?

বীণা বলল, না, ওটা ওর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কৌশল। তবে মাথায় একটু ছিট্‌ও থাকতে পারে। কারণ, সেদিন বলা নেই কওয়া নেই, কাপড় বিক্রি করতে এসে ওর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

তোমার ননদাই এসে পড়ায় কেমন দাঁত বের করে হাসছিল। ও যখন ধমকে বলল, এঘরে ঢুকেছ কেন ? তখন হে-হে করে পাগলের মত হাসছিল। তবে পাগল হলেও বৌদি লোকটা ভাল। বেশ সস্তায় জিনিস দেয়। আমি ওর থেকে এই ক'দিনে অনেক কিছু কিনেছি।

এমন সময় মহামায়া ঘরে ঢুকে বললেন, কার কথা বলছিস ?

ঐ পাগলা শাড়িওয়ালার।

ওকে আগে কিন্তু কোন দিন দেখিনি।

না মামী, কিছুদিন থেকে আসছে। একদিন ডেকে দেখো, বেশ সস্তায় জিনিস দেয় লোকটা।

দীপ্তি হাঁ-হাঁ করে বাধা দেয়, না মা, ডাকবেন না—আমার ভীষণ ভয় করে।

বীণা ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েও এত ভীতু কেন !

মুক্তি একটা পুতুল বুকে করে এসে দাঁড়াতে বীণা বলল, দেখেছ বৌদি, তোমার মেয়ের পাকামী ! যেন সত্যিকারের মা একটি।

এই বলে বীণা, পুতুলসুদ্ধ মুক্তিকে কোলে নিয়ে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলে।

রাত প্রায় দুটো, দরজায় ধাক্কা শুনে মহামায়া সচকিত হয়ে ওঠেন, কে—

মা, আমি হরি।

বীণাদের চাকর এত রাতে কেন? দ্রুতগতি গিয়ে মহামায়া দরজা খুলে বললেন, কি হয়েছে রে?

ভীত কম্পিত স্বরে হরি বলল, জামাইবাবুকে পুলিশ ধরেছে—আপনি শিগগির চলুন।

কথাটা যেন মহামায়া বিশ্বাস করতে পারেন না। পুলিশ ভুল করেনি তো! অনিল তো কোন সাতে পাঁচে থাকে না, তবে কেন ধরবে!

শ্বশুরের কাছে বলে, উমাকে এবং দীপ্তিকে সাবধান করে দিয়ে, মহামায়া যান বীণাদের বাড়ী।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। অনিলকে পুলিশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনিলের ঠোঁট দুখানা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। পা-দুটো কাঁপছে। বীণা কেঁদে ভাসাচ্ছে।

একটু পরেই সুব্রত এলো। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার সুব্রতর সঙ্গেই কথা বলতে লাগল।

সুব্রত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, অনিলের পড়ার টেবিলের দেরাজে গুলীভরা পিস্তল পাওয়া গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। লাইসেন্সবিহীন পিস্তল রাখার অপরাধেই ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে বীণা বলল, সুব্রতদা, এ-ও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? যে মানুষ কোনো হুজুকে থাকত না, কোনো সভাসমিতিতে যেত না, তার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ!

কিন্তু যেতেই হলো অনিলকে হাজতে, সঙ্গে সুব্রতও গেল। যেতে যেতে সুব্রত ভাবে, আজ অনিল কার দোষে এতবড় অপরাধের বোঝা মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হলো!

সুব্রত অনিলকে সাহস দিয়ে বলল, এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো নিশ্চয়ই—তুমি কিচ্ছু ভেব না, ভাই।

এবারে সত্যিই বীণা একেবারে নিঃসঙ্গ। কিন্তু মন নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই—কি করে অনিলকে মুক্ত করা যায়, তাই এখন দিন-রাত্রির একমাত্র চিন্তা। সুব্রতর সঙ্গে এ বিষয়ে কি কর্তব্য তা নিয়ে পরামর্শ চলে।

একদিন ঐ বিষয়ে একটা দরকারী কথা বলতে, সুব্রত বীণাদের বাড়ি এসে দেখল, বীণা নিবারণ দারোগার সঙ্গে গল্প করছে। একটু চমকে উঠল, বীণার হাসি ওর মোটেই ভাল লাগল না।

ওকে দেখেই নিবারণ দারোগার মুখে পৈশাচিক হাসির ঢেউ খেলে গেল, আর বীণার মুখের হাসি নিষ্প্রভ হতে হতে মিলিয়ে গেল।

নিষ্প্রাণ গলায় বীণা বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, সুব্রতদা, বসো।

তারপর একটু হেসে বলল, জান, দারোগাবাবু নিজেই অনুগ্রহ করে আমার কাছে চা খেতে চাইলেন।

কিন্তু একটু পরেই চা এবং খাবারের যে বিরাট আয়োজন নিয়ে ঘরে ঢুকল হরি, তা দেখে অতি নির্বোধেরও অনুমান করতে কষ্ট হবে না যে, এটা পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা। চা আসতেই দারোগা সাহেব টেরচা চোখে কুটিল একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, আর দেরী কেন সুব্রতবাবু, আরম্ভ করা যাক।

দৃঢ় এবং গম্ভীর স্বরে সুব্রত বলল, না। আমার অন্যত্র কাজ আছে।

সুব্রত চলে গেল। আর বীণা বজ্রাহতের ন্যায় বসে রইল।

সুব্রত যেতে যেতে ভাবল, এ কী করে সম্ভব হলো! নিবারণ দারোগার সঙ্গে তো বীণার মিত্র সম্পর্ক হওয়ার কথা নয়। আগের বিরূপতা কি করে মিত্রতায় এসে পৌঁছল! কিছুতেই এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হলো না সুব্রত। এ ব্যাপার যে এখানেই শেষ নয়, তা বুঝতে সুব্রতর অসুবিধা হয় না। কিন্তু ঘটনার কুৎসিত ভয়াবহতায় সে শিউরে ওঠে। নিজের মনকে বোঝায় সুব্রত, বীণার মত বুদ্ধিমতী এবং সৎ

স্বভাবের মেয়ে কমই আছে। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

সুব্রত বাড়ি আসতেই, মধু বলল, তোমাকে কত লোক খুঁজে গেল।

কে, কে—

ছিনাথের ইস্তিরী, তোমার তাঁতখানার গোটাকয়েক ছেলে আর উমাচরণ।

তাদের কি বলেছিস?

বলেছি, কাল এসো আজ আব দেখা হবে না। তবে উমা বলে গেছে, কি দবকাব নাকি, ওদের বাড়ি একবার যেতে।

সুব্রতব প্রশস্ত ললাট চিন্তায় কুঞ্চিত হলো, দাতুর অসুখ নাকি! যেতে হয় একবার।

তখুনি বেবিয়ে যাচ্ছে দেখে, মধু বলল, এই জন্যেই তোমাকে কোন খবর দিতে ইচ্ছা হয় না। আবার যেন বেশী বাত করো না। আমার হয়েছে সব রকমে মরণ। বিয়ে-থা করে কোথায় সংসাবী হবে তা নয়—যত রাজ্যের ঝামেলা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সুব্রত অবাক হয়ে যায় দাতুকে বারান্দায় আরাম-চেয়ারে একা শুয়ে থাকতে দেখে।

ব্যাপার কি, দাতু?

সুব্রতর মনে হয়, দাতুর মুখে যেন একটি নির্মল শান্তি বিরাজ করছে।

সামনের চেয়াবখানা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সত্যপ্রসন্ন বললেন, কাল প্রভাত মুক্তি পাবে, সেকথা নিশ্চয় ভোলনি?

সুব্রত লজ্জিত হয়ে বলল, ভোলা তো উচিত নয়, কিন্তু নানা ঝামেলায় একেবারে ভুলে গেছি।

এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই সুব্রত। আমি জানি একটু সময়ও তোমার নিজের জন্যে থাকে না। দেশের জন্যে, দশের জন্যে

তোমার সেবা কত নিঃস্বার্থ আব গভীর, তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। এই যে দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন, নিঃশেষে দান করে অমর হয়ে বয়েছেন জনমানসে।

স্মিতহাস্যে সুব্রত বলল, জানেন দাদু, আমাদের বিশ্বকবি দেশবন্ধুর মৃত্যুকে দুটি লাইনে অমর করে রেখেছেন—

এনেছিলে "সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কবি যা বলেছেন, এতটুকু অতিশয়োক্তি নয় সুব্রত। কালেব স্পর্শ এই সব মৃত্যুকে বিস্মৃত বা ম্লান কবতে পারে না, বরং আরো উজ্জ্বল আবো মহিমান্বিত হয়।

একটু আবেগকম্পিত স্বরে সুব্রত বলল, কেবল কি দেশবন্ধু? তরুণ সুভাষের অবদান যে কত মহনীয় তা একদিন বিশ্বের দববাবে বিস্ময় উৎপাদন করবে। আর বাঙালীব এত দিনেব ভীরু অপবাদ ঘুচিয়ে তাব ললাটে এঁকে দেবে বীবত্বেব জয়তিলক।

হাসিমুখে মহামায়া এসে বললেন, কাল প্রভাত আসছে জান তো?

হ্যাঁ মাসীমা।

আজ রাতটা যেন দীপ্তির কাছে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর মনে হয়। বীতনিদ্র দীপ্তি ভাবে, রোজই কি রাত এত বড় হয়! না, আজ আমাকে নিয়ে একটু কৌতুক করছেন, ভগবান!

কোথায় যেন পেটা ঘড়িতে নিস্তব্ধ বাত্রিকে ব্যঙ্গ কবে, ঢং ঢং শব্দে দুটো বাজল। দীপ্তি চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমের আজ দেখা নেই।

দীপ্তি ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে আগামী রাত্রির মধুর চিন্তায় ডুবে গেল। এক সময় দেখে জানালা দিয়ে, পুবের আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে। নারকেল সুপারী গাছের ফাঁকে রাঙ্গা আলোর লুকোচুরি।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। মনে হয়, জগতটাকে এত নিকট আর এত সুন্দর কোন দিন দেখেনি।

সত্যপ্রসন্নর কাসির শব্দে দীপ্তির ঘোর কেটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। কিন্তু উঠে দেখে মহামায়ার এর মধ্যে স্নান হয়ে গেছে। তাঁব শুচিস্নিগ্ধ চেহারাটি দীপ্তির বড় ভাল লাগল।

মহামায়া কৃষ্ণের শতনাম করতে করতে উঠোন থেকে ঘরে ঢুকে বললেন, বৌমা, তাড়াতাড়ি ঘবদোর গুছিয়ে সব পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখো।

ওঁর ব্যস্ততা দেখে দীপ্তি মুখ টিপে একটু হাসল। আপন মনে বলল, কেবল দাহু নয়, ব্যস্তবাগীশ সকলেই। কিন্তু আজকের এই ব্যস্ততা দীপ্তির মনে স্নিগ্ধ বসন্ত হাওয়ার মতই মধুর মনে হলো। ফিস ফিস কবে বলল, "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

সত্যপ্রসন্ন উঠেই উমাকে তলব করলেন।

বিনীত স্ববে উমা বলল, আমাকে ডেকেছেন কর্তা?

হ্যাঁ। তোর আজ অনেক কাজ উমা, আজ কে আসবে জানিস তো?

তা আর জানি না, দাদাবাবু আসবে গো।

উমার মুখে খুশীর খুব একটা উচ্ছ্বাস না দেখে, সত্যপ্রসন্ন রুষ্ট হন। তা প্রকাশ পায় তাঁর পরবর্তী কথায়।

তুই এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন, প্রভাত দু' ঘণ্টা পর বাড়ী ফিরছে। তোর পোড়ামুখে কি একটু খুশীর হাসিও ফুটতে নেই, ব্যাটা।

সত্যিই কর্তার এ কথায় উমা দুঃখ পেল। সুখে দুঃখে ওর জীবন এ পরিবারের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে—আর কর্তা কিনা এই কথা বললেন!

বিরস মুখে বলল, আপনার মত চিৎকার না করলে কি আর আনন্দ হয় না!

কর্তা বিদ্রূপ করে বললেন, তোর আনন্দ তো যন্তর লাগিয়ে বুঝতে হয়।

চেঁচামেচি শুনে মহামায়া এসে বললেন, কি হয়েছে, উমা ?

কাঁদো কাঁদো হয়ে উমা বলল, দেখুন তো মা, কর্তা নিছক আমাকে কটু কথা শোনাচ্ছেন।

মহামায়া এত দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন, সত্যপ্রসন্নর আনন্দ প্রকাশের ধরনই ঐ রকম। উমাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বললেন, আজ প্রভাত আসছে কি না তাই বাবার মনটা চঞ্চল।

তা বলে শুধু শুধু গাল মন্দ—বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল উমা, সত্যপ্রসন্ন ডাকলেন, কোথায় যাচ্ছিস ? যে কথার জন্যে ডাকা তাই তো বলা হয়নি। শিগগিব পরিষ্কার কাপড় জামা পরে প্রভাতকে নিয়ে আয় গিয়ে।

আমি যাব না কর্তা।

তুই ছাড়া আমাদের আর কে আছে যে, যাবে ?

কর্তার শেষের দুটো কথায় উমার চোখে জল এসে গেল।

জেল-গেটের সামনেই প্রভাত দেখতে পেল তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ যুবকদের। ফুলের সুগন্ধে আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে জেল-প্রাঙ্গণ।

সহাস্যে এগিয়ে এসে সুব্রত তার নিজের বাগানের প্রস্ফুটিত দুটি বড় লাল গোলাপ প্রভাতের হাতে দিয়ে, গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল। কথা নয়, নতুন করে মনে মনে উপলব্ধি করল একে অন্যকে। ছেলেরা এগিয়ে এসে প্রভাতের গলায় পরিয়ে দিল মালা। হাত তুলে সকলে সমস্বরে ধ্বনি দিল, বন্দেমাতরম,—প্রভাত মিত্র কী জয়।

প্রভাত হেসে গলার মালাগুলি খুলে হাতে জড়িয়ে নিল। এ যেন এক নতুন আনন্দময় জগৎ। এমন সময় প্রভাতের দৃষ্টি পড়ল উমার উপর।

প্রভাত হেসে বলল, উমাও এসে গেছে। খবর ভাল সব! দাদু কেমন আছেন?

হঠাৎ উমা আনন্দে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। চোখ মুছে, ভাঙ্গা গলায় বলল, সব ভাল দাদাবাবু, তেনারা যে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

উমার কান্না দেখে প্রভাতের চোখও ভিজে ওঠে।

এদিকে ছেলের দল গাড়ি নিয়ে হাজির।

প্রভাত ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, আবার গাড়ি কেন?

তরুণ প্রাণগুলি আজ ভাবাবেশে পূর্ণ—আবেগে ফুটছে যেন। ওরা বলল, প্রভাতদা, অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ আজ আপনাকে আমরা প্রসেশন করে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাব। জানিয়ে দেব সরকারকে, তোমাদের নীতিকে দেশের লোক ঘৃণা করে।

স্মিতহাস্যে প্রভাত বলল, তা জানাবার আরো অনেক সুযোগ আসবে তোমাদের জীবনে, এত সামান্য কারণে শক্তির অপচয় করা ঠিক নয়। চল, আমরা হেঁটেই সকলে যাই।

তখন তাদের রুদ্ধ আবেগ বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যেই মুক্তি পেল।

দু'বছর পরে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এই সুন্দর বিশ্বজগৎকে প্রভাতের অপূর্ব মোহময় বলে মনে হয়।

প্রভাতের মনে হয়, কোন দিন এর আগে প্রকৃতির শোভা এমন করে আমাকে মুগ্ধ করেনি। ঐ ভাঙ্গা খড়ের ঘরখানা, পায়ের নীচের ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলি, খোঁড়া ভিখারীটা—সকলেই যেন বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে আমার দৃষ্টিপথে আসছে। পাখীর কণ্ঠে যে এত সুষমা তা আজই যেন আমি প্রথম উপলব্ধি করছি।

অভূতপূর্ব এক সুখানুভূতিতে রোমাঞ্চিত হয় প্রভাত।

বাড়ী প্রবেশ করেই দেখতে পায় দাদুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি।

আরাম-চেয়ারে বসে আছেন সত্যপ্রসন্ন, মুক্তির হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে মহামায়া। প্রভাত সত্যপ্রসন্নকে প্রণাম করতে, দুর্বল শীর্ণ

হাতখানা আশীর্বাদে পূর্ণ করে মাথায় রাখেন। আনন্দে চোখ সজল হয়ে ওঠে। তারপবে মহামায়াকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে তিনি ছেলের মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করেন।

মুক্তিকে দেখিয়ে মহামায়া বললেন, এটি কে বল তো, প্রভাত।

প্রভাত একটু হেসে কোলে তুলে নেয় নিজ কন্যাকে।

মুক্তি বড় বড় ছুটি চোখে তাকিয়ে থাকে অপরিচিত পিতাব পানে।

অচেনা বাবাব চেয়ে চেনা ঠাকুমার কোলেই তার যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। কান্নাব পূর্বাভাষ লক্ষিত হয় ওর কচি ঠোঁট ছুখানিতে। হাত বাড়িয়ে দেয়, ঠাকুমার কাছে যাবাব জন্যে।

প্রভাত একটু আদর কবে মার কোলে দিয়ে দেয়। তারপবে দাছুব সঙ্গে বসে গল্প কবে।

সত্যপ্রসন্ন বললেন, বৌমা, প্রভাতেব জলখাবাব এখানেই নিযে এসো।

তাই দিচ্ছি বাবা। বলে, মহামায়া চলে যান।

দীপ্তি আজ বান্নার ব্যাপার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে সর্বক্ষণ। প্রভাতের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই, লজ্জা জড়িয়ে ধরছে ওর সর্বাঙ্গ।

বহু দিন পরে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে প্রভাতের সব কিছু নতুন মনে হয়। অনেক দিন আগে মহামায়া উল দিয়ে কার্পেটের উপর একটি হাতী তৈরী করেছিলেন, সে ছবিখানা বহুদিন যাবতই ওঘরে টাঙ্গানো আছে, আজ সেই ছবিখানা দেখে প্রভাতের মনে হলো, এটা আবার কবে হলো! এমন কি বিয়ের পরে জোড়ে ওদের ফটো তোলা হয়েছিল, সেখানা দেখেও যথেষ্ট অবাক হলো। কিন্তু দৃষ্টি আটকে গেল মুক্তির এক বছর বয়সের ফটোখানার উপরে। এত সুন্দর শিশু আর কখনও দেখেছি কি!

এমন সময় সে ঘরে কি একটা জিনিস নিতে এসে দীপ্তি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রভাত কাছে এসে খপ করে ওর হাত দুটি ধরে ফেলে বলল, বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কখন এসেছি, দেখাই নেই।

প্রভাতের কামনামদির দৃষ্টি দীপ্তিকে রাঙ্গিয়ে দেয়। অদূরে মহামায়ার কণ্ঠস্বর শুনে দীপ্তি ছটফট করে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। প্রভাত একটু হাসে। আজকের দিনটি প্রভাতের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন করে যেন কোন দিনটি তাব কাছে পরিপূর্ণ রূপে ধরা দেয়নি।

মহামায়া এসে মুক্তিকে প্রভাতেব কাছে বসিয়ে দিয়ে বললেন, নে, মেয়ের সঙ্গে একটু ভাব কর। কি বলে জানিস ? কে এসেছে থা'মা ? তোমার বাবা।—শুনে খুব খুশী। আমাল বাবা—আমাল বাবা করে এতক্ষণ লাফাচ্ছিল দেখ না। ভারী দুষ্ট হয়েছে। দেখ-না-দেখ রাস্তায় পালিয়ে যায়। একদিন কবরেজ মশাই দেখতে পেয়ে কোলে তুলে নিয়ে এসেছেন। তোর দাদু তো বকে সকলকে ধুইয়ে দিলেন। সেদিন থেকে গেটে তালা পড়েছে। আমি বলেছিলাম বাবাকে, তালা যে লাগিয়ে দিলেন গেটে আপনার কাছে এসে না কেউ ফিরে যায়। তা শুনে বাবা বললেন, এখন আমার কাছে যে আসবে তার গতি তালায় আটকাবে না।

তার মানে ?

তার মানে যম।

প্রভাত হাঃ হাঃ করে হেসে ফেলে।

প্রভাত একটি পুতুল তাক থেকে পেড়ে মেয়ের হাতে দিয়ে ভাব জমাতে চেষ্টা করে। একটু পবে দেখা গেল, বাপ এবং মেয়ে এত দিনের ব্যবধান অতিক্রম করে খেলায় মেতে উঠেছে।

বিগত দিনের চিন্তায় বীণা তন্ময় হয়ে আছে।

নিবারণ দারোগার অভিসন্ধি যে এমন করে সফল হবে, তা যদি

একটুও বুঝতে পারতাম! প্রায় ছ'মাস আগে থেকে জাল বিস্তার করেছে। তারও আগে অমিকে যেদিন নিয়ে গেল জেলে, সেদিন ওর চোখে আমি কামনার আগুন দেখে চমকে উঠেছিলাম। তখন কি জানতাম খদ্দরের শাড়িওয়ালা লোকটি ওরই প্রেবিত দূত! সরল প্রকৃতির লোক বলে লোকটাকে ভেবেছি—কোন সন্দেহের ছায়া মনে পড়েনি। কত শাড়ি ওব কাছ থেকে কিনেছি। আপনভোলা পাগলা প্রকৃতির লোকটি ঘনিষ্ঠ হলো সহজেই! কখন আমাদের অলক্ষ্যে অনিলের দেরাজে পিস্তল বেখে গেছে, কেউ জানতেই পারিনি।

এ সবই প্ল্যান কবা। যেদিন অনিলকে জেলে নিয়ে গেল, আহা সেদিন ওর চোখে কী অসহায় করুণ দৃষ্টি ছিল! ঠিক বলির পশুর চোখের দৃষ্টির মত। আমার বুকে যেন সে-দৃষ্টি আটকে রইল। সে-দিনই প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, যেমন কবেই হোক, অনিলকে আমি মুক্ত করে আনবোই। টাকা দিয়ে যত দূর সম্ভব তা আমি কসুর কবিনি। কিন্তু দারাগা সাহেবেব দাবী ছিল অন্য। কি যে, তা বুঝতে আমাব দেরী হলো না।

ভাবলাম, নারীর চরম এবং পরম অস্ত্র ছলনা, তাই দিয়ে যদি লোকটাকে ঘায়েল করা যায় মন্দ কি! নিজেই চায়ের নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠালাম দারোগাকে। তারপরে আসা-যাওয়া চলতে লাগল। সাজে সজ্জায়, লাস্যে ওকে চঞ্চল করে তুললাম। পুরুষকে জয় করবার বাসনা নারীর চিবন্তন। মূর্খ আমি, সেদিন বুঝতে পারিনি, পুরুষের কামনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তুললে সে আগুনে নিজেকেও দগ্ধ হতে হয়।

চায়ের সঙ্গে চলতে লাগল গল্প। সেদিনের চায়ের আয়োজন ছিল একটু বিশেষ রকমেব। গল্পের ফাঁকে আমি বললাম, আজ একটা অনুরোধ করবো—বলুন রাখবেন?

দারোগার হা-হা করে সে কী হাসি! তারপর বললেন, আপনার অনুরোধ আমি ঠেলতে পারি, একথা আপনি বিশ্বাস করেন!

দারোগার হাসির শব্দটা যেন আমার অস্থিপঞ্জর ভেদ করে বুকের মধ্যে প্রবেশ করল। মনে হলো এ যেন বন্য পশুব উল্লাস।

দারোগা সাহেব ভারী জুতার শব্দ তুলে খালি সিগাবেটেব বাক্সটা ফেলতে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমার চোখে বিশ্বের সবটুকু আলো যেন মুহূর্ত মধ্যে মুছে গেল। শুধু শুষ্ক কণ্ঠের একটি আর্ত চিৎকাব, এ কী। কিন্তু সবল বাহুব নিষ্ঠুর পীড়নে আমাব সব আকুতি ভেসে গেল। যাবার সময় নিবারণ দাবোগা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, অনিল শিগগিরই মুক্তি পাবে। প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন দাবোগা। যে অনিলেব জন্যে আমি নাবীব পবম গৌরব বিসর্জন দিলাম, সে যখন বাড়ী এলো তাকে কিন্তু আব দিতে পারলাম না নিজেকে। বাসি ফুলে দেবতার পূজা কি করে সম্ভব। কিন্তু দেবতা সেকথা বুঝল না। ভোগবঞ্চিত দেবতা ক্রমেই বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন এসে আমাকে অনিল বলল, বীণা, নিবারণ দাবোগা আমাকে যে কি সুচক্ষেই দেখেছে জানি না। আজ ডেকে বললেন, অনিলবাবু সাব-ইনস্‌পেক্টাবের পদের জন্য একটা দবখাস্ত করুন। আমি আছি, হয়ে যাবে।

হলোও। নতুন চাকরী পেয়েছে অনিল। মন খুশীতে টলোমলো, সেখানে সে কোন ফাঁকি সহ্য কবতে চায় না। তার কামনাব আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, আমি দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু, কিছুতেই নিজেকে সে আগুনে আহুতি দিতে পাবছি না। ঠিক করে ফেললাম আত্মহত্যা করবো। আমাদেব উঠানে প্রকাণ্ড বড় একটা করবী ফুলের গাছ আছে, অসংখ্য ফল পড়ে থাকে তলায়। এতদিন ও-গাছটা সম্বন্ধে আমি উদাসীন ছিলাম। ওর হলদে কলকের মত ফুল আমার তেমন পছন্দ ছিল না। এখন ঐ গাছটাকে আমার পরম বন্ধু মনে হলো। লুব্ধ দৃষ্টিতে ওর বাদামের মত শক্ত ফলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি।

একদিন এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে

ঐ ফুলের গোটা কিছু এনে বেটে লুকিয়ে রেখে দিলাম। রাত্রে শোয়ার আগে কিছু দুধ মিশিয়ে খেয়ে ফেলব। ব্যস! সব সমস্যার সমাধান। অনিল আবার বিয়ে করবে, নিশ্চয়ই সুখীও হবে। সেদিন রাত্রে অনিল আর আমি একসঙ্গে খেলাম। বাড়ীর ঝি-চাকর মুখ টিপে হাসল। আমার সেসব লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা নয় তখন।

দেবতার মত রূপবান স্বামী, মনকে কেবলই পিছনে টানে। বাবার কথা বার বারই মনে পড়তে লাগল।

অনিল এখন আলাদা খাটে শোয়। কিছুক্ষণ ছটফট করে ঘুমিয়ে পড়ল। রোজই প্রায় এ রকম হচ্ছে।

যখন ওর ঘুম বেশ গভীর হয়েছে এবং নাক থেকে চাপা শব্দ বের হচ্ছে, তখন আমি পা টিপে টিপে গিয়ে ওর মাথার কাছে বসলুম। নীরবে তাকিয়ে রইলাম, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। গলার কাছের অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক পদার্থটাকে আঁচল দলা করে বুকের ভিতরে চালান করে দিলাম।

যখন মনকে দৃঢ় করে অনিলকে একটি প্রণাম করে পিছন ফিরছি, তখন আমার দৃষ্টি পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো নরকের একটি দৃশ্য আঁকা ছবিখানার উপর।

যমরাজ অনুচর সহ একটি পাপীকে শাস্তি দিচ্ছেন। প্রকাণ্ড কড়াইতে তপ্ততেলের মধ্যে ফেলে খুন্তি দিয়ে চেপে ধরেছে। লোকটির ভয়ার্ত যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি আমার সংকল্পের ভিতে সজোরে আঘাত করল। নরকের বিভীষিকা আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল। এত দিনের সংস্কারকে এক চুলও নড়াতে পারলাম না। ছবিখানার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভোর হয়ে গেল।

আমি রক্ষা পেলাম বটে, কিন্তু অনিল দ্রুত তলিয়ে যেতে লাগল, অধঃপতনের শেষ সীমায়। আমি রইলাম নীরব দর্শকের ভূমিকায়। পুলিশ-জগৎটা যে এত নোংরা তা আগে আমার এমন করে জানা ছিল না।

অমির জেল থেকে বের হতে এখনও কয়েক বছর দেরী আছে। ও যে এসব দেখে কি মনে করবে জানি না। সমস্ত ঘটনাটার জন্যেই আমার নির্বুদ্ধিতা দায়ী।

প্রতি দিনের মতই আজও সুব্রত দিবারাত্রির কাজ সমাপ্ত করে বসেছে বুলুর ফটোর সম্মুখে বেহালাখানা নিয়ে। সুব্রতর ডাক্তার পরিচয়ই সব নয়—সে একজন শিল্পীও। যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে তেমন বেহালা—দুটোতেই দখল অসামান্য।

গভীর নিশুতি রাত্রে বেহালার বুক থেকে যেন ব্যথা ঝরে পড়তে লাগল। করুণসুরের মূর্ছনায় ঘরের পরিবেশ যেন বড় বেশী নিস্তব্ধ মনে হলো। এই সময় সুব্রতর মনখানা শুধু বুলুকে কেন্দ্র করেই ঘুরে মরে। হাজার হাজার মাইলের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে সুর তাকে নিয়ে যায় বেলার মনের কাছে। তন্ময় হয়ে বাজিয়ে যায় শিল্পী সুব্রত। এমন সময় মনে হলো দরজায় কে যেন আঘাত করল। মুহূর্তে তন্ময়তা মিলিয়ে গেল সুব্রতর।

দরজা খুলে এত রাত্রে প্রভাতকে দেখে বিস্মিত সুব্রত প্রশ্ন করল, এত রাত্রে তুমি প্রভাত!

কথা বলার সময় নেই সুব্রত, শিগগির চল, দাদু যেন কি রকম করছেন।

সুব্রত প্রভাতের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সত্যপ্রসন্নর নাড়ি দেখে সুব্রতর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সুব্রতর মুখ দেখে প্রভাতের আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না। বুকের মধ্যে বসে কে যেন কঠিন পীড়নে শিরা-উপশিরাগুলি মুচড়ে দিচ্ছে।

মহামায়া চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মায়ের মৃত্যু দীপ্তির তত ভাল মনে নেই, কিন্তু দাদুর মৃত্যু ওর জীবনের মর্মমূলে গভীর ক্ষত রেখে গেল। কোন দিন আর সে-ক্ষত

পূরণ হবে বলে মনে হলো না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সত্যপ্রসন্ন নাতির কোলে মাথা রেখে, গীতার অমর বাণী পাথেয় করে আনন্দলোকে চলে গেলেন। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঞ্চয় পড়ে রইল। ছিন্নমূল গাছের মত নেতিয়ে পড়ল সংসারটি।

প্রভাত দাদুর শ্রাদ্ধ করল খুব ঘটা করে। শহরের অনেককেই বলতে শোনা গেল, নাঃ, এমন সমারোহ এবং পূর্ণাঙ্গ শ্রাদ্ধ বরিশালে ইতিপূর্বে কমই হয়েছে। নাতির উপযুক্ত কাজই করেছে প্রভাত। সত্যপ্রসন্নব নাতি-ভাগ্যে সেদিন অনেক বৃদ্ধই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে যেতে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রভাত ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্মসাগরে।

সব দেখে মহামায়া ভীত হলেন। বললেন, প্রভাত, তোর কি এখন এরূপ দেশের কাজ শোভা পায়? তোব মুখেব পানে চেয়ে আমরা তিন তিনটে প্রাণী। তা ভুললে চলবে কেন বাবা।

প্রভাত একটু হাসল।

মহামায়া এ হাসি চেনেন, তাই আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি জানেন, প্রভাত যা অন্যায় অনুচিত মনে করেছে—তার বিরুদ্ধে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত লড়বেই। প্রভাত একটা কথা প্রায়ই বলে, অন্যায়কে সহ্য করা তো কম অন্যায় নয়।

মহামায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেব কাজে চলে গেলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, লবণ-আইন ভঙ্গ করা নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হলো। নেতৃত্ব দিলেন, গান্ধীজী।

প্রভাত এত বড় সুযোগ ছাড়ল না। মেদিনীপুর গিয়ে যোগ দিল নেতাদেব সঙ্গে। এবং তার পরিণাম কারাবরণ। পাঁচ বছর জেল হলো প্রভাতের।

মহামায়ার সংসার ঢেকে ফেলল নিবিড় অন্ধকার। আর্থিক সংকট

এবং অভিভাবকের অভাব, মহামায়াকে গভীর চিন্তায় ফেলল। এ খবর শুনে দীপ্তিকে নিয়ে গেল ওর ভাই এসে। মহামায়া রইলেন শূন্য বাড়ীটাতে উমাচরণকে নিয়ে।

বীণা এখন পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকে, বড় একটা কোথায়ও যায় না। বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি গতানুগতিক চলে যাচ্ছে। সুব্রত রোজই একবার করে এসে মহামায়ার খোঁজখবর নিয়ে যায়। সেই সময়-টুকুই মহামায়াব যা ভাল লাগে। ওর কাছেই শুনতে পান, দেশের বর্তমান অবস্থার কথা। মহামায়া ভাবেন, সুব্রত হলো নীরব সাধক; বাইরে কোন আড়ম্বর নেই।

উমাচরণ একখানা চিঠি এনে মহামায়ার হাতে দিল। পড়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান, বৌমাব বাবা হঠাৎ মারা গেছেন। ভগবান, বিপদ কি এমনি করেই আসে! আহা রে, বৌমাদেব বাপের বাড়ীর লোকদেব এখন কি করে চলবে সংসার! মাত্র একটি ভাই সবে চাকরীতে ঢুকেছে। তার আয়ে কখনও গোটা সংসারটা চলে! তার উপর বৌমা, বোঝাব উপরে শাকের আঁটি—না, দেখছি বৌমাকে যত শিগগির সম্ভব নিয়ে আসাই উচিত। তাছাড়া আমারও আব দিন কাটে না একা একা।

এমন সময় সুব্রতর গলা শোনা গেল, মাসীমা কোথায়—।

এই যে বাবা, এসো।

প্রভাতের কোন চিঠি পেয়েছেন?

দিন সাতেক আগে একখানা পেয়েছি।

আমি চিঠিটা হাতে দেখে ভাবলাম, প্রভাতেব বুঝি।

না বাবা। বৌমা লিখেছেন, বড় দুঃসংবাদ, ওব বাবা নাকি হঠাৎ মারা গেছেন।

দুঃখিত হয় সুব্রত, চোখের উপর ভেসে ওঠে, সুস্থ সুগঠিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেহারাটা। মনে হয়, এখনও আমাদের অনেক জানার বাকী। বিজ্ঞানকে আরো অনেক অনেক এগিয়ে যেতে হবে।

এই হঠাৎ মৃত্যু রোগটা এখনও আমরা ঠিক ধরতে পারছি না।

মহামায়া প্রশ্ন করেন, কি ভাবছ সুব্রত ?

সুব্রত একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, ভাবছি আমাদের কেবল শুধু স্বাধীনতা অর্জন করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না—জানতে হবে অনেক কিছু। এই যে সুস্থ সবল মানুষগুলি হঠাৎ হঠাৎ মাবা যাচ্ছে, তা নিয়ে অবশ্য ইয়োরোপের বিজ্ঞানসাধকরা খুবই গবেষণা করে যাচ্ছেন—কিন্তু, কারণটি এখনও আয়ত্তের বাইবে।

ঐ কথার পিঠে মহামায়া বললেন, ও দেশ তো অনেক কিছুই কবছে, কিন্তু ভারত যেই তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে।

না মাসীমা, ভারতেরও অগ্রগতি শুরু হয়েছে, তবে আরো দ্রুত হওয়া উচিত। দেখবেন, স্বাধীনতার পরে গতিবেগ নিশ্চয়ই বাড়বে।

একথা সেকথার পরে সুব্রত চলে গেল। আর মহামায়ার মনে চিন্তার কীটগুলি আবার দংশন কবতে লাগল।

প্রাতঃরাশের পর সুব্রত ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। এই সময়টা ওর বিনা পয়সায় রুগী দেখার সময়। এর মধ্যে অনেক রুগী এসে গেছে।

প্রথমেই নজর পড়ল সুব্রতর হবিচরণদের আট বছবেব হ্যাবা হওয়া শিশুটির প্রতি। এত অল্প দিনে ওর এই রকম উন্নতি হয়েছে দেখে খুশী হলো।

হরিচরণ ছেলে দিয়ে সুব্রতকে প্রণাম করিয়ে বলল, ও ছেলে চিরদিন আপনার চরণে কেনা হয়ে রইল।

সুব্রত ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করে বলল, আর কোন কষ্ট নেই তো ?

ফিক করে ছেলেটি একটু হেসে, মাথা নেড়ে জানাল, না তার কোন কষ্ট নেই।

তারপরে আসে একজন অপরিচিতা মহিলা। তার কোলে ছ'তিন বছরের একটি শিশু। শিশুটির মাথার এক অংশ অনেকখানি ফোলা।

মহিলাটি ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, গরীবেব মা-বাবা আপনি, আমার ছেলেটিকে ভাল কবে দিন।

সুব্রত দেখে বলল, কতদিন এবকম হয়েছে?

প্রায় ছ'মাস। প্রথমে সামান্য একটু ফুলেছিল, ভাবলাম সেরে যাবে, কিন্তু তা নয়, ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

সুব্রত বলল, মনে হচ্ছে টিউমার, অপারেশন দরকার হবে।

অপাবেশনের নাম শুনেই মহিলা কেঁদে ফেলল। তারপরে সুব্রত বুঝিয়ে বলতে চুপ করল। এই রকম নানা ধবনের রুগী দেখে যখন উঠবে সুব্রত, তখন এল শ্রীনাথেব পরিবার, তাবা।

সুব্রতর পায়েব ধুলো নিয়ে একটু মাথার কাপড় টেনে মুখ নীচু করে বলল তাবা, কাল একবার এসে ফিবে গেছি।

শুনেছি মধুব কাছে, কিছু দরকার আছে নাকি?

তারা একটু ইতস্ততঃ করে কথাটা বলল, আপনি তো আমাদের জন্যে এত বছব থেকেই করে আসছেন, সেই খোকার বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে।

কথা বলতে বলতে তারা সুব্রতর মুখের দিকে তাব বড় বড় চোখে তাকাল।

সুব্রতর মনে হলো, তারা কোন বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই এসেছে। এরকম খোলাখুলি মুখের দিকে তাকাতে তাকে আগে দেখিনি। দাঁড়ানোর ভঙ্গীটিও বেশ ঋজু।

তারা বলতে লাগল, এখন আমার মনে হয় আমার কিছু করা উচিত। ছেলেটাও একটু বড় হয়েছে—কাজ কবতে কোন কষ্ট হবে না। তাছাড়া একটা কাজের খোঁজ পেয়েছি আমি।

বেশ তো, দেখ চেষ্টা করে যদি হয়। কি ধরনের কাজ? আর খোঁজ পেলে কার কাছে?

গুরুচরণ কাকার ছেলে হারু, সে তো পুলিশ সাহেবের মটর ড্রাইভার, খোঁজটা সে-ই এনেছে। বলছিল, সেখানে নাকি আমার আয়ার কাজ হতে পারে। ত্রিশ টাকা মাইনে দেবে, আমি আর আমার ছেলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানে হবে।

সুব্রত বলল, সাহেববাড়ীব কাজ করতে পারবে? তাছাড়া ওরা লোক কি রকম হারু জানে?

হ্যাঁ। হারু তো খুব সুখ্যাত করে।

সুব্রত বলল, বেশ তো, নিজের ব্যয় যদি নিজে উপার্জন করে চালাতে পাব, সে সুখের কথা।

এবাবে একটু সঙ্কুচিত দেখায় তারাকে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিতে হবে, ডাক্তারবাবু। একখানা কাপড় কিনবো আমার জন্যে আর খোকার জন্যে একটা পিরান।

সুব্রত ব্যাগ খুলে পাঁচটা টাকা ওব হাতে দিয়ে চলে গেল।

বাড়ী এসে জামা খুলতে খুলতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, টেবিলে কয়েকখানা চিঠি পড়ে রয়েছে।

মধু জুতোর আওয়াজ পেয়েই বলল, দাদাবাবু, তোমার কতগুলো চিঠি টেবিলে রেখে দিয়েছি।

তু'খানা চিঠি কোন ওষুধ কোম্পানীর। পোষ্টকার্ডখানা দাদার। বাবার শরীর নাকি আবার খাবাপ হয়েছে, যেতে লিখেছেন। আর একখানা চিঠি প্রভাতের। যাক, এত দিনে প্রভাতের আমাকে মনে পড়েছে। সবসর করে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল।

প্রিয় সুব্রত,

জেলের নিষ্করুণ বৈচিত্র্যহীন দিন একটির পর একটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাই এখানে আমার একমাত্র সঙ্গী। আর ঔৎসুক্য জাগায় মাঝে মাঝে এখানকার লোকদের বিচিত্র চরিত্র।

দেশের জন্য যাঁরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে

কারাবরণ করেছেন, তাঁরাও সামান্য একটা ডালের পোড়ালঙ্কার জন্যে কোঁদল করেন। এসব দেখে আমার শুধু মনে হয়, বিশ্ব একটি বিরাট পাঠশালা। যেখানে যাবে সেখান থেকেই কিছু নতুন পাঠ নিতে পারবে।

তাই বদ্ধ জীবন আমাকে উতলা করে তোলে। নানা কর্মের মাঝে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নিজেকে নতুন করে দেখতে সাধ যায়। হোক না তা যতই বিপদসঙ্কুল। উত্তাল জীবনতরঙ্গে বুক পেতে দিতে আমি আনন্দ পাই।

আজ দেশের মধ্যে নানা বিভেদ, দলাদলি ও সংকীর্ণতা, নেতাদেব জীবন আত্মকেন্দ্রিক। দলীয় স্বার্থেব তলায় পিষ্ট হচ্ছে জাতীয় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং জনমত। কিছুদিন আগে নেতাজীর একখানা চিঠি পেয়েছি। সেই সঞ্জীবণী বাণী আমার সঙ্কল্পেব প্রেরণা। এ আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম কিশোর বয়সে। আজও এ আমার জীবনেব একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌছতে অনেক দুঃখ বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্যে আমি সর্বদাই নিজেকে প্রস্তুত রাখি। আমার এ ঘটনাবহুল জীবন যেদিন শেষ হবে, সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর হৃদয়ে আমার স্থান একটু হবে কি না—তা জানে ভবিষ্যৎ। আমার মনে হয়, জাতি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাব পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভবই নয়।

যদিও তোমার এবং আমার চলার পথ স্বতন্ত্র, তবুও তুমিই আমার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু।

তোমার কর্মজীবনে কখনও উত্তাল তরঙ্গ ওঠে না—কিন্তু অগ্রগতি তার থাকে অব্যাহত। তোমার মহান প্রচেষ্টা সফল হোক। মাকে বলবে শিগগিরই মাকে চিঠি দেব।

তোমার প্রভাত।

চিঠিখানা দু'বার পড়ল সুব্রত। প্রভাতের দুর্বার আকাঙ্ক্ষার

প্রচণ্ড ঢেউ এসে যেন ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে আঘাত করল। প্রভাতের সান্নিধ্য যেন বড় কাম্য মনে হলো।

এমন সময় দরজায় খুট করে একটু শব্দ করে মধু এসে দাঁড়াল।

জিব দাঁত দিয়ে কেটে মধু বলল, দাদাবাবু, একেবারে বলতে ভুলে গেছি, বীণা দিদিমণি এসেছিল, বিকেল চারটার সময় আসবে বলে গেছে। তুমি যেন বাড়ী থেকো তখন।

সুব্রত স্বগতোক্তি করে, হঠাৎ বীণা! বহুদিন তো আসে না। প্রশস্ত ললাটে কৌতূহলের গুটিকয়েক কুঞ্চিত রেখা আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু তা ক্ষণিকেব জন্য। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রামলাভের আশায় বিছানায় ছড়িয়ে দেয় নিজেকে।

ঘড়িতে তিনটে বাজাব শব্দ হতেই সুব্রত উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে কয়েকখানা দরকারী চিঠি লিখতে বসে। বেশ কিছু সময় পবে, দরজার ওপিঠ থেকে কে যেন বলল, সুব্রতদা, আসতে পারি?

আবে এসো এসো, ব্যাপার কি বলো তো? একেবারে খবর-টবর দিয়ে—

বীণার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রত কথার মাঝ-পথেই থেমে গেল।

চিন্তিত স্বরে বলল, কোন অসুখ করেছে নাকি তোমার?

সুব্রতর কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ল; কিন্তু সেই শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী চপল মেয়েটিকে, আজ আর এই বীণার মধ্যে খুঁজে পেল না। তার স্থান দখল করেছে, চিন্তাক্লিষ্ট স্থূলাঙ্গী এক মহিলা।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো বীণা।

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীণা সামনের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। কিন্তু কেন যে এসেছে সে কথাটা বলতে কিছুতে যেন পারছে না। না বলতে পারার অব্যক্ত যন্ত্রণায় ঠোঁট দু'খানা একটু একটু কাঁপছে। যেন সুব্রতর বিচারের উপরই নির্ভর করছে ওর জীবন-মরণ।

নীরবতা ভঙ্গ করে সুব্রত বলল, বীণা, কিছু কি বলবে আমাকে ?

বীণা চমকে ওর দিকে তাকাল, তারপরে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। ও কিছু বলতেই এসেছে।

সুব্রত বুঝতে পারছে যে, এমন কোন বিষয় যা বলতে বীণার শালীনতায় বাঁধছে। তাই সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, অমির সম্বন্ধে কিছু বলবে কি ?

বীণা এতক্ষণের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংহত করে বলল, তোমার সঙ্গে শিগগিব দেখা হয়েছে কি অমির ?

সুব্রত হালকা হেসে বলল, শিগগিব আর কোথায় ? সকলেই যার যার ধাঁধায় ঘুবে বেড়াচ্ছে।

সে যাক্‌। সুব্রতদা, আজ আমাব নিজের কথাই বলতে তোমার কাছে এসেছি। আমার দৃঢ বিশ্বাস একমাত্র তুমিই বলতে পাববে, আমাব এখন কি কবা উচিত। হ্যাঁ, কোন দ্বিধা করে নয়, অকপটেই তোমাব কাছে আমাব লজ্জার কাহিনী বলব। পরবর্তী জীবনের পথ তোমার আদেশানুসারে নির্বাচন করবো।

সুব্রত সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কি বলবে বলো তো। আমার তো ভাই ভয়ে নাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

বীণাব মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি খেলে যায়। একটু স্তব্ধতার পরে বীণা নিজেকে কঠিন করে নিয়ে, অমিতাভকে জেলে নিয়ে যাওয়ার দিন থেকে নিবাবণ দাবোগার সঙ্গে শেষ দিনের অতি লজ্জাকর ঘনিষ্ঠতার পুনরাবৃত্তি করল। এতক্ষণ যেন বীণা বিকারের ঝোঁকে এসব বলে গেছে, এখন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল।

নতমুখী বীণাব দিকে তাকিয়ে সুব্রত বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হয়ে গেল। মনে হলো, বীণার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই অবিশ্বাস্য কথাগুলি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে!

একটু পরে বীণা মুখ উঁচু করে বলল, দেখো সুব্রতদা, এত বছর পরে আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে তোমাকে ব্যথিত করতে

আমি আসিনি—এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল প্রশ্নের—তার সমাধানের জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। অনিল একটি বিধবা মেয়ের প্রতি আসক্ত অনেক দিন থেকে, তার গর্ভে দুটি ছেলে হয়েছে। এখন অনিল চায় তাকে বিয়ে করে আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে নিয়ে আসতে। সেটা আমাব এবং অমির কারুরই মত নয়।

বেশ তো, অনিলকে সেকথা তোমরা বুঝিয়ে বলো। তোমাদের বাবার বাড়ী, তোমাদের মতের বিরুদ্ধতা করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।

বীণা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, বাবার উইলের সাহায্যেই তা সম্ভব হবে। বাবা তাঁব স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ছেলে এবং জামাইয়ের নামে উইল করে গেছেন। তিনি মনে কবেছিলেন, মেয়েকে অর্ধেক সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে গেলে, জামাই সে সম্পত্তি ভোগ করতে অপমানিত বোধ করবে। এবং সেই কারণে মেয়েব ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে না। জামাইকে দিয়ে গেলে, মেয়েরই রইল—তাঁর সরল বুদ্ধিতে এটাই বুঝেছিলেন। তবে উইলে একথা আছে—যদি আমাব দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করে তবে সে-ই আমার সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হবে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

শেষের কথাটা বীণার বড় উদাস শোনাল।

কিছু পরে সুব্রত বলল, তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, পৃথিবীটাকে ঠিক চিনতেন না। ভাবতেন, স্বামী এবং সন্তান এদের সম্পত্তি নারীর ভোগে আসবেই।

বীণা যেন স্বগতোক্তির মত বলল, সেই অনিল আর এখনকার অনিল কি এক? কত সেবা করেছে বাবার। বাবা শেষ সময় অমির চেয়েও অনিলকে বেশী ভালবাসতেন। তাই অসুস্থ শরীরে দুর্বল মুহূর্তের ভাল লাগাকেই কালি কলমে পাকা করে রেখে গেছেন।

তারপরে বীণা সুব্রতর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, আচ্ছা সুব্রতদা, এই বিধবার অবৈধ সন্তান আমার দাদা-

মশায়ের পবিত্র বংশের উত্তরাধিকার পাবে, এত বড় অন্যায় রোধ করা যায় না ?

সুব্রত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, না। আইন যখন ওদের পক্ষে, বাধা দেওয়ার আমাদের জোব কোথায়।

বীণা ডুবে যেতে যেতে যে অবলম্বনটুকু আঁকড়ে ধবেছিল, সেটুকুও যেন এইমাত্র তাব হাত ফসকে সরে গেল।

নৈরাশ্যভরা দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে শ্লথ পায়ে সে চলে গেল।

দীপ্তি এবং মুক্তি আসায় মহামায়ার অন্ধকারময় জীবনেও একটু আলো জ্বলল। মুক্তি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, ঠাকুরমাব সঙ্গে দিব্য গল্প জমাতে পারে।

প্রভাত শিগগিরই ছাড়া পাচ্ছে, তাই নিয়ে দিদি নাতনীর কতই জল্পনা-কল্পনা। দীপ্তির পাণ্ডুব মুখখানাও ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রভাত আসাব আগেব দিন সন্ধ্যাবেলা দীপ্তি মহামায়াকে বলল, মা দেখুন তো আমার জ্বব হয়েছে নাকি ?

কপালে হাত রেখে আঁৎকে উঠলেন মহামায়া, গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে বৌমা।

ম্লান স্তিমিত একটু হাসি দীপ্তির শুষ্ক অধরে খেলে যায়।

শিগগির শুয়ে থাক গিয়ে বৌমা। ঠাণ্ডায় ঘোরাঘুবি করো না। যেমন আমার অদেষ্ট, কাল আসবে প্রভাত, আজ তোমার জ্বর হলো।

পরের দিন প্রভাত জেল থেকে বাড়ী এসে বলল মাকে, এ কি, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন ?

মুক্তি বলল, মার যে খুব জ্বর বাবা।

আচ্ছা ! কবে হলো ?

মহামায়া বললেন, কালই হয়েছে।

ধীর পদক্ষেপে পাঁচ বছর পরে প্রভাত তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

দীপ্তি তার জ্বরের যন্ত্রণা ভুলে ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রভাত কপালে হাত দিয়ে একটু ভ্রূ কুঁচকালো। নাঃ, জ্বর বেশ বেশী।

প্রভাত দীপ্তিকে বলল, আমি এখুনি আসছি সুব্রতকে নিয়ে।

না, তুমি একটু বসো আমার কাছে। দীপ্তি জ্বরতপ্ত হাতে প্রভাতের হাত চেপে ধরল। প্রভাত কাছে এসে ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। কারুর মুখে কথা নেই। পাঁচ বছরের উপেক্ষিত কামনা হাতের মুঠোয় গলে গলে পড়তে লাগল।

আবেগ একটু কমে এলে প্রভাত বলল, ভারী রোগা হয়ে গেছ এই ক' বছরে।

আর তুমি? জেলে কি কোন দিন আবশিতে নিজেকে দেখনি? না, সে সময়টুকুও ছিল না—কেবল দেশের কথাই ভাবতে বুঝি?

যদি বলি তোমার কথাও। কি, বিশ্বাস হলো না বুঝি?

আস্তে একটি টোকা দেয় প্রভাত দীপ্তির শরমে রাঙ্গা গালে। তাবপবে, এখুনি আসছি আমি, বলে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

দরজাব সামনেই মুক্তির সঙ্গে দেখা।—এই যে মা-মণি, আবাব একখানা শাড়ি পরা হয়েছে।

বাঃ! বড় হইনি বুঝি। এই দেখ বাবা, আমাদের পুকুরপাবেব চারা জাম গাছে এবারেই প্রথম জাম হয়েছে, তোমাব জন্যে এনেছি, খেয়ে দেখ।

তুমি বুঝি আমাকে দেখেই জাম কুড়োতে গিয়েছিলে! বোদে ঘুরো না, দেখছ না মার জ্বর হয়েছে!

মার হয়েছে বলে আমার হবে না।

সুব্রতকে দেখেই মাহামায়া বললেন, দেখ সুব্রত, আমার কেমন কপাল।

সুব্রত দীপ্তিকে বলল, কই দেখি হাতখানা।

জ্বর তো বেশ বেশীই মনে হচ্ছে। বলে, হাতখানা নামিয়ে রেখে অন্য সব কিছু পরীক্ষা করে প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, পেটেও বেশ গোলমাল আছে, ভোগাবে মনে হচ্ছে। চল, ওষুধটা নিয়ে এসে খাইয়ে দাও।

চিন্তিত প্রভাত সুব্রতর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অনেক দিন পরে মাব হাতের রান্না প্রভাতের বড়ই উপাদেয় মনে হয়। প্রভাতেব তৃপ্তি করে খাওয়া দেখে মহামায়ার চোখে জল এসে যায়—আহা বাছা, কত কষ্টই পেয়েছে খাওয়ার।

এমন সময় মুক্তি কয়েকটি সুপুষ্ট কালো জাম একটা পাথর-বাটিতে নূন দিয়ে মেখে এনে বলল, বাবা, তখন তো খেলে না এখন খাও।

বা রে, এখন যে ভাত খাচ্ছি!

তোমার আর খাবার সময়ই হচ্ছে না—বলে মুক্তি অভিমানে ঠোঁট ফোলাল।

তা দেখে প্রভাত বলল, আচ্ছা দাও খাচ্ছি।

একটা জাম তুলে মুখে দিয়ে বলল, বাঃ! ভাবী মিষ্টি তো।

জাম মিষ্টি হওয়ার সবটুকু কৃতিত্বই মুক্তি আত্মসাৎ করে বলল, বাব্বা! গাছটার পেছনে কি কম খেটেছি! না ঠাকুমা, কতদিন সেনেদের গরুটা এসে গাছটাকে মুড়িয়ে খেয়ে যেত। একদিন লাঠি দিয়ে গরুটাকে এমন মার লাগিয়েছিলাম যে, বাছাধনের একখানা পা-ই খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল।

সেই দিনটির কথা স্মরণ করে মুক্তি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসি থামতে বলল, জান বাবা, এমন হ্যাংলা গরুটা, ঐ খোঁড়া পা নিয়েই আবার খেতে আসতো।

প্রভাত মেয়ের পাকা গিন্নীর মত কথা শুনে মুচকি হেসে বলল,

তুমি তা হলে ওর পেছনে খুবই লেগেছিলে, নেহাৎ গরু বলে মনে কিছু করেনি।

মহামায়া হেসে বললেন, তা তোর মেয়ে কি কম দস্যি, বাছুরটাকে উদ্‌ব্যস্ত করে ছাড়তো।

বা রে, তা না হলে জাম হতো কি করে? এখন যে মজা করে খেলে সে তো আমার জন্যেই।

সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বলে, প্রভাত উঠে পড়ল। তারপর আর একবার যেন রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি না করে এ-কথা কন্যাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

মুক্তি শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াতে জড়াতে বলল, ধ্যেৎ! আমার কখনও অসুখ করে না। সে মার, রোজই অসুখ।

কন্যার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে দীপ্তির প্রথম বয়সের কথা প্রভাতের মনে হলো—ঠিক এ রকম দেখতে ছিল। এখনও যেটুকু অমিল মনে হয়, আরো বড় হলে সেটুকুও থাকবে না।

সাতদিন পরে বোঝা গেল দীপ্তির টাইফয়েড হয়েছে। তখন এ অসুখের বিশেষ করে কোন চিকিৎসা বের হয়নি। যমে মানুষে টানাটানি করে যে পক্ষের জিৎ হতো। রোগী বাঁচলেও অনেকক্ষেত্রে অঙ্গহীন হয়ে বাঁচতো।

প্রভাত চিকিৎসায় কোন ত্রুটি রাখল না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেখানে যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব দিয়ে চিকিৎসা চলতে লাগল। আর সেবা, মহামায়া এবং প্রভাত জীবনপাত করে শুশ্রূষা করে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হচ্ছে না দেখে, মা ছেলে দু'জনেই ভয় পেল। সুব্রত তার যথাশক্তি করে যাচ্ছে এবং মহামায়া প্রভাতকে সাহস দিচ্ছেন—কিন্তু ইদানীং সে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

মুক্তিকে বড় একটা এ ঘরে আসতে দেওয়া হয় না, ছোঁয়াচে অসুখ বলে। তবু ফাঁক পেলেই মুক্তি এসে মার রোগা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চৌদ্দ দিনের দিন অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হলো। দীপ্তির চেতনাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত যেন মৃত্যুর অতিনিকট পদধ্বনি শুনতে পেল।

প্রভাতের হৃৎস্পন্দন অসম্ভব বেড়ে গেল। দীপ্তির নির্বাণোন্মুখ দৃষ্টি প্রভাত সহ্য করতে পাবল না—দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। মহামায়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন দীপ্তির প্রাণহীন দেহের উপর।

বিধাতাব নির্মম অমোঘ নির্দেশ নেমে এলো প্রভাতেব কর্মক্লান্ত জীবনে। দীপ্তিহীন উষব জীবনকে অসহ্য বোধ হলো। বল্‌গাহীন ঘোড়াব মত আপন খেয়ালে নানান কাজে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। তবে আগেব মত সুশৃঙ্খল কাজ যেন হয় না। দুবন্ত একটা আবেগ ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। কাকর চোখের জলেই আর পিছল হয় না চলাব পথ। ছায়া ফেলে না চিত্তে কোন দুর্বল মুহূর্ত। শুধুই ছুটে চলেছে।

মহামায়া শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, ছেলের এই মানসিক অবস্থা দেখে।

মুক্তির ফুঁপিযে ফুঁপিয়ে কান্নায় বুক ভেঙ্গে যায় কষ্টে। অসহ্য এ অবস্থা। সারা রাত মুক্তিকে বুকে চেপে বাখেন। কেমন একটা ভয় যেন তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছে। শুনতে পান তিনি রাত্রে অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দন। তিনি কান খাড়া কবে শোনেন গভীব রাত্রের সেই করুণ বিলাপ। ভোরেব আলো ফুটলে মহামায়া যেন নতুন করে বেঁচে ওঠেন। আবার কল্পনা মুক্তিকে কেন্দ্র করে কত স্বর্গই না রচনা করে।

মহামায়া আজ দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন ছেলেকে কিছু বলার জন্যে। সকালের দিকটাতেই প্রভাতকে যা একটু নিরিবিলিতে পাওয়া যায়।

প্রভাত একখানা কাগজ পড়ছিল, মহামায়া সেখানে গিয়ে ওর পাশে বসলেন। তারপরে বললেন, প্রভাত, তোকে নতুন করে

আমার বলার কিছু নেই। তবু মেয়েটার কথা স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারছি না।

প্রভাত কাগজ থেকে চোখ তুলে বলল, কেন মেয়ের কি হয়েছে?

এত দুঃখেও ছেলের কথা শুনে মহামায়া হেসে ফেলেন—বালাই, ষাট, হবে আবার কি।

তবে তুমি কি বলছিলে?

না, এই বলছিলাম, টাকা পয়সার অভাবে সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। নায়েব মশাই ওদিকে কি করছেন জানি না। টাকার জন্যে লিখলেই লেখেন, কর্তার শ্রাদ্ধে দুটো তালুক বিক্রি করতে হয়েছে, আর যা ছিঁটেফোঁটা আছে, জমিদারের খাজনা দিয়ে, মামলা মোকদ্দমার ঝামেলা মিটিয়ে কি যে থাকে তা তো বুঝতেই পারেন। আপনাদের নারায়ণ পুজোর বাবদ কিছু দিতে হয়। যা-দিন কাল পড়েছে, প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যদি একবার দাদাবাবু নিজে আসতেন তবে ওবই মধ্যে কিছু পাওনা-গণ্ডা আদায় করা যেত।

এখন ভেবে দেখ, আমি না হয় বুড়ো হয়েছি আর কতদিন বাঁচবো। কিন্তু মুক্তির জীবনের এই তো সূচনা। বলতে কি, বেঁচে থাকলে দু-তিন বছরের মধ্যে বিয়েও তো দিতে হবে। তাই বলছিলাম, মেয়েটার মুখের পানেও একটু ফিরে তাকা। এটাও তোর কর্তব্য।

এতগুলি কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল প্রভাত। আমার যে উপায় নেই মা, পাঁচজন সংসারী লোকের মত সংসার করার।

মহামায়া নীরব। প্রভাতের মুখে দেখলেন তিনি, দেশ স্বাধীন করার অনড় সঙ্কল্প।

প্রভাত সহজ গলায় বলল, মুক্তির কথা বলছিলে না মা, তাই বলছি, মুক্তির আর যদি কিছু নাও থাকে, তবু একখানা পাকা বাড়ী এবং তুমি আছ। এটা কি খুব কম হলো! কিন্তু এমন অনেক কোটি কোটি মুক্তি আমাদের দুর্ভাগা দেশে আছে, যাদের মাথার

উপর উদার আকাশ ছাড়া আর কোন আচ্ছাদন নেই। আর গায়ে জামা-কাপড় এত স্বল্প যে, লজ্জা নিবারণ তো হয়ই না ববং লজ্জা দেয় বেশী। আর খাওয়ার কথা যদি বলো, তবে বলতে হয়, দেশের চাবভাগেব একভাগ লোকের কাটে মাসে পনেরো দিন অর্ধাহারে। আর অর্ধেকের বেশী লোকের পেট চলে নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি করে। এবং অবশিষ্ট লোক আরামে বিলাসে অপচয়ে দিন উপভোগ করে। আমার সংগ্রাম এই সব অবিচাবেব বিরুদ্ধে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহামায়া বললেন, ভগবান তোর সহায় হোন।

এমন সময় অমিতাভ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে প্রভাতকে বলল, যাক্, পাওয়া গেছে তোমাকে।

কেন বল তো, কিছু দরকার আছে নাকি ?

দরকার বলে দরকার ! এখন একটা বুদ্ধি দাও দেখি !

মহামায়া বললেন, অনিলের সেই পরিবারের ব্যাপার নিয়ে কথা ?

প্রভাত বিস্মিত হয়ে বলল, অনিলের পরিবার তো আমাদের বীণা !

অমি বলল, হ্যাঁ, তা নিয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু অপ্রকাশ্যে আর একজন আছেন—তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। মুস্কিল বেঁধেছে তাকে নিয়ে। আগাগোড়া সব শুনে একটা বুদ্ধি বাতলাও তো। আরে, এককালে তুমি একজন নামজাদা উকীল ছিলে, তোমার অসাধ্য কি আছে ?

প্রভাত একটু হেসে বলল, সে তো মনে হয় আগেব জন্মের কথা। এখন সব ভুলে গেছি।

না প্রভাতদা, বলো একটা কিছু।

সব অমির মুখে শুনে প্রভাত বলল, উইল জাল করতে পারিস যদি বুঝে দেখ, পারবি ? বলে, প্রভাত একটু একটু হাসতে লাগল।

অমি মাথা নেড়ে বলল, না, সাহস পাচ্ছি না।

মহামায়া আক্ষেপ করে বলেন, আহা, বীণার যদি একটি ছেলে থাকত !

প্রভাত গম্ভীর হয়ে অমিকে বলল, তুই সমিতির সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিস ? স্বামীজী তোর কথা বলছিলেন।

অমি মাথা চুলকে বলল, নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছি, প্রভাতদা। সময় করেই উঠতে পারি না।

অমি চলে যেতেই মুক্তি এসে প্রভাতের কোল ঘেঁষে বসে বলল, বাবা, আজ আমার বইগুলো কিনে দাও। ক্লাশে পড়া দিতে পাবছি না।

মুক্তিকে একটু আদর করে প্রভাত বলল, বেশ আজই এনে দেব। তারপর বলল, তোমার শাড়িখানা তো বেশ দেখতে।

বা রে, এটা যে মার শাড়ি, তুমি চিনতে পারছ না !

এ কথায় প্রভাতেব বুকেব ভিতবটা যেন মুচড়ে উঠল, মুখ পাংশু হয়ে গেল। কতদিন আগের মধুব স্মৃতি ভেসে উঠল।

এই নীল শাড়িখানায় দীপ্তিকে বেশ মানাত। যেই বলতাম 'পরি নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি', অমনি লজ্জায় কটাক্ষ হেনে বলতো—যাও, এমনি করলে আমি আব কোনদিন এ শাড়িখানা পরবো না।

বেলা প্রায় তিনটে, সুব্রত এলো প্রভাতদেব বাড়ি। প্রথম প্রশ্ন, কিহে ঘুমোচ্ছ নাকি ?

মুখ তুলে প্রভাত বলল, তোমার মাথাব চিকিৎসা করাও, সুব্রত। দিবানিদ্রা দিতে কবে তুমি দেখেছ প্রভাত মিত্রকে ?

সুব্রত হেসে বলল, প্রভাত মিত্রকে ইদানীং বাড়িতে পাওয়াও তো কম ব্যতিক্রম নয়।

প্রভাত হা-হা করে হেসে বলল, যা বলেছ। আজ একটা লেখা নিয়ে দুপুরটা কেটে গেল।

কেন, কোন সভা সমিতি আছে নাকি ?

রাত্রে আছে একটা।

আজ কিছু দিনের জন্য বিদায় নিতে এসেছি প্রভাত।

কোথায় যাচ্ছ?

দিল্লী। বাবা খুব অসুস্থ।

তা হলে তোমার আশ্রিতদের কি হবে?

আমি তাড়াতাড়ি চলে আসতে চেষ্টা করবো।

মহামায়া সুব্রতর যাওয়াব কথা যখন শুনলেন, দুঃখিত স্বরে বললেন, তুমি না থাকলে আমি বড় অসহায় বোধ কবি। কিন্তু তোমার বাবা যখন অসুস্থ যেতে তো হবেই।

মুক্তি কোথায় মাসীমা?

আজ তার মেয়ের বিয়ে তাই খুব ব্যস্ত আছে, বলে, মহামায়া হেসে ফেললেন।

সুব্রত গিয়ে হাজিব হয় মুক্তির খেলাঘবেব দোবে। মুক্তি আর পাশের বাড়ির সাধনা দু'জনেই ভাবী ব্যস্ত। সুব্রতকে কেউ লক্ষ্যই করল না। পেছন দিক থেকে সুব্রত হুম করে শব্দ কবে উঠতেই ওরা পুতুল বর কনে ডিঙ্গিয়ে দে-ছুট। পলায়নবতা মুক্তিকে সুব্রত পেছন থেকে জড়িয়ে ধবল। মুক্তি তখন রাগে ফুলছে।

বলল, তুমি কি দুষ্টু সুব্রত কাকু, আমার মেয়ের বিয়েব দিনে এমনি ভয় দেখালে যে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। কি অলক্ষুণে কাণ্ড বলো তো।

সুব্রত ওর পাকা পাকা কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, অলক্ষণটা ঘটালে তো তোমরাই। তোমাদের পা লেগেই তো চিৎ হয়ে পড়ে গেল বব কনে। যাক্, তুমি ভেবো না, আমি গিয়েই একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি মধুকে দিয়ে, খাইয়ে দিও বর কনেকে, সব দোষ কেটে যাবে।

তোমার ওষুধে ছাই হবে, কিচ্ছু হবে না। তবে কেন মা বাঁচল না!

সুব্রত যেন চমকে উঠল মুক্তির কথা শুনে। নিজের সীমিত শক্তির দম্ভ যেন ঐ মেয়েটির কাছেও হাসির ব্যাপার। অথচ এই শক্তির

দম্ভেই বিশ্ব আজ ভীষণ ব্যতিব্যস্ত। শক্তির দুটো দিক আছে— কল্যাণ আর ধ্বংস। পশ্চিমের আকাশে শক্তির দম্ভের ঘনঘটা। বেশ বোঝা যাচ্ছে একটা দুর্যোগ আসন্ন। তার ঝাপটা এসে ভারতের বুকেও লাগবে নিশ্চয়। তার প্রভাব আমাদের দেশের উপর কতটা পড়বে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন আসবে। এই সুযোগে গৃহযুদ্ধ আরো কায়েম হবে। সুভাষ বোসের অগ্রসর নীতির সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের মতের মিল হচ্ছে না। সবচেয়ে পবিতাপের বিষয়, দেশের মঙ্গলের চেয়ে দলগত স্বার্থই নেতাদের লক্ষ্য। তা না হলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাস বোসকে এমন অপদস্থ হতে হয়! আশ্চর্য, সুভাস বোসকে কংগ্রেসের শেষে সভাপতিত্ব ত্যাগ কবতে হয়! এমনি কবেই আমাদের শক্তি একদিন শতধাবিভক্ত হবে। ইংরাজ এবং মুসলমান নিশ্চয় এ সুযোগ ছাড়বে না। এই রকম নানানখানা ভাবতে ভাবতে সুব্রত কখন যে এসে নিজের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছে, নিজেই টের পায়নি। একটা গরু অবৈধ ভাবে ওব বাগানে ঢুকেছিল। মালিককে আসতে দেখে প্রহারের ভয়ে সুব্রতকে একটা গুঁতো মেরে বেবিয়ে গেল। আব সেই আঘাতে সুব্রত সচেতন হলো।

নদীর অপর তীরে ছোট বড় বৃক্ষলতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট তাঁবুর ভেতর বসেছে প্রভাতদের গুপ্ত সমিতি। স্বামী মুক্তানন্দ এখন অনেক বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রখব বুদ্ধি এবং অটল সঙ্কল্প তাঁর চরিত্রে এখনও পূর্বের ন্যায় অটুট। স্বামীজী মেঘগম্ভীর স্বরে সকল সভ্যকে কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর ব্যথিত স্বরে বললেন, মুকুন্দর আত্মত্যাগ আমরা কখনও বিস্মৃত হবো না। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ইতিহাস কখনও ভুলবে না। বাঙ্গালী বীর সন্তানদের শৌর্যবীর্যের সাক্ষী হয়ে থাকবে

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। আর সেই সঙ্গে আমাদের মুকুন্দর আত্মত্যাগ চিরভাস্বর হয়ে থাকবে দেশের জনমানসে।

আসা-যাওয়ার কালস্রোতের মধ্যে নিজেকে চিরন্তন করে রাখার একমাত্র উপায় মহৎ কাজে আত্মাহুতি। শুধু দিয়ে যাবে, ফলের আশা কবো না। নদী যেমন তার দুকূলের বাধা অতিক্রম করে, তার লক্ষ্য সমুদ্রে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়া, তোমবাও ঐরূপ কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়, তোমাদের লক্ষ্যে গিয়ে পৌছাও। কর্মের জাতবিচার করতে যেও না। কর্মের বিচাবক মহাকাল—আজ যে আদর্শ মহৎ, পববর্তী যুগে তা নিন্দনীয় হতে কোন যুক্তিব দরকার হয় না।

এতটা বলার পরে স্বামীজী একটু থামলেন, সভ্যবা উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রত্যাদেশেব জন্য অপেক্ষা করে বইল।

স্বামীজী বটুয়া খুলে একটি লবঙ্গ মুখে ফেলে দিয়ে প্রভাতকে বললেন, তোমাকে আমি একটি কঠিন কাজ দেব বলে প্রতিশ্রুত আছি—সে আদেশ পালনেব জন্যে তুমি প্রস্তুত?

স্বামীজীর পাদস্পর্শ কবে প্রভাত দীপ্তস্ববে বলল, আপনার যে কোন আদেশ পালনের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

স্বামীজী ধীব অকম্পিত স্ববে বললেন, আগামী কাল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি অত্যাচারী নবাধম পুলিশ সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্টকে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দেবে। পবশু সকালের প্রাতঃসূর্যকে যেন এই ইংরাজ সন্তান না দেখতে পায়।

প্রভাত প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলল, আজ যে মহান কর্মেব দায়িত্ব আমাকে আপনি অর্পণ কবলেন, আশীর্বাদ করুন যেন সফল হতে পারি। বলে স্বামীজীব পায়ে প্রণাম কবল প্রভাত।

নীরব সভাগৃহ। কেবল এক কোণে একটি মাটির তেলের প্রদীপ ওদের ভাবমুগ্ধ অন্তরের মতই কেঁপে কেঁপে জ্বলছে।

এক সময় নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে পড়ল সকল সভ্য। মধ্যবাত্রি অতিক্রান্ত, উর্ধ্বে অমাবস্যার তিমিরঘন মহামৌন আকাশ। আজ

জীবনটাকে যেন বড় বেশী ভাল লাগছে প্রভাতের। মহা-আকাঙ্ক্ষিত গৌরবান্বিত কর্মপ্রাপ্তিতে হৃদয় পূর্ণ। বিরাট উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আত্মযোগ বিশেষভাবে উপলব্ধি করল। ঝিল্লিমুখরিত অমানিশাকে কল্পনার মত মোহময় মনে হলো। জন্ম-মৃত্যুরহিত আত্মার অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে গেল। নিজেকে শুধু নিমিত্তমাত্র মনে হলো।

সে রাত্রে গভীর সুনিদ্রা হলো প্রভাতের। শিশুর হাসির মত কোমল স্নিগ্ধ সকালের রোদ এসে যখন ছড়িয়ে পড়ল প্রভাতের মুখে, তখন ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মুক্তি এসে বাবাব গলা জড়িয়ে আদর করে বলল, আব কত ঘুমোবে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখ, কি চমৎকাব বোদ উঠেছে।

তবুও একটু আরাম উপভোগেব নেশায় শুয়ে থাকে প্রভাত। মেয়েকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে এনে কত গল্প কবে।

প্রভাত বলল, আচ্ছা মুক্তি, ধরো যদি আমি অনেক দূরে চলে যাই, তবে তোমার খুব কষ্ট হবে, না?

মুক্তি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, জানি না, যাও। তোমার কেবল জেলে যাওয়া আর জেলে যাওয়া; কই, সাধনার বাবা তো কখনও যায় না জেলে।

প্রভাত সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, সকলেই কি এক রকমের হয় রে পাগলী।

তা হোক। তুমি যেতে পাবে না।

প্রভাত মুক্তির চোখে চোখ রেখে ভাবে, কী নিঃসংশয় ঘোষণা—সে তার বাবাকে যেতে দেবে না।

মাতৃহীনা কন্যার আবদারে প্রভাতের মনটা ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয় বৈকি।

মহামায়া এসে হেসে বললেন, আজ বাপ-বেটি শুয়ে কেবল গল্পই করবে, উঠতে হবে না।

চা খাওয়ার পরেও মেয়ের সঙ্গে প্রভাতকে বসে গল্প করতে দেখে মহামায়া বললেন, হ্যাঁ রে প্রভাত, শরীর ভাল আছে তো ?

হঠাৎ তোমার একথা মনে হলো কেন মা ?

না, বাড়ী বসে আছিস কিনা তাই।

ওঃ! এই কথা। না মা, শরীব তোমার ছেলের কোন দিনও খারাপ থাকে না, আজও নেই।

না থাকলেই ভাল—বলে, মহামায়া চলে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ প্রভাত প্রশ্ন কবল, বাবা যখন মাবা গিয়েছিলেন তাঁর বয়স কত হয়েছিল, মা ?

আটত্রিশ বছর।

তবে আমার এখন বয়স বাবার সে সময়ের বয়সেব চেয়ে দু-বছর বেশী—মানে চল্লিশ!

হঠাৎ একথা মনে হলো কেন তোর ? মহামায়ার কথায় উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

প্রভাত কথাটার গুরুত্ব হালকা করার প্রয়াসে বলল, অমনি ভয় পেলে, মা! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আব পারা গেল না।

মহামায়ার বুক থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেবিয়ে আসে।

মাকে খুশী করবার জন্যে প্রভাত বলল, মা, তোমাব হাতেব ছানার ডালনা অনেকদিন খাইনি। তুমি আজকাল আর সেসব জিনিস রাঁধই না।

মহামায়া ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ রে প্রভাত, আজ আমার মনটা এমন করছে কেন বল তো। কেবলই মরা লোকের মুখ মনে পড়ছে। কত দিন চলে গেছেন তাঁরা, আজ কেন তাঁদের কথা এমন করে মনে পড়ছে!

প্রভাত একটু হেসে বলল, তার মানে তোমার মন এখন আর কোন কথার ভারই সহ্য করতে পারে না।

মহামায়া উদাসস্বরে বললেন, ঠিকই বলেছিস বাবা—আমার আর সহ্য করবার শক্তি নেই।

মার একথায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রভাতের বুকের ভিতরটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। নিজেকে কর্তব্যে অটল রাখার সঙ্কল্পে, নিজের আত্মবিশ্বাসকে বলীয়ান করে নেয়, স্বকীয় অসীম ধৈর্য ও স্থৈর্য দ্বারা। মনে ভাবে, সুব্রতর সঙ্গে দেখাটা সেরে আসা দবকার। খদ্দরের পাঞ্জাবীটা পবে বেরিয়ে যায়।

সুব্রত একঘর রুগী নিয়ে তখন খুবই ব্যস্ত। প্রভাতকে একটু অপেক্ষা কবতে বলল। আব প্রভাত সুব্রতদেব খোলা বারান্দায় অস্থির পায়ে পায়চাবি করতে লাগল।

কাজ সেবে সুব্রত এসে বলল, হঠাৎ এসময় প্রভাত?

কেন, এসময় কি তোমাদের বাড়ী আসতে নেই?

সহাস্যে সুব্রত বলল, আছে বৈকি ভাই, তবে তোমার মত কাজের লোকেব পক্ষে সময়টা একটু বেমানান। যাক্ ওসব কথা, চল ঘরে গিয়ে বসবে। আমি চায়ের অর্ডাব মধুকে দিয়ে এলাম বলে।

চায়ের কথা বলে সুব্রত এসে প্রভাতেব মুখের অবস্থা দেখে সংশয়িত হয়ে বলল, বিশেষ কিছু বলাব আছে না কি?

না।

তোমাদের কাজ কি রকম এগুচ্ছে?

প্রভাত সহাস্যে বলল, এগুনো পিছনোর প্রশ্ন নয় সুব্রত, কেবল রাস্তা তৈরী করে যাচ্ছি। আর চেষ্টা করছি, মানুষের পশুবৃত্তিগুলিকে সংহার করে মানবতার প্রতিষ্ঠা কবতে। তুমি হয়তো বলবে, পশুবৃত্তিগুলি নিশ্চিহ্ন করা মানুষের সাধ্য নয়।

সুব্রত হেসে বলল, আমি তা বলবো না। তবে একথা বলবো যে, পশুশক্তিকে সুসংযত করে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করাই মানুষের কর্তব্য।

অস্থির স্বরে প্রভাত বলল, আজ শক্তির অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর এক সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদেব সরিয়ে ফেলতে হবে, দেশেব কল্যাণের নিমিত্ত—এ পৃথিবী থেকে।

প্রভাতের চোখে আগুন ধক্‌ধক্ করে জ্বলে ওঠে। যেন শূলপাণির ললাটস্থিত তৃতীয় নয়নেব অপরূপ দীপ্তি।

মানুষেব অধিকাব হতে বঞ্চিত কবে এত বড় একটা মহাদেশকে যারা পদানত কবে বেখেছে, তাদের কি ক্ষমা করা যায় সুব্রত? প্রাণেব লক্ষ কোটি শিখায় যে আগুন জ্বলে উঠেছে, সেই আগুনে এক দিন সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংস হতেই হবে। এ আমার অনুমান নয়, দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি চুপ কবে আছ কেন সুব্রত? এ কি আমার দুবাশা মাত্র?

না ভাই, দুবাশা নয়। একদিন ভারতের এ স্বপ্ন সফল হবেই। তবে তুমি যেন আজ একটু বেশী উত্তেজিত হয়েছ, প্রভাত? কোন বিশেষ কারণে নিশ্চয়ই তোমার মন বিক্ষিপ্ত আছে। আমাকে কি তা বলা যায় না, ভাই?

আজ নয় সুব্রত।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুব্রত চেয়ে থাকে, বুঝল এর বেশী আর কিছু জানা যাবে না। তাই অযাচিতভাবে সুব্রত বলল, কোন বিশেষ কাজের জন্য উত্তেজনা চাই বৈকি, কিন্তু বিবেচনা তারও আগে। জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ কবে দেওযাই যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করবাব একমাত্র উপায়, আমার তা মনে হয় না।

প্রজ্জ্বলিত জীবনশিখায় দেশকে আলোকিত করাই আমার অভিপ্রায়। সেই আলোতে সে নিজেকে চিনবে, অপরকে জানবে। তবেই না তার চাওয়া ও পাওয়া সফল হবে। তা না হলে উন্মত্ত অন্ধ আবেগে সে রত্নের বিনিময়ে কাঁচখণ্ড আঁচলে বেঁধে খুশী হয়ে উঠবে। পরিণাম তার নিশ্চয়ই শুভ হবে না।

একটু হেসে সুব্রত বলল, কাজেই, বন্ধু ধীরে।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না সুব্রত, এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো, যে সম্পদ আমরা হারিয়েছি—তাকে পুনরুদ্ধার। এ ব্রত উদ্‌যাপনেব পরে অন্য চিন্তা।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাত সুব্রতকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, চলি, সুব্রত। চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল প্রভাত।

সুব্রত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বন্ধুর বিপদসঙ্কুল পথের কথা চিন্তা করে চিন্তিত হলো মন। আপন মনে বলল, যে বহ্নিশিখা আজ প্রভাতের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাকে নেবায় কাব সাধ্য!

এই অগ্নিমন্ত্রের সাধককে সুব্রত দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়।— হে বীর, তোমার জয়যাত্রা সফল হোক। অনির্বাণ হোক তোমাব প্রাণপ্রদীপ। তোমার ত্যাগেব মন্ত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেব তরুণদের মনে আত্মত্যাগেব আকুল প্রেরণা জাগ্রত হোক। যুগ যুগ ধরে তুমি যুব-মনের গহনে আদর্শ হয়ে থাক।

প্রভাত চলে যায়, কিন্তু বেখে যায় তার দীপ্তবাক্যেব ঝঙ্কার আর আত্মপ্রত্যয়েব ব্যঞ্জনা।

সুব্রতর মন এক অব্যক্ত বোবা ব্যথায় ভাবী হয়ে ওঠে। বহুদিন আগের বেলার সঙ্গে শেষ বিদায়েব ক্ষণটি মনে পড়ে। সেদিনের সে ব্যথার রং যেন ঠিক এই বকমই ছিল।

সুব্রতর মনে হয়, অজানা এক দুঃখেব নদীর দুই তীরে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত আর বেলা। ওদের মুখের বিমল আলো এস পড়েছে, ঢেউয়েব বুকে।

আন্দামান সেলুলার জেল। ছোট একটা খোপে বসে প্রভাত ভাবছে, কি করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো! জীবনে এত বড় পরাজয় আর

কোনদিন হয়নি। কানের পাশ দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। মাঘের কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রি, সাহেব বসে কি একটা ফাইলে কি যেন লিখছিলেন, আমি সম্মুখের জানালা দিয়ে কপাল লক্ষ্য করেই তো বিভলভার ছুঁড়েছিলাম। আজও আমার ভাবলে বিস্ময় লাগে, তা কপালে না লেগে কানের পাশ দিয়ে কি করে বেরিয়ে গেল! অথচ রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার চালনায় আমার লক্ষ্যের প্রশংসা ছিল গুপ্তসমিতির সকলের কাছে।

একদিন উঁচু আমগাছের উপর মাকড়সাব জালের মধ্যে একটা পোকাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলাম, অব্যর্থ সে লক্ষ্য ছিল।

নিজেব হাতখানা চোখের সামনে ধবে প্রভাত ভাবে, অথচ এই হাতই ব্রত উদ্‌যাপনেব সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হায়রে, এই দ্বীপান্তবের চেয়ে আমাব যদি ফাঁসি হতো তা অনেক গৌববজনক ছিল। যখন ধরা পড়লাম সেই সময় পুলিশ যদি বিভলভাব কেড়ে না নিয়ে যেত, তবে নিজেকে নিজেই শেষ কবে দিতাম। বোজ মরাব চেয়ে একদিন মরা ভাল। এ জীবনে কিছুই কবে যেতে পাবলাম না। সুব্রত ঠিকই বলেছে শুধু উল্কাব মত নিজেব আগুনে নিজে জ্বলে গেলাম। যদি একটি প্রাণপ্রদীপও এ আলোতে জ্বালাতে পেবে থাকি, তবে তাই হবে আমার ব্যর্থ জীবনের পরম সান্ত্বনা। আমার মধ্যে ছিল বন্যার নদীব দুকূল-ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাস। নদীর যে আব একটা রূপ কল্যাণ, সে তো সুব্রতর মধ্যে। প্রাণের তেজকে আমি দাবানলে পরিণত কবে সব কিছু ভস্ম কবে ফেললাম। সুব্রত সেই আগুনেই ভাবতে দীপালি উৎসব করবে।

আজ এই কঠিন কঠোর জেলে বসে ভাবতের জননায়কদের আমি প্রণাম জানাই। তাঁদের বলিষ্ঠ হাতের সেবায় দেশের লোকের কল্যাণ হোক। আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাই—জীবন দিয়ে যারা স্বাধীনতার মাশুল দিয়ে গেল, তাদের আত্মত্যাগ যেন বিফল না হয়।

আজ ভারতের প্রথম সূর্যকে সাগরপারের প্রভাত সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছে। এ সূর্য যেন চিরভাস্বর হয়ে নবভারতের গগনে আলো বিকীর্ণ করে।

পরিমল এসে জিজ্ঞাসা করল, আজ কেমন আছেন প্রভাতদা ?

ভাল নেই, জ্বর আজও হয়েছে।

আপনি হাসপাতালে চলে যান। চেহারা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে আপনার। চোখের অবস্থা কি রকম ?

ক্রমশই যেন দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এ কথায় পরিমল চিন্তিত হলো। একই সময় ওরা এসেছিল আন্দামান সেলুলার জেলে। ওর অপরাধ ছিল, একজন অত্যাচারী দারোগাকে খুন করার। বালক বলে ফাঁসি হলো না। তখন ওর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। ঢাকার ছেলে, বিপ্লবী দলের প্রভাব পড়ে ওর উপর খুব অল্প বয়সেই। পরিমলের দাদা একজন নামকরা বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই ছোট বয়সে এই পথে এসেছিল পরিমল। ওর দাদা পুলিশের হস্তে ধৃত হলে, নিজেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওর দাদার মৃত্যুর কারণ যে-দারোগা হয়েছিল, তাকে একবছর পরে পরিমল হত্যা করে আন্দামান জেলে এসেছিল।

এ ঘটনা দু'বছর আগের। এখন সে যুবক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, সুদূর আন্দামান জেলেও তার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের জন্য প্রভাত পড়তে পারে না। পরিমলই রোজ কাগজ পড়ে শোনায়। আজও এসেছে কাগজখানা হাতে নিয়ে।

পরিমল সকৌতুকে বলল, জবর খবর প্রভাতদা।

হেডিংটা পড়ে শোনাল পরিমল ঃ সুভাষ বোস নিজ গৃহে অন্তরীণাবদ্ধ থাকাকালীন মৌলবীর পোষাক পরিধানপূর্বক পলায়ন।

এ্যাঁ! বল কি! দৃষ্টিহীন চোখদুটি উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে প্রভাতের।

পবিমল সোচ্ছ্বাসে বলল, আবো শুনুন, জিন্না সাহেব প্যান্টে বেল্ট আঁটছেন, পাকিস্থান আদায় না কবে ছাড়বেন না। আর জাপান তব তর করে এগিয়ে আসছে ভাবতের দিকে। অবস্থা বেশ ঘোরাল।

পরিমলের অস্থিবতা প্রতিটি কথায়। এ অবস্থায় জেলে বন্দী হয়ে থাকার মত দুঃখজনক আর কি হতে পারে! তরুণ বক্ত টগবগ কবে ফুটতে থাকে। সেই তপ্ত বাষ্প ভগ্নস্বাস্থ্য প্রভাতকেও আচ্ছন্ন কবে। নিষ্প্রভ চোখ দিয়ে যেন দেখতে চায় ভবিষ্যতের চিত্র।

উত্তেজনা-কম্পিতস্ববে প্রভাত বলল, মনে হচ্ছে এব ফলে ভারতেব ইতিহাস নতুন করে লিখিত হবে। কিন্তু আমার আর দেশকে দেওয়াব মত কিছুই নেই।

জীবনে হতাশ, প্রভাত মুদ্রিত চোখে শুয়ে থাকে। ফেলে-আসা দিনগুলিব স্মৃতি কতরূপেই না মনে পড়ে! আব মনে পড়ে, গতকালেব মহামায়ার চিঠিখানার কথা।

মুক্তিব বিয়ে ঠিক কবেছেন মা, একটি গবীব বি-এ পাশ স্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে। সত্যিই তো, সহায়-সম্বলহীনা মুক্তির জন্যে এর চেয়ে ভাল পাত্র যোগাড় করবেন কি কবে। দীপ্তি বেঁচে থাকলে তার মেয়ের এ রকম বিয়েতে সে রাজী হতো না। দীপ্তি, তুমি যেখানে আছ সেখানে আমাব আবেদন পৌঁছবে কিনা জানি না, তবু তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, আমাব কর্তব্যেব ত্রুটির জন্যে।

“এখন আর দেবি নয়, ধব গো তোরা
হাতে হতে ধর গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন-স্বর্গ॥
ওবে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে,
খুলল দুয়ার মন্দিবে যে—

লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই,
কোথায় পূজার অর্ঘ্য ॥
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে
সাজাও পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎস ধারায়
মঙ্গলঘট ভর গো।
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে,
দেবি কেন করিস তবে—
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
মরতে হয় তো মর্ গো ॥"

এমন সময় অমিকে ঘরে ঢুকতে দেখে, সুব্রত বইখানা বন্ধ করে বলল, এই যে আমি, এসো এসো, খবর সব ভাল?

হ্যাঁ, এক রকম ভালই।

তোমার বিজনেস্ কেমন চলছে?

হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অমির। খুশীতে হাত দু'খানা ঘর্ষণ করে বলল, যদি আর কিছুদিন যুদ্ধটা চলে সুব্রতদা, তবে আশা রাখি মধ্যবিত্তের তালিকা থেকে নামটা মুছে ফেলতে পারবো।

গরীবের লিষ্ট থেকে নামটা মুছে গিয়ে ধনীর লিষ্টে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে, এই তো কথাটা?

সুব্রতর কথায় শ্লেষের গন্ধ পেয়ে অমি বলল, তুমি কথাটা ভাল ভাবে নেবে না, তা আমি জানতাম, কিন্তু আমি বলবো আমার ভুল ভেঙ্গেছে।

সুব্রত যেন অমির আর-একটা দিক দেখতে পেল। এ কি সেই অমি, যে দেশের জন্য রিক্ত হয়ে নিজেকে একদিন দিতে প্রস্তুত ছিল? প্রলোভনের পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে কোথায় সে তলিয়ে গেছে।

আজ আমার সম্মুখে যাকে দেখতে পাচ্ছি—সে তো ইংরাজের যুদ্ধের বসদদার একজন।

সুব্রত বলল, তোমার পার্টনার তো দুলাল নন্দী শুনেছি?

হ্যাঁ সুব্রতদা, ব্যবসা-বাণিজ্যের আমি কি জানতুম বলুন তো? এতটা বয়স পর্যন্ত তো প্রভাতদার সাগরেদি করেই কেটে গেল; ভাগ্যিস, নন্দীমশায়ের সঙ্গে দেখা হলো। তখন অনিলের ব্যাপার নিয়ে মনটাও সংসারমুখো ছিল, তাই যা-কিছু হয়েছে।

অনিলের নাম উঠতে সুব্রত ভাবল, বীণাব দুর্ভাগ্যের জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়—তবে সে অমি। বীণাব জীবনে রাহুরূপী নিবারণ দাবোগা অমিকে কেন্দ্র করেই ওদেব বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ কবে। তাবপবে ঘটনার স্রোতে খড়কুটোর মত বীণার জীবনটা ভেসে গেল।

নিবাসক্ত গলায় সুব্রত বলল, বীণাব খবব কি, অমি? ওকে আজকাল দেখতেই পাই না।

দিদিব কথা আর বলবেন না। রাত দিন আমার স্ত্রীর ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অনিলবাবু বাড়ীটা পার্টিশান করে নিয়েছেন। মানে, একেবাবে মাঝখান দিয়ে পাঁচিল উঠেছে।

ও, তাই নাকি। আমি অবশ্য অনেকদিন তোমাদের বাড়ী যাইনি।

অমি বেশ সিবিয়াস হয়ে বলল, পাঁচিল তোলার ব্যাপাবে আমি অনিলবাবুকে দোষ দিতে পারি না—সব দোষ হলো বাবার। নিজেব মেয়েব ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে, জামাইয়েব উপর এতখানি বিশ্বাস করা মোটেই সমীচীন হয়নি। আসল কথা হলো—তখন জামাইয়েব সেবাযত্নে বাবা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোন দিন যে স্বামী-স্ত্রীতে মনান্তর হতে পাবে, তাঁব সরল বুদ্ধিতে এটা মোটেই বুঝতে পাবেননি। আবার নিজের একটু ভয়ও হয়েছিল, বিষয়-সম্পত্তি জামাইকে না দিয়ে মেয়েকে দিলে জামাই যদি মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তখন অসুস্থ মানুষ পড়বেন মুস্কিলে।

একটু কুটিল হাসি ছড়িয়ে পড়ে অমির মাংসল মুখে। তারপরে

বলল, অনিলবাবুব মত হাবা-গোবা মানুষ এ রকম হয়ে যাবে এটা বোঝা কাকুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অনিলবাবু বলেছিলেন, ওর স্ত্রী-পুত্রেব সঙ্গে দিদিকেও থাকতে। দিদি তা কিছুতেই বাজী হলো না। তা আমাদের সঙ্গে থাকবি তো থাক না—রাত দিন আছে বউয়েব পেছনে লেগে। পবের মেয়ে তা কখনও সহ্য করে! সেও দেয় দু-কথা শুনিয়ে—এই নিয়ে রাত দিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলছে বাড়ীতে। তবে আমাকে এসব তেমন পোয়াতে হয় না, সর্বক্ষণ ব্যবসার ধাঁধায় কেটে যায়। ভগবানেব আশীর্বাদে যুদ্ধটা আর কিছুদিন চললে, কিছুকে আর পবোয়া কবি না।

সুব্রত বলল, কিসের ব্যবসা তোমার? মানে কি কি জিনিস তোমরা সাপ্লাই দাও এদেশ থেকে?

সে অনেক কিছু। লোহার তার, চটেব থলি, পশুব চামড়া, এখন আবার টিউবওয়েল দেওয়াও শুরু কবেছি। টিউবওয়েল সাপ্লাইতে যথেষ্ট পয়সা।

অমি এবাবে একটু হেসে বলল, আপনাকে এ সব বলাই বৃথা। বেখে দিন আপনাব দুর্নীতি, সুনীতি পালন করে কখনও কাউকে বড় লোক হতে দেখেছেন! আমার মনে হয় সুনীতি শব্দটা কোন দুর্নীতি-পরায়ণ লোকই আবিষ্কার করেছে। গরীবকে চিরদিন গরীব রাখার এত বড় কৌশল বুঝি আর নেই। স্রেফ ধোঁকা। আপনার মত দু-চার জন ছাড়া, শহরে অন্য লোকেব দিকে তাকিয়ে দেখুন—যুদ্ধেব সুযোগ তারা দু-হাত ভরেই নিচ্ছে। সকলেব উন্নতির মূলেই কিন্তু ঐ দুর্নীতি শব্দটা আছে। বলে, অমি অপ্রকৃতিস্থের মত হাঃ-হাঃ করে হাসতে লাগল।

সুব্রত যেন অমির পাগলের মত হাসি সহ্য করতে পাবছে না।

প্রজ্ঞাবান ঋষিরা অনেক অভিজ্ঞতার পরেই এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—মানব-চরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়। অমির অতীত এবং

বর্তমান দুটোই যেন অবাস্তব স্বপ্ন বলে প্রতীতী হয় সুব্রতর।

মনে হলো, অমি যেন বিস্মৃতির তল থেকে কথাটা টেনে বের করল। বলল, দেখুন দেখি, যা বলতে আসা তাই ভুলে বসে আছি, আজ রাত্রে সুব্রতদা আমার ওখানে খাবেন।

হঠাৎ নেমন্তন্ন! ব্যাপারটা কি বলো তো?

ব্যাপার আব কি, ছেলের জন্মদিন।

ও হো, মনেই ছিল না, তোমার ছেলে হয়েছে।

হেসে অমি বলল, তা যা বলেছেন সুব্রতদা, বিয়েই কোন দিন হবে, তাই কি ভেবেছিলাম। নেহাৎ দিদি ধবে দিয়ে দিলে তাই। তখন অনিলবাবুব ব্যাপাব নিয়ে দিদির মনেও শান্তি ছিল না, ভাবলে ভাজ ঘবে এলে জ্বলুনী একটু কমবে। কিন্তু নিজেব স্বভাব ভাল না হলে কখনও শান্তি পেতে পাবে!

সুব্রতব মনে হয়, অমি কখন যাবে। তাই মধু এসে যখন বলল, তাঁতীবউ এসেছে তাব ছেলেটিকে দেখাতে, তখন যেন হাতে স্বর্গ পেল।

আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি, যেতে ভুলবেন না যেন। বলে, অমি চলে গেল।

আজকাল শহরের নিম্নশ্রেণীব যুবকবা অধিকাংশ যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। তাই ওদের ঘবে অভাব এখন নেই বলতে পারা যায়। অনাহারজনিত রোগেব হাব অনেকই কমে গেছে। সুব্রতব রুগীর সংখ্যাও আগেব মত বেশী নেই। আপাতদৃষ্টিতে ভালই লাগে।

সুব্রত রুগী দেখা শেষ কবে, অনাথ দুঃস্থ কয়েকটি পরিবারের খোঁজ নিতে বের হলো। পথে তারার সঙ্গে দেখা। টিপ করে একটা প্রণাম করে তারা বলল, অনেক দিন পরে আপনাকে দেখলাম, ডাক্তারবাবু। অনেক রোগা হয়ে গেছেন, কোন অসুখ-বিসুখ কবেছিল না কি?

না। তোমাদের খবর ভাল ?

সলজ্জ হেসে তারা বলল, আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে এখন আর আমার কোন দুঃখই নেই। ওরে বাপরে! সাহেবের যা কড়া নজর, একটু অসুবিধে হোক তো আমার, লোকজনদের বকে ফাটিয়ে দেবেন। মানুষ তো নয়, যেন দেবতা।

সুব্রত চলে যেতে যেতে শ্রীনাথের মরা মুখটা মনে পড়ল। বিষণ্ন একটু হাসি খেলে গেল মুখে। তাবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়, কথার চটুল ভঙ্গী দেখে পরিষ্কাব বোঝা গেল, জীবনটাকে নতুন করে উপভোগের সন্ধান সে পেয়েছে। এখন কি অমিব মতই তাবারও বিগত জীবনটা অনুশোচনাব কারণ!

এদিকে ভাবতে বাজনীতির পটভূমি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে জাপান উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এসে পড়েছে একেবাবে আমাদেব ঘরেব কাছে। ইতিমধ্যে রেঙ্গুন তাদের অধিকারে এসে গেছে। সে দেশেব সকলে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। বাঙ্গালীরা হাঁটাপথে, জাহাজে, প্লেনে যে যেভাবে পেরেছে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। ফেলে এসেছে ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর সব কিছু। এত দিনেব আশ্রয় এত দিনের আলাপ পরিচয়, সব তুলে দিতে হয়েছে জাপানেব বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাব কবলে। নিজের দেশে অপরাধীর মত একবস্ত্রে এসে উঠেছে কোন নিকট কিংবা দূব আত্মীয়েব বাড়ী।

এদিকে জাপানের প্রলুব্ধ হস্ত কলকাতাব দিকেও প্রসারিত হচ্ছে। সকলের মুখেই সে এক আতঙ্কিত ধ্বনি, এলো বলে। ত্রস্তভীত মহানগরীর অধিবাসীরা। প্রাণেব ভয়ে সব শহব থেকে অনেক দূবে পালিয়ে যাচ্ছে। শিল্প-সভ্যতার থেকে অনেক দূরে, অজ গণ্ডগ্রামে। হয়তো সে সব স্থান এখনও কিছুটা নিরাপদ আছে। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের জন্যে সকলেই লালায়িত।

বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা প্রায় খালি হয়ে গেল। অবশিষ্ট দু-চার জন যাঁবা রইলেন, তাঁরাও সুযোগেব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন। কিছুসংখ্যক চাকুরীজীবী এবং দুঃসাহসী ব্যক্তি কলকাতার বিশাল বক্ষ আঁকড়ে পড়ে রইলেন।

ঠিক এই রকম সময় মুক্তির চিঠি এলো কলকাতা থেকে মহামায়ার নিকট।

মুক্তি লিখেছে—ঠাকুমা, কলকাতায় আর থাকা সম্ভব নয়। প্রতিটি দিন, নতুন নতুন বিভীষিকা নিয়ে আমাদেব কাছে উপস্থিত হচ্ছে। শহরেব প্রায় সকলেই প্রাণেব ভয়ে পালাচ্ছে। স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরাও মনে কবেছি তিন চার দিনের মধ্যে বরিশাল যাব।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মহামায়া চুপ কবে বসেছিলেন। এমন সময় সুব্রত এলো।

এসো সুব্রত—বসো আমার পাশে।

বসে সুব্রত বলল, কাব চিঠি, মাসীমা?

মহামায়ার মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি—বললেন, মুক্তি লিখেছে। কলকাতায় লোকের এখন বাস করা নাকি মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ওরা দু-চার দিনের মধ্যে এখানে চলে আসছে।

সত্যি মাসীমা, পৃথিবীব্যাপী একটা মহাদুর্যোগ চলছে।

মহামায়া শঙ্কিত স্বরে বললেন, তুমি তো আমাদের সবই জান বাবা, মুক্তির বিয়ের সময় এই বাড়ীখানা মহম্মদ চৌধুরীর নিকট বাঁধা দিয়েছিলাম, তার মেয়াদ দু'মাস হলো শেষ হয়ে গেছে। এখন ওরা বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন। এখন দেশের লোকদের মন মেজাজ তো দেখতেই পাচ্ছ—উপায় একটা কিছু বলো।

সুব্রত চিন্তিত সুরে বলল, দেশে আপনাদের কিছু জায়গা-জমি আছে তো?

অল্পস্বল্প কিছু ছিল বটে, তা দেখাশোনার অভাবে নায়েবমশাই

খাজনার দায়ে নিলাম কবিয়ে বেনামীতে নিজে কিনে নিয়েছেন। এখন পৈতৃক বাড়ীখানা আব দেবোত্তব কিছু আছে। কোন রকমে কষ্টে-স্মৃষ্টে চলে যেতে পাবে। তাই আমি মনে কবেছি, দেশেই চলে যাব।

ব্যস্ত হয়ে সুব্রত বলল, কিন্তু সেখানে আপনাকে দেখাশোনা করবে কে? এখানে তবু আমি আছি।

হ্যাঁ বাবা, তা ঠিকই বলেছ। স্বামী-পুত্র সবই তো দিয়েছিলেন ভগবান—তবু আজ আমি একা—তুমি ছাড়া আমাকে দেখবাব কেউ নেই।

কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় মহামায়ার কণ্ঠ। ভগ্নকণ্ঠেই বললেন, সত্যি কবে বলো তো সুব্রত, আমার মত হতভাগিনী তুমি আব একজন দেখেছ? দেখনি, কি কবে দেখবে। তুমি কিছু ভেবো না সুব্রত, শুনেছি, যাদের কেউ না থাকে তাদেব ভগবান দেখেন। তোমার মাসী যত বড় হতভাগী হোন তাঁবই তো সন্তান।

তাছাড়া জ্ঞাতিবা আছেন, আর আছে আমাব উমাচরণ। তুমিও মাঝে মাঝে যাবে এখান থেকে, বেশী দূব তো নয়।

সুব্রত এই বিষণ্ণ পবিবেশটাকে একটু সহজ কবে নেওয়ার জন্যে বলল, হ্যাঁ যাব বৈকি। মুলাদি আব ববিশাল থেকে কতটুকু বা দূব!

মহামায়া বললেন, তাছাড়া মুক্তিবা আসছে, তারাই কেউ না কেউ মাঝে মাঝে যাবে।

নিশ্চয়ই যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসীমা।

কিছুদিন হলো সুব্রতব মনে একটু আশাব আলো স্ফুবিত হচ্ছে। কিন্তু সে আলোটুকুকে এখনও পুবোপুরি ভরসা কবতে পারছে না। তা হলো, যদি ভারত স্বাধীন হয়, তবে নিশ্চয় রাজবন্দীদেব মুক্তি দেবে। প্রভাতও মুক্তি পাবে। এই আশাব কথাটা এখন মহামায়াকে সাহস করে বলেনি। কারণ, কোন কারণে না হলে আবার আশাভঙ্গের দুঃখ পাবেন তিনি। নিজেব মনেই এই মধুব সম্ভাবনাটুকু লুকিয়ে বাখে।

মহামায়া প্রভাতের কথা বিশেষ কিছু বলেন না। সুব্রতও কিছু জিজ্ঞাসা করে না। কারণ সে জানে, মহামায়া তাঁর পুত্রের পরাজয়ের গ্লানির ব্যথা অতি গোপনে বহন করে বেড়ান। তার অংশ সুব্রতকে দিতেও তিনি নারাজ। সংসার-সংগ্রামে ক্লান্ত মহামায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রতর চোখে জল আসে। অসহায়া বৃদ্ধার করুণ দুটি চোখ অস্তিমের পথযাত্রীর মতই সকরুণ ব্যথায় ভরা। বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর।

সেদিনের মত সুব্রত মহামায়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল।

এই ঘটনার পরে প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের উপর দিয়ে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে। ধান চাল, নৌকা মোটরগাড়ি সাইকেল এসব যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে সেই জন্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজেয়াপ্ত করলেন সরকার। জাপানী সৈন্যরা যাতে এসবের সুবিধা না পায়, তাই এই বন্দোবস্ত। খাদ্যের সরবরাহ নিজেদের সৈন্যবিভাগে অব্যাহত রাখার দরুণ দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রতিফলিত হলো। কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে এলো দলে দলে রাজধানী কলকাতায়। ক্ষুধার বিকট বীভৎস রূপ দেখে চমকে উঠল বাংলার বুভুক্ষু লোক। জঠরাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ক্ষুধিতদের অন্য সব কোমল বৃত্তি। পেটের দায়ে মানুষ স্ত্রী পুত্র কন্যা বিক্রি করতে লাগল। কত মাতার মাতৃত্ব, সতীর সতীত্ব আর কুমারীর কৌমার্য বিসর্জিত হলো মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষের কবলে। ভুলে গেল তারা নিজেদের মনুষ্যত্ব, শুধু ক্ষুধার প্রতীকরূপে বেঁচে রইল। ক্ষুধার যে কতবড় শক্তি তা প্রমাণ করল সে বছরের দুর্ভিক্ষ।

অসংখ্য দরদীর মর্মবেদনা সোনার লেখনীতে রূপ পেল নানা

ভাবধারায়, সাহিত্য শিল্প কবিতায় ও জনমানসের নিবিড় হৃদয়ের অন্তস্তলে। বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা, তরুণ-তরুণীর অন্তরে কান্নার বোল বেজে উঠল। ঝরে পড়লো অঝোর ধারায় দুঃখের তীব্র বেদনা।

স্বার্থসিদ্ধি মানুষকে কত নিম্নগামী করতে পারে, তা প্রমাণিত হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। খুলে পড়ল কৃত্রিম সাধুতার খোলস, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র স্বার্থান্বেষী এক দানব। ধর্মপ্রাণ ভারতের ন্যায়-নীতি অবলুপ্তপ্রায়। নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলল নীতিবোধ। যুদ্ধে আমদানী চোবাবাজার কালোবাজার সোনাব ভারতের জনমণ্ডলীব উপর প্রভাব বিস্তার কবল।

মানুষ যেন আর মানুষ নেই। বিজ্ঞানের অমোঘ শক্তি নিয়ে যথেচ্ছাচাব কবছে। তার বিশেষ স্বাক্ষর জাপানে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ। এমন পৈশাচিক আনন্দের নজিব ইতিহাসে আর আছে কিনা জানি না। তবুও ভারতেব পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৫ সালে গ্রেটব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দল আসীন হলো ক্ষমতায়। ভাবতের স্বাধীনতা লাভে সেটা সুবিধা হলো। কিন্তু গোল বাঁধালেন জিন্না সাহেব। তিনি রাজী হলেন না সর্বধর্মের প্রতিনিধি কংগ্রেসকে মেনে নিতে। আবদার তাঁর, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই। এই নিয়ে মনকষাকষি শুরু হলো কংগ্রেসেব সঙ্গে। কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো হিন্দু। এই তিক্ত মনোভাব উভয় সম্প্রদায়েব লোকের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার ফলে কিছু দিনের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেল। ভারতেব নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল সে আগুন।

শেষ পর্যন্ত জিন্না সাহেবের জিদের সুযোগ নিয়ে চতুর ইংরাজ ভারতের বক্ষে ছুরি বসালো এবং দু-ভাগ করে দু দলকে উপহার দিল। এত দিনের ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা বিকৃত খণ্ডিতরূপে পূর্ণ হলো। কূটনীতিজ্ঞ ইংরাজ বোধ হয় ভারতের ভবিষ্যৎ রূপ

কল্পনা করে হাসল। তারপর ভালমানুষী হাসি হেসে, নেতাদের সঙ্গে করমর্দন করে দেশে চলে গেল। ভারতের শান্তিও চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল। আর কি কোনদিনই ভারত অখণ্ড মহাভারতে রূপান্তরিত হবে না! আশাবাদী মন সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষা করে থাকবে। বহু প্রাচীন, আসমুদ্রহিমাচল পুণ্যভূমি ভারতকে আমি সকলের সাথে প্রণাম জানাই।

করুণ কণ্ঠেব আহ্বান আসে—মা!

যাই বাবা। বলে মহামায়া চালসমেত কুলোখানা রেখে, প্রভাতেব কাছে যান।

আমাকে ডাকছিস, প্রভাত?

হ্যাঁ মা, আজ কে আসবে মনে আছে তো?

আছে বৈকি বাবা।

ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?

একটু ম্লান হেসে মহামায়া বললেন, সব ঠিক আছে।

ছেলের মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, এখন কেমন আছিস বাবা?

ঐ যেমন রোজ থাকি।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মহামায়ার বুকে ঝড় বইতে থাকে। চিন্তাগুলি যেন ভিড় করে আসে।

এই স্বাধীনতাই কি আমার প্রভাত চেয়েছিল! আজ দেশ স্বাধীন হওয়ায়, দেশের মুক্তিকামী বন্দীরা সকলেই মুক্তি পেয়েছে।

না, প্রভাত মুক্তি পেয়ে এলো কোথায়?—নিজের জন্মভূমি পররাষ্ট্রে।

এর জন্যেই কি জীবনটাকে ধূপের মত নিঃশেষে জ্বালিয়ে শেষ করে দিলে! হায়! সে-সন্ধ্যার বেদনাভরা স্মৃতি আমি ভুলবো না

কোনদিন,—যখন একটি ছেলে প্রভাতের অস্থিচর্মসার হাতখানা ধরে নিয়ে এসে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি সত্যপ্রসন্ন মিত্রের বাড়ী ?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। নিজের সন্তানকে চিনতে পারলাম না। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রুগ্ন কঙ্কাল এক ব্যক্তি। কে এ!

সঙ্গের ছেলেটিও অপরিচিত।

উত্তর না পেয়ে ছেলেটি আবার বলল, আমাব কি বাড়ী ভুল হয়েছে ?

কম্পিতস্বরে বললুম, না।

প্রভাত এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে বলল, মা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?

যখন ওকে বুকে জড়িয়ে ধবলাম, মনে হলো মাতা-পুত্রেব হৃদয়েব উত্তাল তবঙ্গেব কাছে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রও বুঝি কিছু নয়। দেশমাতৃকাব পূজায় আমি যে সতেজ সমুন্নত বীবপুত্রকে উৎসর্গ করেছিলাম, আজ পূজাশেষে—দেশজননী কাকে ফিরিয়ে দিলেন! রুগ্ন অশক্ত এক হতভাগ্যকে। এই কি কর্মেব পুবস্কাব!

এমন সময় বাইরে নৌকোব মাঝির হাঁক শোনা গেল।

মাঠান, কোথায় গো—

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন মহামায়া।

এসো সোনামণি আমাব—বলে, মুক্তির চার বছরের ছেলে মন্টিকে কোলে তুলে নেন। মুক্তি এবং নরেন তাঁব পেছনে পেছনে এসে ঘরে ঢুকল।

মুক্তি বাবাকে প্রণাম কবে বলল, তুমি যেন সেবার যে দেখে গিয়েছিলাম, তার চেয়েও রোগা হয়ে গেছ বাবা।

প্রভাত স্মিতহাস্যে বলল, আর বেঁচে থাকাই তো মা একটা মস্ত বড় অভিশাপ।

ছিঃ! ও কথা বলতে নেই প্রভাত। বলে, মহামায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন।

নিঃশব্দে প্রভাত তার দৃষ্টিহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে প্রভাত? মেয়ে জামাই নাতি, না নিজের অভিশপ্ত জীবনটা? আবেগে বাবংবাব চোখের পল্লব, ওষ্ঠাধব কাঁপছে। নাতিকে বুকে চেপে ধবে, অন্ধ চোখ ছুটি বুজে ফেলল। মন্টি ছোট ছু'খানা হাতে দাছুর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকোল।

প্রভাত ফিস্‌ফিস্‌ করে কবে নাতির কানে কানে বলল, দাছুভাই, দাছু আমার—

মন্টি যেন এই মধুব ডাকটুকুব অপেক্ষাই করছিল। এক সময় দাছুব সাদা ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে মন্টি প্রশ্ন কবল—

দাছু, তোমার চোখ এমন সাদা হলো কেন? আমার চোখের মণি কেমন কালো।

প্রভাত আদব করে নাতির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে বলল, নিশ্চয় কালো। তারপর যেন স্বগতোক্তির মত করে বলল, তোমাদের চোখ যেন চিবদিন এমনি কালো এমনি উজ্জ্বল থাকে। কোন পররাজ্যলোভীব নিষ্ঠুর অত্যাচার যেন তোমাদের পেতে না হয়।

মন্টি একথার মানে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে।

নবেন এসে কাছে বসতেই, প্রভাত বুঝতে পারে। অন্ধ হওয়ার পর প্রভাত বুঝতে পেরেছে, তার অনুভবশক্তি খুব প্রখব হয়েছে। প্রশ্ন করল, কত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ, বাবা নরেন?

আজ্ঞে, এক সপ্তাহের বেশী আর পেলাম না।

মুক্তিকেও কি এক সপ্তাহ পরে নিয়ে যেতে চাও?

আজ্ঞে না, ওরা এখন থাক। এক মাস পরে এসে নিয়ে যাবো।

জামাইকে প্রভাত দেখতে পায় না, কিন্তু ওর গলাব নম্র স্বরটি বড় ভাল লাগে।

প্রভাত বলল, স্তাখ নরেন, তুমি যে কর্মে নিযুক্ত আছ তা কেবল জীবিকা অর্জন করেই শেষ নয়। তার অবদান সুদূরপ্রসারী। তোমরা তো কেবল শিক্ষক নও—তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তোমরাই শিশুমনে অঙ্কুবিত করবে মহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ। তাদের আশা হবে অশেষ, আকাঙ্ক্ষা হবে মহত্তর। নির্লোভ, ত্যাগী, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে যদি তাদের তৈরী করতে পাব তবেই সার্থক হবে তোমার এ-তপস্যা। হ্যাঁ, তপস্যাই বলবো একে, এতে কত বড় সাধনার দবকার !

প্রভাতের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে নবেন বলল, আপনাব আদর্শকে রূপ দিতে আমি যথাশক্তি চেষ্টা কববো। শীর্ণ হাতখানা জামাইয়েব মাথাব উপব প্রভাতের আশীর্বাদে নত হয়।

বেশ কিছুটা সময় যে অতিবাহিত হয়েছে, তা বুঝতে পারে ওরা মুক্তির কণ্ঠস্বরে।

ব্যস্ত মুক্তি আঁচল দিয়ে কপোল ও কপালের ঘাম মুছে বলল, বাবা, তোমবা খাবে এসো।

এসেই মুক্তি কাজে লেগে গেছে ঠাকুমার সঙ্গে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্বশুরবাড়ীর গল্প চলছে।

জান ঠাকুমা, এখানে এলে যেন আমি প্রাণভবে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি। কলকাতাব ঐসব পায়বার খোপের মত তুখানি ঘরে আট-দশ জন থাকি, যেন দম আটকে আসে। এসব দেশের মত খেয়ে বসে সুখ কি সেখানে!

মহামায়া হেসে বললেন, তাও যদি তুদণ্ড পা-পেতে বসতে! এসেই তো কাজে লেগেছিস।

তাচ্ছল্যের স্বরে মুক্তি বলল, এ আবার কাজ নাকি? দেখতে যদি আমার শ্বশুরবাড়ীর কাজ, তবে বুঝতে।

সকালে উঠেই বারোয়ারী কলতলায় আমার শাশুড়ীর সঙ্গে পাশের ঘরের বুড়ির ঝগড়া লেগে যায়।

খিল খিল করে হেসে মুক্তি বলল, ব্যাপার তো কে আগে চান করবে তাই নিয়ে। এই সামান্য ব্যাপাব নিয়ে দুই বৃদ্ধা যেন মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেন। যখন অবস্থা চরমে পৌছয় তখন বুড়িদের ছেলেরা গিয়ে ধমক-ধামক করতে থামেন।

তারপর বাসন মাজার ঝি এলে তার সঙ্গে চলে আরেক দফা। এসব শেষ হতে দু'টো বেজে যায়। তারপর আবন্ত হয়, বাজার অফিস, স্কুলেব ভাত দেওয়ার ব্যস্ততা, কোন দিন বা এসবেব সঙ্গে যুক্ত হয় বেশন আনার ব্যাপার। সমস্ত দিনটাকে ঠিক বুঝে ওঠাব আগেই ফুরিয়ে যায়।

শুনে মহামায়া বলেন, বাব্বা! বারো মাস তোরা এমনি করে বাঁচিস কি কবে! আমার তো শুনেই হাঁপ ধবছে।

হুঁ, কলকাতায় যদি থাকতে ঠাকুমা, তবে বুঝতে সাধারণ লোকদেব এসব পাবার মধ্যে কোনই কৃতিত্ব নেই। তবে হ্যাঁ, ধনীর আরাম আয়েস দেখতে হলেও কলকাতা। এমঁনটি আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না—অবশ্য আমি গিয়েছিই বা ক'টা দেশে।

মুক্তিই সকলকে পরিবেশন করল।

নরেন খেতে খেতে বলল, এরকম মাছের স্বাদ কিন্তু কলকাতায় পাই না।

মুক্তি বলল, কেন মুশুরডাল, এরকম কলকাতায় খেয়েছ? বুঝলে ঠাকুমা, আমি এখান থেকে ডাল নিয়ে রেঁধে দেখেছি, কিন্তু এরকমটি ঠিক হয় না।

বোধ হয় জলের জন্যে, বললেন মহামায়া। প্রভাত হাতের আন্দাজে কাঁটা বেছে একটু মাছ মুখে দিয়ে বলল, এত যে ডাল মাছের সুখ্যাতি করছ, আমার মনে হয় কিন্তু বালাম চালের জন্যেই।

হঠাৎ উদাস আক্ষেপমিশ্রিত স্বরে বলল প্রভাত, এমন সোনার

দেশ কি হয়ে গেল ! বুঝলে নরেন, এখনও যেন মনে হয় একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি, কিছুতেই মন মেনে নিতে চায় না—এটা পররাষ্ট্র। জিন্নার জবরদস্তি যে দেশেব নেতাদেব এমন বিভ্রান্ত করবে তা একবারও ভাবিনি। অবশ্য গান্ধীজীর এ প্রস্তাবে কোন দিনই সমর্থন ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত হলো।

নবেন বলল, আরো কী হলো দেখুন, সুভাষ বোসের মত নেতার জীবন একটা বহস্যেব যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে গেল ! এ যে দেশের কত বড় দুর্ভাগ্য এবং অপূরণীয় ক্ষতি তা দেশেব লোকের চেয়ে কে বেশী জানে।

মুক্তি মন্টিকে বলল, ও কি ভাত অমনি ফেলে ছড়িয়ে খাচ্ছ যে ? বুঝলে ঠাকুমা, ভাত ফেলতে দেখলে এখন কেমন আমার ভয় করে। এই সে-দিনের দুর্ভিক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছে অন্ন কি জিনিস। চোখে দেখেছি, পেটের ছেলের কাছ থেকে মা কাড়াকাড়ি করে ভাত খেয়েছে। সন্তান মরে গেলে মা খুশী হয়েছে, ফ্যানটুকু পুবো নিজে খেতে পাবে বলে। রাস্তায় কেবল ভুখার মিছিল, একটু ফ্যান দেবে মা—একটু ফ্যান—তার বেশী চাওয়া যেন ওরা ভুলে গেছে।

নরেন মুক্তির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের পাড়ার রমেন-বাবুদের সেই গল্পটা বলেছ ঠাকুমাকে ?

না, এখনও বলা হয়নি ; বলছি, আমাদেব বাড়ীর সামনে থাকেন মিলিটারী কনট্রাক্ট নিয়ে বড়লোক হয়ে ওঠা রমেন দত্ত। নতুন পাঁচতলা মস্ত বাড়ী করেছেন।

ভিখিরীরা, রাত নেই দিন নেই, সব সময় তাঁব বাড়ীর সামনে চেঁচাত—একটু ফ্যান দেবে মা—। এখন তাই শুনে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা রমেন দত্তের মেজাজ গরম হয়ে উঠত, রোজই ওদের গালমন্দ করতেন।

ব্যাটা-বেটিদের জ্বালায় কেউ একটু শান্তিতে থাকতে পারবে না। চাব্‌কে গায়ের ছাল তুলে দেয়, তবে ঠিক হয়।

একদিন চরমে উঠল। রোগা লিক্‌লিকে একটি দশ বারো বছরের মেয়েকে ডাকলেন, এই ফ্যান নিয়ে যা—

মেয়েটা লাফাতে লাফাতে হাত বাড়িয়ে এল। আর সে কি সপাং সপাং চাবুক চলতে লাগল মেয়েটাব উপরে, তোমাকে কি বলবো। মেয়েটা চিৎকার কবে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, গা-হাত-পা কেটে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে লাগল।

মেয়েটার মর্মান্তিক চিৎকার শুনে পাড়ার লোক গিয়ে জড়ো হলো। কিন্তু রমেন দত্ত তার আগেই দবজা বন্ধ কবে দিয়েছে। মেয়েটাকে পাড়াব ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেল।

এ কাহিনী শুনতে শুনতে প্রভাত যেন ছট্‌ফট্ করে ওঠে। অশক্ত দেহ নিয়েই এই অন্যায়েব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, পুলিশের বিষাক্ত গ্যাসে যদি ওর চোখ অন্ধ হয়ে না যেত, তবে আর একবাব শেষ প্রতিবাদ জানাত নিজেব দেশের উপব নিজেদের অন্যায়ের।

মুক্তি বলল, সবচেয়ে করুণ ঠাকুমা, রাস্তায় মরে থাকত যে-সব লোক তাদের তুলে নিতে লবি আসতো, তখন যদি কোন মুমূর্ষু লোকেব মবতে দু-এক মিনিট দেবী আছে মনে হতো, তবে তাদের স্বজনেরা গলা টিপে মেরে লরিতে ফেলে দিত। লরি চলে গেলে কে সমস্ত দিন মরা নিয়ে বসে থাকবে। ওদের তো ফ্যান দাও গো করে দশ দোর ঘুরতে হবে।

মহামায়া ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোর কলকাতার গল্প এবাব থামা, মুক্তি। এসব গল্প শোনাও পাপ। মানুষকে পশুতে নাবিয়ে আনা বোধ হয় সবচেয়ে বড় অধর্ম।

মন্টি গল্প শুনতে শুনতে কখন পিঁড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে তা কেউই খেয়াল করেনি।

মহামায়া তা দেখে বললেন, আহা বাছাবে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঠ মুক্তি, মুখ ধুয়ে ওকে শুইয়ে দে।

ওরা সকলে উঠে চলে যেতে, উমাচরণ এঁটো বাসন তুলে নিতে সে ঘরে আসে।

মহামায়া ওকে বললেন, কাল তাড়াতাড়ি উঠে ভাল মাছ তরকারী এনো।

শোয়ার আগে মুক্তিকে ভাল করে দরজা বন্ধ করতে বলে তিনি শুতে যান।

পরদিন খুব ভোরেই প্রভাতের ঘুম ভেঙ্গে যায়। আস্তে ডাকে, দাদুভাই উঠেছ?

লাফাতে লাফাতে মন্টি এসে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে। যত রাজ্যের আজেবাজে গল্প চলতে থাকে দাদু নাতির মধ্যে।

একবার মন্টি বলল, দাদু, পুলিশ তোমার চোখে মেরেছিল?

কে বলেছে তোমাকে?

মা বলেছে। আমি আর একটু বড় হয়ে আমার পিস্তল দিয়ে ধাঁই করে পুলিশের চোখে মারবো।

প্রভাত হাত বুলিয়ে অনুভব করে, প্রতিহিংসাপরায়ণ নাতির মুখের অবস্থা। আদর করে মন্টিকে বলল, পুলিশকে তোমার ভয় করে না?

না। আমার শুধু ভয় করে মুন্নিকে।

সে আবার কে?

তুমি চেন না আমাদের মুন্নিকে?

কি একটা জিনিস নিতে মুক্তি ঘরে ঢুকে সেকথা শুনে বলল, আমার দেওরের মেয়ে, বাবা। তাকে ওর খুব ভয়। তার নতুন দাঁতের অত্যাচারে মন্টি সন্ত্রস্ত।

প্রভাত হেসে বলল, মন্টি, তোমাকে বুঝি বোনটি খুব জোরে কামড়ে দেয়?

হুঁঃ, বলে মন্টি আঙ্গুল চোষায় মন দেয়।

বাজাব দেখে মুক্তি ভারী খুশী। নরেনকে ডেকে বলল, ওগো, দেখবে এসো, কি চমৎকার ইলিশমাছ। কানকো তুলে দেখে বলল, একটু আগেই বোধ হয় ধরা পড়েছে। আর চিংড়িগুলো দেখ। জিবে জল আসছে। কলকাতায় বরফের চালানী মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে।

উমাচরণেব দিকে তাকিয়ে মুক্তি বলল, শিগগিব কুটে দাও, উমাদা, আমি বান্না করবো।

কাপড় গামছা নিয়ে চান কবতে পুকুবে চলে যায় মুক্তি।

এমন উদাব আকাশ, নির্মল আলো বাতাস আব প্রচুব জল পেয়ে মুক্তি আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। ভাবে, সত্যিই, এ না হলে জীবন! কলকাতায় আমাদের মত মানুষগুলো তো চিড়িয়াখানাব জীব হয়ে উঠেছে। চলা বলা, হাসি আনন্দ সব ওদেব বাঁধা ববাদ্দেব মধ্যে। আমার শাশুড়ী যখন জল কল নিয়ে ঝগড়া করেন, তখন রাগ হয় বটে; কিন্তু কী ন্যক্কাবজনক জীবন ভোগ করছেন বেচাবী। মানুষ হলো অসীম অনন্তের পূজাবী। তাব পূজা যদি কেবলই সঙ্কীর্ণ পবিধির মধ্যে বাধা পায়, তবে অসন্তোষ জমে উঠতে বাধ্য।

চিন্তাব সঙ্গে হাতের কাজও দ্রুত চলতে থাকে। রুগ্ন পিতাব সুখ-সুবিধার জন্য মুক্তির সাবা মনটাই পড়ে থাকে।

আহা, রোগা মানুষ, দেরী হয়ে যাবে খেতে।

অদ্ভুত পিতৃভক্তি মুক্তির। বাবা ওব কাছে শুধু বাবাই নয়—মস্ত বড় একটা আদর্শ। তাব জন্য না দিতে পাবে, না করতে পারে এমন কিছু নেই ওর। সেই পিতা আজ অসুস্থ, মনের সকল স্তবে ছড়িয়ে আছে একটা উদ্বেগ।

দীর্ঘ চুলেব গোছা ক্ষিপ্রহাতে গামছা দিয়ে ঝেড়ে মুক্তি হাতে জড়িয়ে একটা মস্ত বড় খোঁপা বেঁধে ফেলল। শুকনো শাড়ি ব্লাউজ পরে, ভিজে শাড়ি পুকুরের টলটলে জলে ভাসিয়ে ভাসিয়ে ধুয়ে নিংড়ে হাতে নিয়ে, ভিজে গামছাখানা কাঁধে ফেলে, মধু লীলায়িত র ছন্দে পা

ফেলে ফেলে চলার আনন্দে বিভোর হয়ে বাড়ী আসে।

চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, উমাদা, সব রেডী তো? আমি কাপড় শুকোতে দিয়ে এলাম বলে।

চুলের রাশে চিরুনী চালাতে চালাতে মিষ্টি একটি গানের কলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কণ্ঠে আসে মুক্তির, "অলকে কুসুম না দিও, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও"। গানেব আবেশে বিহ্বল মুক্তির নিজেকে কেন জানি বড় ভাল লাগে। গভীর কালো অরণ্যের মত চুলের মাঝে সরু সিঁথিটি রাঙ্গিয়ে দেয় সিন্দুরে।

শুভ্রললাটে রক্তবিন্দুব মত কুম্‌কুমের টিপটি অপূর্ব শোভনতায় শোভা পাচ্ছে। নিজেকে দেখে মুখ টিপে একটু হেসে মুক্তি রান্না-ঘবে এলো।

মহামায়া নিরামিষ হেঁসেল থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, মাছের গুলো তুই রাঁধ, আর সব আমি রেঁধে দিচ্ছি।

মহামায়ার স্রোতহীন জীবনে, মুক্তির ভরা জীবনের ঢেউ এসে দোলা দেয়। আবার বহুদিন পরে তাঁকে একটু প্রফুল্ল দেখায়। নাত-জামাইয়েব সঙ্গে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-তামাসাও চলছে।

রান্না হয়ে গেলে মুক্তি অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে সকলকে খেতে ডাকে।

সরষে দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে খেতে প্রভাতের দীপ্তির কথা মনে পড়ল। মুক্তিও ঠিক মার মত রাঁধতে শিখেছে। মেয়েটার অনেক কিছুই ওর মার মত হয়েছে।

অনেক দিনের বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন তুলে ষোড়শী দীপ্তির হাসি হাসি মুখখানা মনে পড়ল প্রভাতের। কী অনুপম লাবণ্য সে মুখে! সে রূপের আলোকচ্ছটায় প্রভাতের নিষ্প্রভ মুখেও জীবনের নব বিকাশ। হাতখানা তার কর্তব্য ভুলে অতীত অন্বেষণে ব্যস্ত। একটি বিশেষ চিন্তাকে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে না ভাবতে পারলে

যেন ঠিক ভাবা হয় না।

মুক্তি কি একটা পদ বাপকে দিতে এসে বলল, বা রে, কিছুই তো খাওনি, বাবা ?

প্রভাতের যেন একটা নিষিদ্ধ চিন্তা জেনে ফেলেছে মুক্তি, এমনি লজ্জিত হয়ে উঠল প্রভাত।

প্রভাত কন্যার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, সেই অভিমানে ঠোঁট দুখানি স্ফীত, চোখের দৃষ্টি ঘন আয়ত। বলল, কেন রে, খাচ্ছি তো।

একে কি খাওয়া বলে, সবই তো পাতে পড়ে আছে। খেতে কি ভাল হয়নি, বাবা ?

অনেক দিন পরে এমন রান্না খেলাম—বলে, প্রভাত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

বলল, আচ্ছা মুক্তি, এত রান্না শিখলি কার কাছে ? সেদিনও তো এইটুকু ছিলি।

মুক্তির হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। সত্যিই, বাবা আমাকে বড় হওয়ার পরে ক'দিনই বা দেখেছেন। সমস্ত জীবনটাই তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে শেষ হলো।

মুক্তি খানিকটা মাছ এনে প্রভাতের পাতে দিয়ে বলল, বাবা, নারকোলবাটা দিয়ে চিংড়ি তুমি খেতে খুব ভালবাস, ফেলতে পারবে না কিন্তু। পাতে কিছু পড়ে থাকলে আমি অনর্থ করে ছাড়বো।

নাঃ, তুই দেখছি একটুও বদলাসনি। ঠিক আগের মত বায়নাদার। নরেনকে সব দেখেশুনে দিচ্ছিস তো ? না, বুড়ো বাপকে নিয়েই তোর যত চিন্তা।

মহামায়া বললেন, নরেনের খাওয়ার জন্যে তোর ভাবতে হবে না, আমি তাহলে আছি কেন।

নরেন বলল, আপনার লাউঘণ্ট, ঠাকুমা, মাছ মাংস ফেলে খেতে ইচ্ছা হয়।

মহামায়ার বুকে আনন্দ ব্যথায় মিশে অদ্ভুত এক অনুভূতি। আরো খানিকটা লাউঘণ্ট এনে নরেনের পাতে দিলেন। এই বয়সে রান্নার সুখ্যাতি কুখ্যাতিতে কিছু এসে যায় না। জীবন-সায়াহ্নে একটু একটু খুশীর স্পর্শ লাগলেই মনটা ছলছলিয়ে ওঠে। তাঁর সমগ্র জীবনে আনন্দের স্থান বড় বেশী নেই।

মহামায়া দন্তহীন মুখে হেসে বললেন, একি সত্যিই বলছ ভাই, না, বুড়ি ঠাকুমাকে একটু খুশী করবার জন্যে ?

নরেন খেতে খেতে বলল, আচ্ছা মুক্তিকেই না হয় জিজ্ঞাসা করবেন।

মন্টি প্রভাতের ডান পাশেই বসেছিল। তার শিশুবুদ্ধিতে বুঝেছিল, দাদুর মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া অসম্ভব। তাই এই গুরুদায়িত্ব নিজের স্কন্ধেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে।

প্রভাতের হাত কাঁটার কাছে চলে যেতেই ভয়ে ওর মুখ নীল হয়ে যায়।

বড়দের মত গম্ভীর মুখ করে বলে, আর একটু হলেই কাঁটা গলায় চলে যেত।

কাঁটা গলায় ফুটে যাওয়ার নিদারুণ অভিজ্ঞতা কিছুদিন আগে মন্টির হয়েছে। সেই দুঃখজনক ব্যাপারটা দাদুর না হয় সেদিকে নাতি মন্টির সজাগ দৃষ্টি। যা হোক, মন্টির কর্তৃত্বাধীনে প্রভাত নির্বিঘ্নে খেয়ে ওঠে।

এমনি করেই সাতটা দিন নরেনের হাসি-গল্পের ভিতর দিয়ে শেষ হলো। আকাঙ্ক্ষিত না হলেও যাওয়ার দিনটি যথাসময় এসে গেল। সকলের মুখেই একটু বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল।

তবু যেতেই হলো। নরেন চলে যাওয়ার সময় মন্টির বড় বড় চোখে জল ভরে এলো। আঙ্গুল পুরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আর নরেন মন্টিকে কোলে তুলে অনেক আদর করে, আবার যখন আসবে তখন ছবির বই, খেলনা, লজেন্স ইত্যাদি নিয়ে আসার মনভোলান একটা চিত্র তুলে ধরে যাওয়ার অনুমতি পেল। তবু পিতাপুত্রের মনে বিদায়কালীন ব্যথা জমেই রইল।

আরো দুটি জলভরা ডাগর কালো চোখ নরেনকে কেবলই পেছনে টানছিল। সে-টান হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়ে এমন মোচড় দিচ্ছিল যে, যাওয়ার পথ চোখে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

প্রভাত এবং মহামায়া বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, গিয়েই চিঠি দিতে যেন ভুলো না। খুব সাবধানে চলাফেরা করো। কলকাতার রাস্তা তো নয় যেন মৃত্যুদূত। এত যানবাহনের রাজসিক আয়োজন আর কোথায় আছে। আর মুক্তি, সকলের চোখ বাঁচিয়ে একসময় বলল, রোজ একখানা চিঠি দিতে ভুলো না যেন। একদিন চিঠি পেতে দেরী হলে আমি টেলিগ্রাম করবো—তখন বুঝবে। বলে, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

নরেন বিব্রত গলায় বলল, ছি লক্ষ্মীটি, কেঁদো না। ক'টা দিনের বা ব্যাপার। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

মুক্তি ধরাগলায় বলল, একমাস বুঝি কম হলো!

আকাশটা ছিল মেঘে কালো, ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালের উপর। সারা আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুতের ছুরি দিয়ে কোন অদৃশ্য হস্ত যেন মহা আক্রোশে আকাশটাকে চিরে ফেলছে। আলোর দীপ্তিতে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এমনি দুর্যোগে নরেনকে মুক্তির বড় বেশী মনে পড়ে। মন যেন প্রিয় সান্নিধ্যের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। কি আর করে, চিঠি লিখতে বসল মুক্তি। মনের উতলা আবেগকে কাগজের বুকে ছড়িয়ে দেওয়া উপভোগের মধুরতম সদুপায়।

এমনি বর্ষণমুখর রাতে উমাচরণ এসে বলল, দিদিমণি, খবর সুবিধাব নয়।

উমার মুখ আতঙ্কে উদ্বেগে ভয়ানক হয়ে উঠেছে। সে-মুখের দিকে তাকিয়ে মুক্তির ভয়ে হৃদস্পন্দন থেমে গেল।

সন্ত্রস্ত গলায় বলল মুক্তি, কেন, কি হয়েছে উমাদা?

উমাচবণ মুক্তির নিকট সবে এসে ফিস্ ফিস্ করে যা বলল, তা সত্যিই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার মতই।

এদিক ওদিক তাকিয়ে উমা বলল, গাঁয়েব মাতব্বররা সব তেঁতে উঠেছে।

এরকম একটা জনবব ভেসে এসেছিল মুক্তিব কানেও। কিন্তু সেটা নেহাৎই গ্রামেব লোকেব অবসব বিনোদনের একটা উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। কিন্তু উমার কথায় কলকাতাব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা স্মবণ কবিয়ে দেয়—সেই বীভৎসতার পুনবাবৃত্তি ভাবতেও সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে যায়।

উমা বলল, দিদি, একা পথে-ঘাটে বেব হয়ো না, আব দাদুভাইকে চোখে চোখে বেখো। মানুষ খেপলে তো আব মানুষ থাকে না।

সত্যিই, মানুষেব উন্মত্ততার সুযোগ নিয়ে তাব পশুসত্তা বেরিয়ে আসে। তাই না ক্রোধকে পবিহার করাব এত অনুশাসন। মানুষের মনে নন্দনকানন এবং জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত অরণ্য, দুই-ই আছে। যখন মানুষ শান্ত সমাহিত অবস্থায় থাকে, তখন সে নন্দনকাননের অধিপতি; আর যখন বিপরীত অবস্থা, তখন অরণ্যের হিংস্র জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়।

এমন সময় মহামায়া সেখানে এসে বললেন, কি বে, তোদের অমন দেখাচ্ছে কেন?

মুক্তি আর উমার চোখে যেন ভয় বাসা বেঁধেছে। মহামায়ার চোখেও সেই অজানা ভয়ের ছোঁয়া লাগে। ভীতস্বরে বললেন, বল তো মুক্তি কি ব্যাপার।

মুক্তি মহামায়ার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, গুণ্ডারা নাকি ক্ষেপে উঠেছে। এইমাত্র উমাদা শুনে এসেছে।

নিঃশব্দ ঘর। শুধু ভয়ের এক কাল্পনিক মূর্তি ওদের চোখে মুখে। মহামায়া তাঁর সমস্ত শক্তি কণ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে উমাকে বললেন, এ কি তোমার অনুমান, না সত্যিই কারো কাছে শুনেছ?

অনুমান কেন বলছেন, মা? গতকাল রাত্রে মাতব্বরদের বাড়ীতে শলাপরামর্শ করতে সব গুণ্ডারা জমায়েত হয়েছিল।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মহামায়া বললেন, এ ঘটনা কি তুমি নিজে দেখেছ?

না মা, দেবেন বাঁড়ুজ্জের মুখে শুনেছি। তিনিই আপনাদের সাবধান হতে বলে দিলেন।

মহামায়া বুঝলেন কথা মিথ্যে নয়। অন্ধ পুত্র, যুবতী নাতনী আর শিশু মন্টি, সকলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভয়ে আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে ওঠেন। শুধু অন্ধকার, এ ছাড়া চোখে আর কিছুই দেখতে পান না।

সত্যিই, মানুষের জীবন একটা মস্তবড় ফাঁকি। প্রকৃতির হাতের কারচুপিতে সে ফাঁক মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। বিচিত্র আয়োজন প্রকৃতির, নির্বাচনের ধারাও বিচিত্র। হাসি-কান্নার বিচিত্র মালাখানি পরিয়ে দেয় জীবনের প্রারম্ভে, প্রকৃতি নিজের হাতে।

একটি দিনের চেয়ে আর একটি দিনে অনেক বেশী অসন্তোষ অনেক বেশী প্রতিহিংসা জমে ওঠে সমাজের স্তরে স্তরে। গ্রামের লোকের সে আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেই শ্বাসরোধী অবস্থার মধ্যে মানুষের প্রাত্যহিক কাজকর্ম চলছে। যথাসম্ভব কেউ ঘরের বার হয় না, শিশুরা হাসি ভুলে গেছে, বৃদ্ধেরা করেছে বাকসংযম। এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন অতিবাহিত হচ্ছে।

গ্রামটা যেন বিদ্বেষের উত্তপ্ত বাষ্পে গুমরে গুমরে উঠছে। আতঙ্কের শেষ সীমারেখায় সকলে প্রতীক্ষা করছে, শেষ দুর্যোগের মুহূর্তটির জন্য।

এই অবস্থার তিন দিন পরে, ঠিক মধ্যরাত্রে, মুক্তি সন্ত্রস্ত পায়ে

ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রভাতের ঘরে প্রবেশ করে বলল, বাবা, আগুন—আগুন !

কোথায় আগুন—কোথায় রে ?

ঘুমভাঙ্গা দুটি অন্ধ চোখে সে কী অস্থিরতা ! দুর্বল শিথিল অঙ্গ ভয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। অসংবৃত বস্ত্র কিছুতেই আয়ত্ত হচ্ছে না। পা-দুখানায় যেন এক ফোঁটা জোর নেই।

মুক্তি তড়িৎগতিতে পিতা-পুত্রকে দু'হাতে শক্ত কবে ধরে বেরিয়ে পড়ল।

মহামায়ার অবশ অচেতন দেহটা উমাচরণ কোন রকমে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে থাকে।

আগুনের লেলিহান শিখা, কামান্ধ দুর্বৃত্তের বিকট উল্লাসধ্বনি, ভীতসন্ত্রস্ত নবনারীর ব্যাকুল ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত। মশালেব আগুনে মুক্তি অনেক নামকরা গুণ্ডা এবং পবিচিত মুখ দেখতে পেল। যাদেব কিছুদিন আগেও, দাদা, কাকা, চাচা, ফুফা বলে ডাকত।

আজ তাবা উন্মত্ত বক্তলোলুপ, সাম্প্রদায়িক মদমত্ত উন্মাদ। মানুষ যদি মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে যায়, সে যে কী ভয়ঙ্কব মূর্তি, তা যে না দেখেছে তাকে বোঝান সম্ভব নয়। সেই দুর্যোগের রাত্রে নারীমাংস নিয়ে নরপশুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কার আগে কে ভোগ করবে। জোয়ান পুরুষের এমন মর্মান্তিক ক্রন্দন আর কবে কে কোথায় শুনেছিল !

নিজেব মাতা, কন্যা, জায়ার লাঞ্ছনা নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখার মত দুর্ভাগ্য যেন কোন পরম শত্রুরও না হয়। কিন্তু সে-রাত্রে অনেকের ভাগ্যেই সে দুর্ভোগ ঘটতে দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু সবচেয়ে করুণ হলো, যখন মাতার উপর তারই গর্ভজাত পুত্রকে দিয়ে বলৎকারের জবরদস্তি চলতে লাগল, তখন বুঝি ভগবানও চোখ বুঝলেন।

উতলা হাওয়ায় মুক্তির মর্মস্পর্শী আর্তনাদ ভেসে এলো, বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে তোমরা বাঁচাও—

মুহূর্তে নরপিশাচদের বীভৎস হাসির বিকট শব্দে, মুক্তির ভয়ার্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটুকু ভেসে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্য, মুক্তিকে ছিনিয়ে নিল ওদেব পরিচিত এক ব্যক্তি। এককালে ওব বাবাবই সহকর্মী ছিল।

কেবল কি মুক্তি, কত শান্তি, মায়া, রাবেয়া, সফিয়া সব ছুটে পালাচ্ছে প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ শুষ্ক পত্রের ন্যায়। কোথায় যাচ্ছে তা তাদের অজ্ঞাত। কেবল বাঁচাব নির্দেশে ছুটে চলেছে। কিন্তু যাবে কোথায়, গুণ্ডাব হাত থেকে যদি বা নিস্তাব পায়, লুফে নেয় স্বয়ং দলপতি। শিকাবেব আশায় দশ হস্ত প্রসাবিত হয়ে আছে দশদিকে। কেবল কি নাবী? শিশু বৃদ্ধ কারো রেহাই নেই। মাতৃবক্ষ হতে স্তন্যপায়ী শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কবছে। বৃদ্ধদের কিল ঘুষিতেই ইহলীলা শেষ করে দিচ্ছে। তাদেব জন্য অস্ত্র ব্যবহার নিবর্থক মনে করে।

শিবহীন কবন্ধগুলি তখনও দেহেব মায়া কাটাতে না পেরে, দু-চাববার আক্ষেপে নড়েচড়ে স্থিব হয়ে যাচ্ছে।

এমন যে খেয়ালী বিধাতা, তিনিও উৎকট পরিণতি দেখে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন।

হায় ভগবান! তুমি আমাকে বধির করলে না কেন? মুক্তির সেই চরম মুহূর্তের চিৎকার, বাঁচাও—বাঁচাও—

আমার হৃৎপিণ্ড সে ডাকের প্রতিক্রিয়ায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কে যেন দুহাতে তাকে দুমড়ে নিংড়ে পিষ্ট করে দেয়।

মন্টি, আমার চোখের মণি, আঁধার বুকের আশার আলো, একমাত্র

নাতি। তার বালককণ্ঠে সে কী প্রার্থনা, বাঁচার সে কী ব্যাকুলতা! দাদু—দাদু—

আমি অন্ধ দু'চোখ মেলে ব্যর্থ চেষ্টায় খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

ব্যাধেব হাতে শিকার যেমন নিষ্ফল আক্রোশে নিজেব অঙ্গকে পীড়ন করে, আমিও তাই করলাম। অন্ধ দুটো চোখকে মুষ্ট্যাঘাতে নিশ্চিহ্ন কবে ফেলতে চাইলাম। কপালের অদৃশ্য লিখন বিধিলিপিকে প্রস্তরের আঘাতে নিঃশেষে লুপ্ত করে দিতে চেষ্টা কবলাম। কিন্তু লেখা মুছল কিনা জানি না, রক্তে আমাব কপাল বুক ভেসে যেতে লাগল। মার উপর যখন এলো নির্মম মৃত্যুর খড়্গ নেমে, তখন তিনি তাঁর শেষ বংশধরকে সাবধান কবে গেলেন,—প্রভাত—পালা—পালা—

কেবল আমাকে দুর্বৃত্তেবা ঘৃণাভরে স্পর্শ কবল না। তাদের খড়্গ কি আমার বক্তে অপবিত্র হয়ে যেত! যে তাব জননী, কন্যা, স্ত্রী সকলকেই তাদেব প্রাপ্য না দিয়ে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিল, তাকে কি এবা জীবিত বেখে, অনুতাপে দগ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়ে গেল? আমাব জন্যে কি এতটুকু আশ্বাস স্বর্গে মর্তে কোথাও নেই!

হে আমার বহু সাধনার স্বাধীন ভাবত, তোমাকে খণ্ডিত করার অপরাধেই কি আজ এই শাস্তি আমাদের! তবু তোমার জয় হোক।

লাঠি ঠক্ ঠক্ কবে পরাণ তাঁতির মা পেছন থেকে সামনে এসে হাত-মুখ নেড়ে বিস্মিত স্ববে বলল, এখনও মুড়ি দুটো খাওনি, দাদাবাবু? তোমাকে নিয়ে বাপু আমার হয়েছে মরণ। নিজের সন্তান, নাতি এমনকি নিজের বুড়ি মা'টাকে পর্যন্ত যমের মুখে সঁপে দিয়ে নিজে এসে উঠলে আমাদের ঘাড়ে। আর পরাণের বুদ্ধিকেও বলিহারি যাই, তখন বলে নিজের পেরাণ নিয়ে লোকে কলকাতায় আসতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, আর তুই কি বলে যমের বোঝা বয়ে নিয়ে এলি।

মা-পোয়ের পেট চালাতে চোখে সরষে ফুল দেখছি, তার উপর আর একটা বাড়তি পেট—কি করে চলবে বলো ?

ছেলের অদূরদর্শিতায় বৃদ্ধার ন্যুব্জ দেহখানা লাঠির উপর কাঁপতে লাগল। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, এখন ঐ মুড়ি ক'টি খেয়ে আমাকে কেতার্থ কর দেখি! তোমার পেছনে ঘুরে বেড়াবার আমার মেলা সময় নেই। তারপরে আবার পিণ্ডি গিলবে যে, তাও তো আমাকেই সেদ্ধ করতে হবে। না, সাতটা দাস-দাসী আছে যে, তৈরী করে দেবে!

এত বলেও যেন বুড়ির গায়ের ঝাল মেটে না। একপক্ষে বকে সুখ কোথায়—যদি না প্রতিপক্ষের উত্তর পাওয়া যায়! তাই শ্লেষমিশ্রিত ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, তুমি নাকি অন্ধ, তবে রাত দিন আকাশের দিকে চেয়ে দেখ কি বলো তো ?

নির্বাক প্রভাতের চোখেব কোল বেয়ে ছুটি জলের ধারা শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

শ্রাবণের ধারা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে রিফিউজি ক্যাম্পের চালের উপর।

পূবের হাওয়ায় ভেসে আসছে বিশ্বকবির অমর সঙ্গীত—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোব কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥"